মুক্তির সন্ধানে ভারত

কংগ্রেস পূর্ব যুগ

যোগেশচন্দ্র বাগল

দি মডার্ণ পাবলিশারস্
৮-এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

পরিবর্ধিত ও পুনর্লিখিত নূতন সংস্করণ

Muktir Sandhane' Bharat
Congress Purba Yug
Revised & Enlarged Edition

প্রকাশক : শ্রীঅমলেন্দু মজুমদার
দি মডার্ণ পাবলিশার্স
৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজিত গুপ্ত

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

বেঁধেছেন :
দীননাথ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬০, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

Accn – ৫৪৫

পিতৃদেবের চরণে

মুক্তির সন্ধানে ভারতের ভূমিকা

শ্রীমান যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার 'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক। কাব্য ও উপন্যাস-প্লাবিত বাংলা সাহিত্যের হাটে সামান্য যে কয়জন সাহিত্যিক অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল প্রবন্ধের বেসাতি করেন যোগেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। সুতরাং বাঙালী পাঠক সমাজে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্য লইয়া কোন ভূমিকার অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন।

'মুক্তির সন্ধানে ভারত' ভারতবর্ষের বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসের একটি কাঠামো মাত্র। জাতির জীবনে একশত বৎসর কিছুই না একথা ঠিক, কিন্তু প্রগতির পথে অবিরাম চলিতে হইলে মাঝে মাঝে এমনি ভাবে আলোচনা করিয়া পরবর্তী পথ স্থির করা প্রয়োজন। এই হিসাবে এ ধরনের পুস্তকের মূল্য যথেষ্ট। বিগত একশত বৎসরে শিক্ষায়, সাহিত্যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, ধর্মে, লোকাচারে, এক কথায় জাতির সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীতে যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই যে পরিবর্তন ইহারও একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে, যাহাকে অস্বীকার করিলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং বাংলাদেশের যাঁহারা বর্তমান নাগরিক এবং যাঁহারা হইবেন ভবিষ্যৎ নাগরিক তাঁহাদের পক্ষে এই পরিবর্তনের মূলতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। যোগেশচন্দ্র এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমার এই ধারণাই জন্মিয়াছে।

যে একশত বৎসরের ইতিহাস এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা ভারতের নব-জাগরণ বা রেনেসাঁর ইতিহাস। এই রেনেসাঁর মূল উপাদান প্রতীচ্যের অবদান এবং ইংরেজী শিক্ষাই ইহার বাহন। সুতরাং আমাদের সমস্ত অগ্রগতি যদি আজ প্রতীচ্যপন্থী হইয়াই থাকে তবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। মোগল রাজত্বের গৌরবময় যুগে আমরা অনেকাংশেই আপন আপন গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরে আসিয়া দৃশ্যতঃ অনেক মুসলমানী আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম

—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। বর্তমান নব-জাগরণের পূর্বে মোগল বাদশাহ আকবরের রাজত্বেও ভারতবর্ষে আর একটি নব-জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা কতখানি বিপুল এবং ব্যাপকভাবে দেশের মাটিতে শিকড় গাড়িয়াছিল তাহা আজ নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই, কেননা সমালোচকদের দৃষ্টি লইয়া অপক্ষপাত ঐতিহাসিক তাহার কোন ধারাবাহিক বিবরণ রাখেন নাই। এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই সমসাময়িক কাগজপত্রের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে সময় রাজা বা দেশের শাসনকর্তার জীবনীই ছিল দেশের ইতিহাস। ইহাতে অবশ্য সাধারণভাবে দেশের তৎকালীন ইতিহাসের সব কিছুই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ ভাবধারার গতি-প্রগতি ইহা হইতে পরিপূর্ণভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, কোন একজন রাজা বা শাসনকর্তার জীবন ইতিহাস যেমন মূল্যবান্, কোন একটি ভাবধারার প্রসারের অপক্ষপাত বিবরণও ঠিক ততখানিই মূল্যবান্।

আমাদের দেশে 'রাষ্ট্র-বিজ্ঞান' এখনও পুরাপুরি বিজ্ঞান হিসাবে আলোচিত হয় না—এখনও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ব্যাপক ভাবে দেখিতে গেলে সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব কিছুর সমন্বয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান গঠিত। কোন একটি বিশেষ সময়ের রাষ্ট্রীয় তথ্য আলোচনা করিতে হইলে এগুলি বাদ দিয়া যদি শুধু রাজনৈতিক বিষয় সমূহেরই অবতারণা করা হয় তবে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হইল বলা চলে না। কারণ জীবনের সকল প্রচেষ্টার উপরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। যোগেশচন্দ্র এই কথা বিস্মৃত হন নাই দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতের মুক্তি সাধনার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ইহা নহে। ইহা ভারতীয় নব-জাগরণের বৈচিত্র্যবহুল ইতিহাসের পথ-নির্দেশক মাত্র। এই নব-জাগরণের যুগ এখনও অতীত হইয়া যায় নাই, এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্নতর সমাজে এই নব-জাগরণের পূর্ণতম বিকাশ দেখা যায় নাই। তবে সকল সমাজেই এই ভাবধারার একটা সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। যে সব সমাজ ইতি-মধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহারা একটা যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর যে সব সমাজ সবেমাত্র এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহারাও সমাজ মনে একটা গুরুতর আলোড়নের ফলে চঞ্চল হইয়া

উঠিয়াছে। এ সময়ে সমগ্রভাবে এই রেনেসাঁ বা নব-জাগরণের একটা সংক্ষিপ্ত ও সুবিন্যস্ত বিবরণ সময়োপযোগী সন্দেহ নাই।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে বাঙালী যে পাপ করিয়াছিল তাহারই পরোক্ষ অবদান এই রেনেসাঁ। বাঙালী রামমোহন ইহার প্রবর্তক ও হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ ইহার পতাকাবাহী। যখন এই যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবে তখন দেখা যাইবে বর্তমান ভারত গঠনে ইহাদের সত্যকারের দান কতখানি।

আমি এখন অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিয়াছি। যোগেশচন্দ্র যে সময়ের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই আমার চোখের উপর ঘটিয়াছে এবং এই সময়ের অনেক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিবারও আমার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। এইজন্য আমি স্বভাবতঃই যথেষ্ট কৌতূহল ও আনন্দের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। সর্বজনগ্রাহ্য সরল-ভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানি বাংলা দেশের পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে এ বিশ্বাস আমার আছে। বাঙালী পাঠক সমাজ উপন্যাসপ্রিয় এ কথা অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি। হয়ত ইহার মধ্যে কতকটা সত্যও নিহিত আছে। কিন্তু চিন্তাশীল মৌলিক আলোচনা বাংলা দেশে অচল এ ধারণা আমি পোষণ করি না। সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায়—ইহা নব-জাগরণের ফল। ইংলণ্ডের রেনেসাঁর ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে, ইংরেজ জনসাধারণ এই সময়ে অতিমাত্রায় সাহিত্যপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে একজন সাধারণ কসাইও পশুহত্যা করিবার সময় একটা নাতিদীর্ঘ সাহিত্যিক বক্তৃতা দিয়া তবে হত্যা কার্যে হাত দিত। বাংলায় অবশ্য সে অবস্থা এখনও হয় নাই, সাহিত্য-চর্চা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই প্রদেশেও সাহিত্যরসিক এমন অনেক আছেন—যাঁহাদের নিকট 'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত' যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

সায়ান্স কলেজ, কলিকাতা
২৪শে ভাদ্র, ১৩৪৭

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রকাশকের নিবেদন

'মুক্তির সন্ধানে ভারত, কংগ্রেস পূর্ব যুগ' ভারতের, বিশেষ করে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন দিঙ্‌নির্ণয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রকাশিত হ'ল। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' নামে লেখকের বই পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে ; কিন্তু এই বইখানির তথ্য-বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে, বহুলাংশেই বা কেন, সম্পূর্ণ অভিনব।

লেখকের অবিচলিত নিষ্ঠা ও একাগ্র সাধনার ফলে একদা অবজ্ঞাত বাংলার ইতিহাস বিশেষ করে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আজ সর্বজনস্বীকৃত মর্যাদা লাভ করেছে। অতীত ঘটনার উপর সঠিক আলোক সম্পাতে বর্তমানের সঙ্গে যে সুস্পষ্ট যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে, তার ফলে ভবিষ্যৎ গবেষকদের পক্ষে বাংলার ইতিহাস আলোচনা সহজ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এখানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কথা স্মরণীয়—"যে জাতির পূর্ব-মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে।...বাংলার ইতিহাস চাই—নহিলে বাংলার ভরসা নাই। ...এ আমাদিগের মা জন্মভূমি বাংলাদেশ, ইহার গল্প বলিতে কি আমাদের আনন্দ নাই?" আমরা বলতে পারি আছে, নিশ্চয়ই আছে। তা' না হ'লে দৃষ্টিহীনতার প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে, সংসারের শত প্রলোভনের প্রতি ঋষি-সুলভ উপেক্ষা দেখিয়ে এ ইতিহাস রচনা করা (লেখকের পক্ষে) সম্ভব হত না।

তাঁর এ-আনন্দের উৎস গভীর দেশপ্রেম। দেশকে তিনি জেনেছিলেন, দেশকে ভালবেসেছিলেন, উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাকে সেবা করতে, তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে। এ তাঁর মানস-সেবা ; আর সে সেবায় নিজের দৃষ্টি-সম্পদকে উৎসর্গ করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের করেছেন চক্ষুষ্মান। সহজ, সরল ভাষায় ইতিহাসের প্রতি সর্বজনীন মনোযোগ আকৃষ্ট করার তাঁর যে প্রয়াস, তা ব্যর্থ হবে বলে আমাদের মনে হয় না। যে ইতিহাস রচনায় অনেক সময়

সত্যের বিকৃতি ঘটে, যা অনেক সময় নিরপেক্ষতা বর্জিত হয়ে অন্তঃসার শূন্য ও অর্থহীন হয় এবং জাতির মনোজগৎকে বিভ্রান্তিতে পঙ্গু করে, সে দুরূহ কাজে লেখক সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হয়েছেন। অতীতের সত্য ও যথাযথ কাহিনী ইতিহাস বা ইতিসত্য, আর তার পরিণতিই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তাই এই পুস্তকে বিধৃত তথ্যের উপর দৃষ্টি পড়লে আমরা উপকৃত হব এই আশায় আমাদের এই প্রয়াস। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখক আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। যদি পিতৃহীন এই জাতক পাঠকসমাজে সযত্ন-লালিত হয় তবেই এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

বিনীত
প্রকাশক

সূচীপত্র

মুক্তির সন্ধানে ভারতের ভূমিকা ।/০

মুক্তির সন্ধানে ভারত পুস্তকে লেখকের নিবেদন ॥/০

প্রকাশকের নিবেদন ৸/০

সূচনা ১

মুক্তিকামী রামমোহন ১৪

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও আমাদের স্বদেশ-চেতনা ২৯

জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকা :
দেশ চর্যায় নানান ধারা ৪৭

সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভার পরিণতি :
বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা ৬৬

আদর্শ সংঘাত : সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা—সামাজিক
ও রাজনৈতিক ৮৪

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয়
সভা : প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম ১০০

ভারতবর্ষীয় সভা : কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কার্য ১১৫

সিপাহী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ১৩২

জন অভ্যুত্থান : নীল বিদ্রোহের কথা ১৪৭

নব জাতীয়তাবোধ : আত্মশক্তির উন্মেষ ১৬৫

হিন্দুমেলা ৩২৭

জাতি-গঠনে কেশবচন্দ্র সেন ১৮২

শাসকে-শাসিতে : হলাহল ও অমৃত ২০২

শাসনে স্বৈরাচার : নূতন ভাবনা নূতন কাজ ২২২

ইণ্ডিয়ান লীগ : ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত
সভার প্রস্তুতি পর্ব ২৩৯

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভার প্রতিষ্ঠা
কার্যক্রম—প্রথম পর্ব ২৫৭
ভারত সভার কার্যকলাপ : দ্বিতীয় পর্ব ২৭৫
ইলবার্ট বিল : সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ : প্রথম
ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স ২৯১
দ্বিতীয় ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স : ও ন্যাশনাল
কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্ব ৩০৯

পরিশিষ্ট

১। হিন্দুমেলা ৩২৭
২। Old Man's Hope ৩৩৮
৩। গ্রন্থপঞ্জী ৩৪০
৪। নির্ঘণ্ট ৩৪৫
৫। অনুলেখকের নিবেদন ৩৬৫

সূচনা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একবার বলেন, কোন জাতির ইতিহাসে পঞ্চাশ কি একশ' বছর একরূপ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অনন্ত কালের প্রবাহে এ একটি বিন্দু মাত্র। ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে এ কথাটা যেমন প্রযোজ্য হয়তো আর কারো সম্বন্ধেই এমন প্রযোজ্য নয়। হাজার হাজার বছর ধ'রে হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা জীবনতরী বেয়ে চলেছে অবিরত। কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত, শ্রাবণের অবিরাম বারিবর্ষণ, শরতের সুমধুর আলোক-ছটা, বা বসন্তের মৃদুমন্দ হাওয়া—হিন্দুস্থান কতকাল ধ'রে যে এসবের সম্মুখীন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তার জীবনেও বছরের ষড়ঋতুর মত এক এক অবস্থার উদয় হয়েছে, এক অবস্থা বিলুপ্ত হ'য়ে নূতন অবস্থা দেখা দিয়েছে। তাই তার দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাণ নশ্বর ঐহিক বিষয়ের মধ্যে আত্মবিলোপ না ক'রে পরম রস পরমার্থ তত্ত্বের মধ্যে নিজ নিজ সার্থকতা লাভ করেছে। এর ভিতরে নৈরাশ্যবাদ স্থান পায় নি, আশা ও আনন্দ এ-সবের মূল উপজীব্য ও লক্ষ্য। ভারত-কাহিনীর এই হ'ল মূল কথা।

ভারতবর্ষের গত একশ' বা ততোধিক কালের ইতিহাস অনন্ত কাল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে বড় রকমের ভুল করা হবে। পশ্চিমের দেশগুলির কাজ পরিচালিত হচ্ছে রাজনীতিকে কেন্দ্র ক'রে। পূর্ব দেশগুলি এত কাল ধর্মকে কেন্দ্র ক'রেই নিজ নিজ কাজ নির্বাহ করেছে। তবে এখন পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে রাজনীতির চর্চা এরই আদর্শে সুরু ক'রে দিয়েছে তারা। একেও কিন্তু তারা ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত ক'রে নিয়েছে। রাজনীতি আজ জীবনের সকল কর্মে, সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত,—নিছক রাষ্ট্র সম্পর্কেই এ সীমাবদ্ধ হ'য়ে নেই। ধর্ম ও রাজনীতি একারণ সমার্থবোধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ভারতবাসীর কাছে। এদেশে আধুনিক কালে সুষ্ঠুভাবে রাজনীতি চর্চা আরম্ভ হবার পূর্বে ধর্ম নিয়েই প্রথম খুব বিচার-বিতর্ক সুরু হয়। এতে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয় তা-ও

পশ্চিমের অনুকরণে। এই নব-পদ্ধতিই ক্রমে রাজনীতি-চর্চায় অনুক্রামিত হয়েছে।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ হয়েছে বহু জাতির মিলনক্ষেত্র। আর্য-পূর্ব যুগে ভারতবর্ষে একটি উৎকৃষ্ট ধরনের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কৃত নিদর্শন থেকে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে। নবাগত আর্য ও স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে সভ্যতার সৃষ্টি—তা-ই পরবর্তী কালে আর্য-সভ্যতা নামে অভিহিত হয়েছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে শক, হূন, তাতার, আসীরিয় ও যবন (গ্রীক) সভ্যতা। এরা একে একে আর্যত্বে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে ধন্য হ'ল। যারা এসবের ধারক, সেই জাতিগুলিও ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে গিয়ে হিন্দু ব'লে পরিচিত হ'ল। রাজপুতানার রাজপুতগণ দেশী-বিদেশী রণপ্রিয় জাতির মিশ্রণে সৃষ্ট, কারো কারো কাছে শুনতে কটু হ'লেও একথার মধ্যে সত্য অনেকখানি রয়েছে। এরপরে এল মহম্মদীয় সভ্যতা ও ধর্ম। হিন্দুরা তখন দুর্বল, আত্মকলহে ও আত্মরক্ষার চেষ্টায় ইতিমধ্যেই ক্লান্ত। এ সময় ইস্‌লামের আবির্ভাব ভারতীয় সংহতিকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিলে। কিন্তু যে-সব মুসলমান সম্প্রদায় এখানে রাজ্য বিস্তার করেছিল, স্বদেশে তাদের অনেকেরই সমাজ তখনও তেমন পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল না। কাজেই ভারতবর্ষে এসে এখানকার লোকের সমাজবদ্ধ হ'য়ে বাস করতে অনায়াসেই তারা সক্ষম হ'ল। ধর্মে স্বতন্ত্র হ'লেও মুসলমানেরা হিন্দুর মত ভারতবর্ষের অধিবাসী হ'ল, উভয়ের স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে পড়ল। ক্রমে বহু ক্ষেত্রে ধর্মের চেয়ে সমাজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করলে। ইংরেজকে যারা এদেশের কর্তৃত্ব দিয়ে দেয় তাদের ভিতরে হিন্দু মুসলমান দুই-ই ছিল। সামাজিক বোধই এ কর্মে তখন তাদের উদ্‌বুদ্ধ করে। ইংরেজের স্বদেশে কিন্তু বিশিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রবিধি গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার বহু পূর্বে। এই বৈশিষ্ট্য বুঝি তাদের সর্বকর্ম নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবু, ভারতবর্ষের জলমাটি প্রবাসী ইংরেজদের ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করতে যদি-বা কতকটা প্রথমে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান এসে অবিলম্বে এর পথে বিঘ্ন জন্মালো। বিজ্ঞান জানিয়ে দিলে, এদেশের অর্থ এখানে বসেই ভোগ করায় কোন সার্থকতা নেই, বাষ্পীয় পোতে স্বল্প সময়ে স্বদেশে

পৌঁছে স্ব-সমাজে তা ব্যয় করলে চতুর্বর্গ ফল লাভের সম্ভাবনা। তাই ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সমাজ হ'তে ক্রমে আলাদাই হয়ে গেল। ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণে এই জাতিগত বৈষম্য ক্রমে প্রকট হ'য়ে পড়লো।

পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্বেই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায় করতে আরম্ভ করে। কিন্তু তারা যে এদেশে একটি রাজ্য বিস্তার করতে পারবে এ বোধ ঐ সময় থেকেই তাদের মনে বদ্ধমূল হয়। তাদের পরবর্তী কার্যগুলি এই বোধ দ্বারাই পরিচালিত। ব্যবসায় করতে এসে রাজ্যলাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্যে কিন্তু এ-ই ঘটেছিল। কোম্পানীর সুনির্দিষ্ট শাসনবিধি নেই, নিয়মকানুন নেই, উপরওয়ালা মালিক —সে-ও সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। কোম্পানীর কর্মচারীদের তখন একচ্ছত্র আধিপত্য, আর এদের নেতৃপদে সমাসীন লর্ড ক্লাইভ। লবণ, তামাক প্রভৃতি বাংলার প্রধান ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারী সে। ওদিকে শাসনভার হাতে নিয়ে খাজনা আদায় করতে মাত্রা-জ্ঞানও হারিয়ে ফেললে। বাঙালী হ'য়ে পড়ল অর্থের কাঙাল। এর ফলে হ'ল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। আনন্দমঠের গোড়ায় এই মন্বন্তরের চিত্র দেওয়া হয়েছে। এক কোটি বাঙালী দুর্ভিক্ষে মারা গেল। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা তখন মাত্র তিন কোটি। খাজনা আদায় কিন্তু বন্ধ হয় নি। ইংরেজী ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত সমানে আদায় কার্য চলেছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন গবর্ণর। তিনি এর কৈফিয়ৎ স্বরূপ বিলাতে লিখলেন যে, যারা এখনও জীবিত আছে তাদের নিকট থেকে জোরপূর্বক কর আদায় ক'রে অঙ্কের পরিমাণ সমান রাখা হয়েছে! এ হ'ল ১৭৭২ সালের কথা। ক্লাইভ ইতিপূর্বে বিলাতে গিয়ে যখন বসবাস আরম্ভ করেছেন, তখন তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক। বিলাতে তাঁর দুর্নাম হয়েছিল খুব। তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও হয়। মোকদ্দমায় তাঁকে এই ব'লে অব্যাহতি দেওয়া হ'ল যে, গর্হিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করলেও রাষ্ট্রের তিনি যথেষ্ট উপকার করেছেন। ক্লাইভ কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না, আত্মহত্যা ক'রে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ও অজস্র অর্থ বিলাতে নীত হয়েছিল। তিনিও প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন। নানা অপকর্মের জন্য বিলাতে তাঁরও বিচার হয়।

ভারতবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা উল্লেখ ক'রে এডমাণ্ড বার্ক হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে হাউস অফ লর্ডসের সমক্ষে যে বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে বিলাতে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সাত বছর ধ'রে বিচার চলবার পর হেষ্টিংস মুক্তিলাভ করেন। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ স্বয়ং হেষ্টিংসের পক্ষে। বিচার আরম্ভে একশ' ষাট জন উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সাত বছর পরে ১৭৯৫ সালে রায় দেবার সময় উপস্থিত ছিলেন মাত্র উনত্রিশ জন লর্ড! এঁদের অধিকাংশের মতে হেষ্টিংস নিরপরাধ সাব্যস্ত হন। হেষ্টিংস কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমা পরিচালনার ফলে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

১৮০৭ সালে হিসাব ক'রে দেখা যায়, এদেশ থেকে পূর্ববর্তী ত্রিশ বছরে এক হাজার পঁচাশি কোটি টাকা বিলাতে চলে গিয়েছে! তখন ভারতবর্ষের অতি সামান্য অংশই ইংরেজের অধীন ছিল। ভারতের অর্থে ইংরেজ ধনী হচ্ছে, আর সাধারণ ভারতবাসী ক্রমশঃ নিঃস্ব হ'য়ে পড়ছে। এ অবস্থা প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। বিলাতের জনসাধারণ কোম্পানীর দুষ্কার্যের বিরোধী ছিল বটে, কিন্তু কুড়ি বছর অন্তর অন্তর সনন্দ দানের কালেই তাদের প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টে এসব বিষয় আলোচনার অবকাশ পেতেন। তখন নানারূপ আলোচনা চলত, বাদ-বিতণ্ডা হ'ত, কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীদের নিরস্ত করবার বিশেষ কোন পন্থাই আবিষ্কৃত হয় নি। এদেশেও যে-সব ইংরেজ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করত, তাদের চোখে কোম্পানার অপকর্মগুলি বিসদৃশ ঠেকত। তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। তারা কেউ কেউ সংবাদপত্র পরিচালনা করত ও কোম্পানীর যথেচ্ছ কার্যের সমালোচনায় রত থাকত। কোম্পানীর স্থানায় কর্তৃপক্ষ প্রথমে ১৭৯৯ খ্রী. এবং পরে ১৮২৩-এ আইন বিধিবদ্ধ ক'রে তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের পথ বন্ধ ক'রে দেয়। তারা নিজেরা এরূপে নিরঙ্কুশ হ'য়ে রইল! এদেশীয়দের ভিতরে শিক্ষা-বিস্তারেও কোম্পানী উদ্যোগী হয় নি। বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২) ও কলকাতায় মাদ্রাসা (১৭৮১) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন এক দল পণ্ডিত ও মৌলবী সৃষ্টি করা, যাঁরা ইংরেজকে নিজেদের আইন বুঝিয়ে দিতে পারবেন। ইংরেজী শিক্ষাদানে কর্তৃপক্ষ মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করত না। তারা হয়ত ভাবত, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ হ'লে তাদের যথেচ্ছ শাসন অচল

হ'য়ে যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও বিলাতে যখন এই বিশ্বাস ছিল যে, জনসাধারণ শিক্ষালাভ করলে রাজদ্রোহী হ'য়ে উঠবে, তখন কোম্পানীর লোকেরা যে ওরূপ মনে করবে তাতে আর আশ্চর্য কি! তখন ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী ইউরোপকে মথিত ক'রে তুলেছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসার লাভ করলে ভারতবাসীরাও ঐ সব মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে—এ আশঙ্কাও তাদের কারো কারো মনে ছিল। যাই হোক, ১৮১৩ সালে নূতন ক'রে সনন্দ প্রাপ্তির সময় বিলাতের কর্তারা স্থির করলেন—প্রতি বছর কোম্পানীকে ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী না ইংরেজী—কিরূপ শিক্ষার জন্য এই টাকা ব্যয় করা হবে, তার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম ক'রে দেওয়া হ'ল না। আর প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮২৩ সালের পূর্বে এ অনুযায়ী কাজও তেমন কিছু করা হয় নি। এই ১৮১৩ সাল থেকে প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হ'তে থাকে। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি কোম্পানীর সদিচ্ছা কিরূপ ছিল, এ থেকেই তা বেশ বুঝা যায়।

দেশের শিল্প-বাণিজ্য কোম্পানী প্রায় একচেটিয়া ক'রে ফেলেছে। বস্ত্র-শিল্পের আশ্চর্য পরিবর্তন হ'ল একটি কারণে। কোম্পানীর কর্মচারীরা টাকা দাদন দিয়ে তাঁতীদের দ্বারা কাপড় বোনাত। তাদের চাহিদা যত বাড়তে লাগল তাঁতীদের উপর নিপীড়নের মাত্রাও তত বেড়ে চললো। প্রবাদ আছে তাঁতীরা এতই উৎপীড়িত হয়েছিল যে, নিজেরাই নিজেদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলতে লাগল! ওদিকে ব্রিটেনের বাজারে বাংলার বস্ত্রের আমদানী বেড়ে গেল। বাংলার ঢাকাই মস্‌লিন আজ গল্পের বস্তু। তখন কিন্তু মস্‌লিন দেখে ইউরোপবাসীরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হ'য়ে যেত। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বিলাতে নূতন ধরনের চরকা ও তাঁত আবিষ্কৃত হয় এবং বস্ত্রশিল্পের যাদুমন্ত্রও সে-দেশবাসী শিখতে থাকে। এই শিল্পে অনতিবিলম্বে যে যুগান্তর উপস্থিত হবে তার আভাসও পাওয়া গেল এ সময় থেকে। ধনিকগণ সরকারের অনুমতি নিয়ে বস্ত্র-শিল্প চালু করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভারত থেকে আমদানী করা কাপড়ের তুলনায় এ ছিল তখন খুবই নিকৃষ্ট। কি দাম, কি সৌষ্ঠবে কোন দিক দিয়েই প্রতিযোগিতায় এর টিঁকে ওঠা ভার।

তখন বিলাতের কর্তারা ভারতীয় বস্ত্রের উপর অত্যুচ্চ হারে এমন কি শতকরা ২০০ টাকা পর্যন্ত শুল্ক বসালেন। এই শুল্ক ক্রমে এত চড়ে গেল যে প্রতিখণ্ড কাপড়ের দাম নীট মূল্যের চেয়ে বেড়ে দ্বিগুণ তিন গুণ পর্যন্ত হয়েছিল। এরূপ গর্হিত উপায়ে ভারতের বস্ত্রশিল্পের টুঁটি চেপে মারা হয় তখন। ১৮৩০ সালে একজন দুঃখ ক'রে সংবাদপত্রে লিখলেন, ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলার বস্ত্র-শিল্পের এমন দুর্দিন উপস্থিত হয়েছে যে, বাংলায় প্রচুর পরিমাণ বিলাতি বস্ত্র আমদানী হ'তে সুরু হয়েছে! তাদেরই স্বদেশ-বাসীর চেষ্টায় এই উন্নতিশীল বস্ত্র-ব্যবসায়টি যখন মাটি হবার উপক্রম হ'ল তখন কোম্পানীর লোকেরা কিন্তু বসে রইল না, তারা এদেশ থেকে প্রচুর তুলা বিলাতে রপ্তানি করতে লাগল। নীল চাষও তখন তারা ব্যাপকভাবে আরম্ভ করলে এখানে। প্রসিদ্ধ পাদ্রী উইলিয়ম কেরী স্ত্রীপুত্রসহ এদেশে এসে মালদহের অন্তর্গত মদনাবতীর নীলকুঠিতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে চাকরি নিয়েছিলেন।

উইলিয়ম কেরীর কথা থেকে আর একটি বিষয় এখানে এসে পড়ল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে যে প্রভুত্ব স্থাপন করেছে তার কোন ভাগীদার সে যেমন সহ্য করতে পারত না, তেমনি এদেশীয় লোকদের ধর্ম-কর্ম, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতিতে কেউ কোন রকম ব্যত্যয় ঘটাবার চেষ্টা করে এ-ও সে চাইত না। কারণ কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল, এরূপ কার্যে জনসাধারণ তাদের উপর বিরূপ হ'য়ে পড়বে। তাদের ক্ষমতা তখনও এতটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি যে, তারা নির্বিচারে এরূপ করতে দিতে পারে। ইংরেজী শিক্ষাদানে কোম্পানীর বিমুখতার মূলেও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কারণ ছাড়া এরূপ পরোক্ষ সামাজিক কারণও যে না ছিল, এমন নয়। কোম্পানী সে যুগে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের এদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস, পাদ্রীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার আরম্ভ করলে তাদের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ভীষণ ক্ষতি হবে। কিন্তু পাদ্রীরা নাচার। নানা ছল ক'রে তারা এদেশে আসত। কোম্পানী টের পেলেই কিন্তু জাহাজে ক'রে তাদের স্বদেশে চালান ক'রে দিত। উইলিয়ম কেরী খুব কৌশল ক'রে দিনেমার জাহাজে স্ত্রীপুত্রসহ কলকাতায় এসে পৌছেন ১৭৯৩ সালে। নানারূপ

ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে তিনি ১৮০০ খ্রীঃ শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ কার্যে তাঁর সঙ্গে ছিলেন যশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড। কলকাতার গীর্জায় ধর্মোপদেশ দেবার অনুমতিও তাঁকে নিতে হয়েছিল সরকারের কাছ থেকে! যাই হোক, পাদ্রীদের উপর কোম্পানীর বিরাগ শক্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়।

কলকাতার মাদ্রাসা ও কাশীর সংস্কৃত কলেজের কথা আগে উল্লেখ করেছি। রাজনৈতিক কারণে এ দুটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্ররূপেও পরিণত হ'ল। এই প্রসঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির কথাও এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যার উইলিয়ম্ জোন্স এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। স্থানীয় প্রাচ্যবিদ্যা-বিদ্‌দের সহযোগে ১৭৮৪, ১৫ই জানুয়ারি তিনি এই সোসাইটি স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়—এশিয়ার 'মানুষ' এবং 'প্রকৃতি' (Man and Nature) সম্বন্ধে অনুসন্ধান, আলোচনা ও গবেষণা। এ কার্যে কোম্পানীর স্থানীয় কর্মচারীদের মধ্যে প্রাচ্য বিদ্যা-দরদী বহু ব্যক্তি এসে ক্রমে যোগ দিলেন। কিছুকালের মধ্যেই সোসাইটির মুখপত্র স্বরূপ একখানি গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। এর ফলশ্রুতিঃ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্' প্রকাশ। প্রথম সংখ্যায়ই জোন্সের হিন্দু দেবদেবীর উপরে একটি সচিত্র গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। সোসাইটির উদ্দেশ্য যেরূপ বিবৃত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে গবেষণা উৎসাহী লোকদের দ্বারা অবিলম্বে আরম্ভ হয়েছিল। জোন্স বাদে প্রথম থেকে যে সব ইংরেজ এ ধরনের গবেষণায় লিপ্ত হন তাদের মধ্যে গ্লাডউইন, উইনফ্রেড, উইলকিন্স ও হ্যালহেডের নাম আগেই করতে হয়। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জোন্স মারা গেলেন। এর পরে কিন্তু আরও বহু গবেষক এবম্বিধ কার্যে নিজেদের নিয়োজিত করলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন কোলব্রুক, হটন, প্রিন্সেপ, উইলসন এবং এইরূপ আরও অনেকে। সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্' শীর্ষক সাময়িক পুস্তকে এদের বিস্তর রচনা পর পর বা'র হয়। এই সব রচনা

পাঠে বুঝা যায় তাঁদের অনুসন্ধান ও গবেষণা কতটা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল।

সোসাইটির কর্ম প্রয়াসের কথা প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা আমাদের স্বতঃই মনে উদয় হয়। তিনিও সোসাইটির আদর্শে, বলা বাহুল্য, বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েন। ইনি হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বহু দুষ্কৃতির জন্য তাঁর শাসনকাল কলঙ্ককালিমায় লিপ্ত। কিন্তু প্রাচ্য বিদ্যায় তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের নিদর্শন আমরা পাই একটি কার্যের মধ্যে। তিনি উইলকিন্সকে গীতার অনুবাদে সবিশেষ সহায়তা করেন। এর একটি মূল্যবান ভূমিকাও তিনি লিখে দেন। এইরূপে গীতার মহিমা প্রথম ইউরোপে প্রচারিত হবার সুযোগ পেল। সংস্কৃত সাহিত্যের উপর হেস্টিংসের খুবই দরদ ছিল। এ থেকে আরও নানা গ্রন্থ ইংরেজীতে এই সময় অনুবাদ হতে থাকে। জার্মান কবি গ্যেটে শকুন্তলার অনুবাদের অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন। ইংরেজ বিজেতা এবং ভারতবাসী বিজিত এই বোধ তখনও সাধারণ ইংরেজদের মনে দানা বাঁধেনি। কাজেই তাদের অনেকে অকুণ্ঠচিত্তে সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা স্বীকার করতে পেরেছিলেন।

এখানে আর একটি বিষয়েরও কথা বলা প্রয়োজন। কারণ ঐ মাৎস্যন্যায়ের যুগে সমাজস্থিতির পক্ষে এর আবশ্যকতা অনুভূত হয়েছিল খুব বেশী করে। এ ব্যাপারে অবশ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা মাদ্রাসা বা বারাণসী সংস্কৃত কলেজের সাক্ষাৎ যোগ ছিল না। তথাপি এখানে এ বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলি। এ দেশে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একটি অভাব বিশেষ করে অনুভব করতে থাকেন। মুসলমান সমাজের জন্য নির্দিষ্ট দেওয়ানি বিধি রয়েছে, আর তার ব্যাখ্যা করতেন পরবর্তীকালের মাদ্রাসায় শিক্ষিত মৌলবীরা। কিন্তু হিন্দু সমাজের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বড়ই মতভেদ। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এইরূপ মত-ভেদের একটি সমাহার করাতে প্রয়াসী হন তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা। কিন্তু তা বহু বৎসর পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। স্যার উইলিয়ম জোন্স শুধু প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্ নন, তিনি ন্যায়াধীশও বটেন। জোন্স বিশেষভাবে এই ব্যবস্থার দোষত্রুটি অনুধাবন করতে সক্ষম হন। হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের ভিত্তিতে

মত বৈষম্য সত্ত্বেও একটি সাধারণ গ্রাহ্য ব্যবস্থার প্রচলন হতে পারে এই বিশ্বাসে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের কথা ভাবতে শুরু করেন। যে ভাবনা সেই কাজ। জোন্স খুঁজে পেলেন সে যুগের পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ত্রিবেণী নিবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে (১৬৯৪-১৮০৭ খ্রীঃ)। তিনি বুঝলেন এই পণ্ডিতই ঐ বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি। জোন্স ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট কর্ণওয়ালিসকে এই রূপ একখানি ব্যবস্থাগ্রন্থ প্রণয়নের নিমিত্ত জগন্নাথের নাম সুপারিশ করেন। কর্ণওয়ালিস জোন্সের সুপারিশ গ্রহণ করে তাঁরই পরামর্শ মত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে ঐ সনেই এ কার্যে নিয়োজিত করলেন। চার বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর (১৭৯২ খ্রীঃ) তর্কপঞ্চানন 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ পূর্বেকার ব্যবহার শাস্ত্রাদির ভিত্তিতে প্রণয়ন করেন। শাসন কর্তৃপক্ষের বুঝবার যাতে সুবিধা হয় সে জন্য পরবর্তী বড়লাট স্যার জন শোর (পরে লর্ড টেনমাথ) ম্যাজিস্ট্রেট কোলব্রুককে দিয়ে এই বিখ্যাত গ্রন্থখানির একটি প্রামাণ্য ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করান (১৭৯৮)। এই কোলব্রুকই পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ হেনরি হারবার্ট কোলব্রুক। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সামাজিক বিধি ব্যবস্থা স্থিরীকরণের পক্ষে 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' গ্রন্থের কার্যকারিতা কখনও ভুলবার নয়।

কলকাতা মাদ্রাসা এবং বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা কিছু পূর্বে বলেছি। এরূপ আর একটি সরকারী উদ্যোগের কথা এখন বলব। পূর্ব দু'টির মত এ প্রতিষ্ঠানেরও বিশেষ পার্থক্য ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে। পূর্বেকার প্রতিষ্ঠান দু'টি যেমন দেশীয় আইন বুঝাবার জন্য মুসলমান মৌলবী এবং হিন্দু পণ্ডিতদের তৈরি করতে উদ্যোগী হয় এ নতুন প্রতিষ্ঠানটিও তেমনি নবাগত ইংরেজ যুবক সিবিলিয়ানদের দেশ শাসনের যোগ্য করে তোলবার জন্য স্থাপিত হ'ল,—এর নাম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বড়লাট ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কলেজটি প্রতিষ্ঠা করলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মূল উদ্দেশ্য—বিলাতের হেলিবারিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুব-সিবিলিয়ানদের কলকাতায় রেখে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণের পূর্বে কিছুকাল ধরে প্রাচীন সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি সমেত বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সমূহের সঙ্গে তাদের ওয়াকিবহাল করা। প্রাচীন ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটলে এই নবাগত

কর্মীরা এদেশের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের পরিচয়লাভের সুযোগ পাবে। আবার যারা যে প্রদেশে কর্মরত থাকবে সেই প্রদেশবাসীর ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে শাসন কার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। মূলতঃ শাসন সৌকর্যার্থ এর প্রতিষ্ঠা হলেও আমাদের দিক থেকে ফল হয়েছিল খুবই শুভ ও সুদূর-প্রসারী। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আনিয়ে অধ্যাপনা কার্যে নিয়োগ করা হ'ল। বাংলা, মারাঠী, ওড়িয়া, হিন্দুস্থানী, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি ভাষাভাষী পণ্ডিতদের সমাবেশ হ'ল কলকাতায়।

প্রাচীন ভাষাগুলির মত আঞ্চলিক ভাষানিচয়ও কাব্য সাহিত্য-সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু ভাষা শিক্ষা দিতে হলে গদ্যের আশ্রয় নেওয়া দরকার। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা এ দিক দিয়ে ছিল অনেকটা অনগ্রসর। কাজেই এই সব অঞ্চলের পণ্ডিতদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পাঠোপযোগী পুস্তক গদ্যে প্রণয়নের আয়োজন হয়। এক একটি বা ততোধিক ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন ইউরোপীয় বিদ্বজ্জন, যেমন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাঙলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হলেন উইলিয়ম কেরী। এদের নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রদেশাগত সুধীগণ গ্রন্থাদি গদ্যে রচনায় অভিনিবিষ্ট হন। এ রূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নানা আঞ্চলিক গদ্য সাহিত্যের, এক কথায়, লালনের ভার নিলেন। কলেজে নিযুক্ত কর্মীগণ বাদে বা'র থেকেও অনেকে পুস্তকাদির অনুবাদে এবং মৌলিক গ্রন্থাদি রচনায়ও প্রবৃত্ত হলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ কার্যে আর্থিক সাহায্য দিয়ে গ্রন্থকারদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। শুধু সাহিত্য পুস্তকই নয়, ভাষা শিক্ষার উপযোগী ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতিও সংকলনে হাত দেন এই সব কর্মী-সাহিত্যিক বর্গ।

এখানে বাঙলার কথা একটু বিশেষ করে বলি। অনেকে মনে করেন বাঙলা গদ্যের গোড়া পত্তন হয় এই কলেজে। আগেও দলিল, পত্র প্রভৃতি গদ্যেই লেখার রেওয়াজ ছিল, কিন্তু তা ছিল সাধারণ পাঠকের নিকট অগ্রাহ্য এবং বহুলাংশে অবোধ্য। এই কলেজেই বাঙলা গদ্য একটি স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করলে। অধ্যাপক কেরী এবং তাঁর বাঙালী পণ্ডিত কর্মীগণ এ কার্যে প্রায় প্রতিষ্ঠাবধিই ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনায় এবং

ব্যাকরণ অভিধান সঙ্কলনেও অন্যান্য ভাষার মত বাঙলায়ও পুস্তক বা'র হতে থাকে। বাঙালী লেখকদের মধ্যে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, তারিণী চরণ মিত্র, মোহন প্রসাদ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্যসেবীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেরী নিজেও গ্রন্থ রচনা করেন। আধুনিক বাঙলা গদ্যের যেমন গোড়াপত্তন হ'ল এখানে তেমনি চলিত ও সাধু রচনা-রীতিরও সূচনা দেখি এ সময়কার কোন কোন বইয়ের মধ্যে।

উইলিয়ম কেরীর কথা এই মাত্র আমরা পেলাম। তিনি ছিলেন, আগেই বলেছি, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-পাদ্রী। এই মিশনের তত্ত্বাবধানে পাদ্রীদের দ্বারা প্রাচ্য ভাষা সাহিত্য, মায় ক্লাসিকস্ চর্চা হতে লাগল অবিরাম। তাঁদের প্রযত্নের ফল নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়ে বিশ্বজনের গোচরীভূত হতে লাগল। একদিকে শ্রীরামপুর মিশন এবং অন্যদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এ দুয়ের দরুনই ইংরেজ সিবিলিয়ানেরা আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার নূতন করে সুযোগ পেলে। আগে থেকেই কিন্তু রাজকার্যে নিযুক্ত কোন কোন সিবিলিয়ান সংস্কৃতাদি ক্লাসিকস্ চর্চায় অবহিত হয়েছিলেন। এদের প্রধান রূপে আমরা হেনরি টমাস কোলব্রুকের নাম উল্লেখ করতে পারি। পাশ্চাত্ত্যের পক্ষে প্রাচ্যের জ্ঞান গরিমা উপলব্ধি করা এদের মারফত বিশেষ করে সম্ভব হ'ল। আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর নিকটও তার নিজস্ব সম্পদ অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হ'ল।

একটু আগেই মুদ্রাযন্ত্রের কথা বল্‌লাম। এর মারফত সব প্রাচীন ও আধুনিক বই পুঁথি প্রকাশের সুবিধা হ'ল। শ্রীরামপুর ছাপাখানার কথা বলেছি। এরও আগে কিন্তু হুগলীতে ছাপাখানা করেছিলেন গীতার অনুবাদক সুবিখ্যাত উইলকিনস্। এ বিষয়ে সহকারী ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। হালহেড ইংরেজী ভাষায় প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ (১৭৭৮) লিখলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের নির্দেশে হেন্‌রি পিটস্ ফরস্টার সর্বপ্রথম বাঙলায় দেশীয় আইন সঙ্কলিত করেন। এ আইন 'কর্ণওয়ালিশ কোড' নামে অভিহিত। উইলকিন্সের সহকারী পঞ্চানন কর্মকার পরে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বাঙলা হরফের ছেনি কাটাতেও নিযুক্ত হন। বাঙলার ছাপাখানার

প্রথম দিককার ইতিহাসে উইলকিন্সের সঙ্গে পঞ্চাননকেও আমাদের স্মরণ করতে হয়।

এখন কোম্পানীর কার্যকলাপ তথা রাজ্য বিস্তারের কথা কিছু বলি।

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাকে ভিত্তি ক'রে ভারতবর্ষের নানা দিকে তারা অভিযান চালায়। মাদ্রাজ তাদের করতলে। দক্ষিণে মহীশূরে টিপু সুলতান তখন ইংরেজের ঘোর বিরোধী। টিপুর বিরোধিতা তখন এতই চরমে ওঠে যে, নেপোলিয়ন পর্যন্ত তাঁকে ইংরেজের যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানে 'ব্রাদার টিপু' বা 'ভাই টিপু' সম্বোধন ক'রে পত্র লিখেছিলেন! দক্ষিণ-পশ্চিমে মরাঠা শক্তিও প্রায় অস্তমিত। কোম্পানী পেশোয়ার পক্ষ নিয়ে মরাঠা শক্তির মূলে কঠোর আঘাত দিচ্ছে। ১৮১৭-১৮ সালের শেষ মরাঠা যুদ্ধে মরাঠা শক্তি বিলুপ্ত হ'ল এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারত পুরোপুরি ইংরেজের অধীন হ'য়ে পড়ল। পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহ শিখ শক্তি সংহত ক'রে খুবই প্রবল হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বরাবর ইংরেজের বন্ধুই ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পরে ১৮৪৯ সালে পঞ্জাব ইংরেজের অধীন হয়।

কিন্তু এ পরবর্তীকালের কথা। নিজামের সাহায্যে টিপু সুলতানকে পরাজিত করেই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকৃত প্রস্তাবে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তার করে। বাংলায় কিন্তু এর বহু পূর্বেই ইংরেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে সমাজ-সংরক্ষণের তাগিদে বাংলার জনকয়েক ধনী-মানী, হিন্দু-মুসলমান একযোগে কোম্পানীর হস্তে দেশ-শাসনের ভার তুলে দিয়েছিলেন, পঞ্চাশ বছরের অবিরাম চেষ্টার ফলে তা অনেকটা সুসিদ্ধ হ'ল। ধন-প্রাণ, মান-সম্মান বজায় রেখে সমাজে শান্তিতে বসবাস করবার এই যে বাঙালীর আগ্রহ তার জন্য তাকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি। স্বদেশের শাসনভার বিদেশীর হাতে তুলে দিতে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্প-বাণিজ্যও বিলুপ্ত হ'ল। বিদেশীর নির্মম কর আদায়ে শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত চলে গেল। শান্তি-শৃঙ্খলার কতটা ব্যাঘাত ঘটলে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ও ধনপ্রাণ নিয়ে বসবাসের অধিকার থেকে কতখানি বঞ্চিত হ'লে লোকে এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, আজকের দিনে তা কল্পনারও অতীত।

কোম্পানীর ভুজাশ্রয়ে বহুকাল-ঈপ্সিত, বহুজন-বাঞ্ছিত শান্তি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ভূমির বন্দোবস্ত আগে পাঁচসালা, পরে দশসালা ও শেষে চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় এসে পাকা হ'য়ে গেল। এই পঞ্চাশ বছরে কত ভূস্বামীর উত্থান হলো, কত ভূস্বামীর পতন হলো তার ইয়ত্তা নেই। পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক শ্রেণীর স্থায়ী ভূস্বামীর সৃষ্টি হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন ক'রে বাংলা দেশে স্থায়ী শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। সেকালে যত বড়লোক উদ্ভূত হয়েছিল তার অধিকাংশই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল। ইংরেজের আশ্রয়ে এক শ্রেণীর বাঙালী আগেই বর্ধিত হ'য়ে উঠেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল তারাও অনেকটা ভোগ করতে পেরেছিল। এই শ্রেণীর বাঙালী বড়লোকদের সঙ্গে কোম্পানীর বড় বড় চাকুরেদের বেশ দহরম-মহরম ছিল। সামাজিক মেলামেশা এদের দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। ইংরেজরা কোন কোন ভারতীয় রীতি গ্রহণেও বাধা বা সঙ্কোচ বোধ করত না। লর্ড ক্লাইভ মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী হামেশা যেতেন। সাম্প্রতিক কালে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর বা ওয়াভেলের পক্ষে কলকাতার বা দিল্লীর কোন বড়লোকের বাড়ীতে হামেশা যাতায়াত কল্পনায়ও আসে না।

ইংরেজ-অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাঙলায় যে শ্রেণীর বড়লোকের সৃষ্টি হ'ল, তারা ইংরেজকে পরিত্রাতা ব'লেই গণ্য করতে লাগল। কোনদিন ইংরেজের স্বার্থে ও তাদের স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হ'তে পারে, এটা তারা তখন ধারণাই করতে পারে নি। তখন কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্তদের মধ্যেও এক দল নূতন বড়লোকের আবির্ভাব হ'ল। তারা সরকারে ও সওদাগরী আপিসে চাকরি ক'রে সম্পত্তি করলে। ইংরেজদের সম্পর্কে এসে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার মহিমাও কিছু কিছু বুঝলে। রাজা রামমোহন রায় ভূস্বামীর সন্তান হ'লেও ক্রমে এ শ্রেণীরই মুখপাত্র হ'য়ে পড়েন।

মুক্তিকামী রামমোহন

যে সমাজে রামমোহন রায়ের জন্ম তাকে আমরা সে-যুগের মধ্যবিত্ত সমাজ বলতে পারি। তাঁর জন্ম হয় ১৭৭৪ সালে*। এর ত্রিশ বছরের মধ্যে দীর্ঘকাল অনাচার-অত্যাচার সহ্য করার পর সমাজ আবার দৃঢ়ীভূত হবার সুযোগ পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমির মালিকানা স্বত্ব স্থির হ'লে মধ্যবিত্ত বাঙালীরা তা থেকে লাভবান হ'তে থাকে। জমিদার-সরকারে ও সওদাগরী আপিসে চাকরি ক'রেও এরা বেশ দু' পয়সা রোজগার করে। কোম্পানীর নিমক মহালে এজেন্টের পদ নিয়ে বহু মধ্যবিত্ত বাঙালী লক্ষপতি হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর নিমক মহালে চাকরি ক'রে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৮১৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঢাকা-জালালপুর, রামগড়, রংপুর প্রভৃতি স্থানে সেরেস্তাদারী ক'রে রামমোহন ঐ সনের জুলাই-আগষ্ট মাসে যখন কলকাতায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেন, তখন তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। দেশী-বিদেশী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর খুবই প্রতিপত্তি। তিনি ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে তাঁদের সাহায্যে গ্রীক, লাটিন, হিব্রু শিখে নিয়েছেন। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এর মধ্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি জন্মেছে। ফারসী ও সংস্কৃত যৌবনেই তিনি আয়ত্ত করেন। তিনি বিভিন্ন ইংরেজ সিবিলিয়নের মুন্সীর (সেরেস্তাদার) কার্য করেন। জানা যায় এদের নিকট থেকেই তিনি ইংরেজী ভাল করে শিখে

---

* এতদিন এই সনটিকেই জন্ম বৎসর বলা হয়েছে। ব্রিস্টলস্থিত তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে এই সন রয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স যে ৫৯ বৎসর হয়েছিল সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় এইরূপ লিখিত হয়। বর্তমানে কিন্তু, কি কারণে জানিনা, রামমোহনের জন্ম বৎসর দুই বছর পিছিয়ে ১৭৭২ বলা হচ্ছে। তাঁর দুইশত বৎসর জন্ম বার্ষিকী ১৯৭২ সনে অনুষ্ঠিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। জন্ম সনটিকে পিছিয়ে দেওয়ার ভিত্তি কি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায় নি। দ্বারকানাথ ঠাকুর স্মৃতি ফলকের স্থাপয়িতা। কাজেই এই সনটিকে জন্ম বৎসর ব'লে গ্রহণ করা বিধেয়।

বি. দ্র.—১৯৭২ সনের ২৭শে মে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় রামমোহন দ্বিশত জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে।—অনুলেখক।

নেন। তবে এর আগে থেকেই তিনি নানা ব্যাপারে ইংরেজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ১৮০৯ সনের পূর্বেই রামমোহন যে এই ভাষায় কতখানি ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। ঐ সনে বড়লাট মিণ্টোকে লেখা চিঠিতে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার জানা যাচ্ছে। মানুষ হিসাবে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বোধ তাঁর মনে কত গভীরভাবে দৃঢ়বদ্ধ ছিল চিঠিখানি তারও একটি উৎকৃষ্ট দলিল।

রামমোহন কলকাতায় বসতি-স্থাপনের পূর্বে ১৮১৪ সালের ১০ই এপ্রিল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ ফুরোবার কথা ছিল। এজন্য ১৮১৩ সালে কোম্পানীকে নূতন সনন্দ-দান সম্বন্ধে বিলাতে আলোচনা চলে ও আইন পাস হ'য়ে যায়। রাজ্য-শাসনে এবং ব্যবসায়-পরিচালনায় কোম্পানীর এতদিন একচেটিয়া অধিকার ছিল। এবারে কতগুলি শর্তে অন্যকেও ভারতবর্ষে ব্যবসায় করবার অধিকার দেওয়া হ'ল। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ ব্যতিরেকে দেশ-শাসনের যাবতীয় ভারই কোম্পানীর হাতে রইল। আর দুটি বিষয় যা স্থির হ'ল তার সঙ্গে ছিল আমাদের শুভাশুভের ঘনিষ্ঠ যোগ। এতদিন কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্যে পাদ্রীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে কোনরূপ উৎসাহ দেওয়া হ'ত না। বরং এ ব্যাপারে নানারূপ বাধা নিষেধই বলবৎ ছিল। এবারে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সমস্ত বাধা প্রকাশ্যভাবে তুলে দেওয়া হ'ল। সরকারী যাজক-বিভাগ খুলে একজন বিশপ ও দু'জন আর্চডিকন সরকারী অর্থে পোষণেরও ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল, ভারতবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বাৎসরিক লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ। এ দুটি ব্যাপারে আজ হয়ত মোটেই বিস্ময়ের উদ্রেক হবে না। কিন্তু তখনকার দিনে এ খুব নূতন কার্য ব'লেই সাধারণের নিকট প্রতিভাত হয়েছিল। ধর্ম ও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য এদেশে আগমনেচ্ছু লোকদের উপর কোম্পানীর বাধা-নিষেধ রহিত হ'য়ে গেল।

মাৎস্যন্যায়ের যুগে হিন্দু সমাজ ঘোরতর রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। নূতনকে নিজের ক'রে নেবার শক্তি সে হারাতে বসেছিল। ওদিকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন, সতীদাহ-প্রথা প্রভৃতি বহু কুরীতি আর বহু দেবদেবীর পূজার্চনা-বিধি দেখে হিন্দুধর্মের নিকৃষ্টতা প্রচারে কায়মনে লিপ্ত

হলেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু হিন্দুধর্মের অন্ধকার থেকে খ্রীষ্টতত্ত্বের আলোতে সকলকে নিয়ে যাওয়া। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের নেতৃত্বে এই কার্যভার পরিচালনা করে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর শিক্ষার ফলে সিবিলিয়ানদের ভিতরেও উক্ত মনোভাব বদ্ধমূল হ'তে লাগল। পূর্ব শতাব্দীতে ইংরেজ কর্মচারীরা যেমন এদেশীয়দের আপন ক'রে নিতে পেরেছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষালব্ধ সিবিলিয়ানদের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হ'ল না। ইংরেজ ও ভারতবাসী এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের ভাব এ সময় থেকে সুরু হয় বলা চলে। নূতন সনন্দে যখন স্পষ্ট ক'রে ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হ'ল, তখন খ্রীষ্টান মিশনরীদের আর কোন বাধাই রইল না। তাদের কার্য এর পর পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হ'ল। রামমোহন রায় সুশিক্ষিত। নানা শাস্ত্র আলোচনা ক'রে হিন্দু ধর্মের মূল কথা জেনে নিয়েছেন। স্বদেশবাসীদের গোঁড়ামি ও দৈন্যদশা তাঁকে যেমন ব্যথিত করলে, খ্রীষ্টান মিশনরীদের অযথা আক্রমণ তাঁকে তার চেয়ে কম পীড়া দিলে না।

কয়েক বছর পূর্বেই ১৮০৪ সালে রামমোহন একেশ্বরবাদ সমর্থন ক'রে 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌দিন' নামে একখানা ফারসী পুস্তক লেখেন। এখন, কলকাতায় বসবাস আরম্ভ ক'রেই (১৮১৪ সালের মাঝামাঝি) তিনি বেদান্তের ভাষ্য লিখতে প্রবৃত্ত হলেন। হিন্দুশাস্ত্রের সারতত্ত্ব বেদান্ত গ্রন্থ। বেদান্ত একেশ্বরবাদের সম্পূর্ণ পরিপোষক। হিন্দুধর্মের উচ্চতম সাধন এই একেশ্বরবাদ।

রামমোহন ইতিমধ্যেই ইংরেজের সংঘশক্তির পরিচয় পেয়েছেন। তিনি কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করে প্রথমেই তখনকার দিনের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মিলন ক্ষেত্র স্বরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। নাম দিলেন: আত্মীয় সভা। (প্রতিষ্ঠা :৮১৫)। দেখি ঐ সময়কার এবং পরবর্তীকালের বিস্তর বিখ্যাত ব্যক্তি এই সভায় যাতায়াত সুরু করে দিয়েছেন। এদের মধ্যে কিন্তু রাধাকান্ত দেবও ছিলেন। রামমোহন একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। আত্মীয় সভার মাধ্যমে তিনি এর প্রচারে ব্রতী হন। তখন থেকে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা এর সংস্রব ত্যাগ করতে থাকেন। এই আত্মীয় সভায়ই রামমোহন একটি বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। এ থেকে·

কেমন করে একটি ইংরেজী বিদ্যায়াতন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় পরে আমরা তা দেখতে পাব। আত্মীয় সভা ক্রমে একটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। একে কেন্দ্র করেই রামমোহনের সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেশ জোরালো হয়ে ওঠে। একেশ্বরবাদ সূচক বিভিন্ন উপনিষদের তিনি এ সময় মূলে ও অনুবাদে প্রকাশ করেছিলেন একটু আগেই বলেছি। তিনি বাইবেলের উপরেও বই লেখেন। মিশনরীরা এই সময়ে ভাবতে লাগলেন রামমোহন বুঝি বা শীঘ্রই খ্রীস্টান ব'নে যাবেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা যে কত ভুল তার প্রমাণ পেতেও বেশী বিলম্ব হয়নি। একবার পাদ্রিদের পরিচালিত পত্রিকায় হিন্দু ধর্মের নিন্দা বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। রামমোহন যথা সময়ে এর উত্তর দিলেন। কিন্তু পত্রিকা কর্তৃপক্ষের এই উত্তর হুবহু ছাপতে আপত্তি থাকায় রামমোহন নিজেই একখানি কাগজ বা'র করলেন। এখানির ইংরেজী সংস্করণ 'ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন' এবং বাঙলা—'ব্রাহ্মণ সেবধি'। সেবধিতে তিনি এই মর্মে লিখলেন যে, পরাধীন ভারতীয়দের ধর্ম নিয়ে নিন্দা মন্দ করা অতি সহজ। ধর্ম প্রচারকগণ একবার তুরস্ক বা পারস্যে গিয়ে তথাকার ধর্মের নিন্দা এবং খ্রীষ্ট ধর্মের প্রশংসা ও প্রচারে লিপ্ত হয়ে দেখুন না! এ কার্যে লিপ্ত হলে বুঝতে পারবেন স্বাধীন দেশে স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্মের নিন্দা এবং তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের ফলাফল তাদের কতখানি ভোগ করতে হয়। হিন্দুর ধর্ম চর্যায় প্রতিমা পূজারও যে স্থান রয়েছে সে সম্বন্ধে রামমোহন স্বীয় অভিমত এই প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেন। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বহু দেবতার পূজার জন্য হিন্দু ধর্মের নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিল। এবারে রামমোহন রায়ের শাস্ত্রব্যাখ্যায় এবং ধর্মীয় আলোচনার ফলে তারাও অনেকটা নিরস্ত হ'তে বাধ্য হ'ল। বস্তুতঃ রামমোহন খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ব বা তিন ভগবানের উপাসনার ঘোর সমালোচনা ক'রে তারা যে হিন্দু পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদের অনধিকারী তাই প্রমাণ ক'রে দিলেন।

একদিকে একেশ্বরবাদ প্রচার এবং সতীদাহ বিরোধী সমাজ সংস্কার আন্দোলনে এই সময়কার রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁর উপরে বিরূপ হয়ে উঠেন। অন্যদিকে তেমনি খ্রীষ্টান পাদ্রিদের নিকটেও তিনি হলেন ঐ সব কারণে চক্ষুশূল।

কিন্তু কিছুতেই রামমোহন দমবার পাত্র নন। তিনি ছিলেন পূর্ণ স্বাদেশিক। হিন্দুত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে লড়লেন। যেমন একটু আগে বলেছি, রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা' উচ্চতর হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত আলোচনার নিমিত্ত সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ উদ্যোগ। এই আত্মীয় সভার অনুক্রম হ'ল ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ।

পাদ্রীদের আর এক দফা আক্রমণ ছিল হিন্দুদের সামাজিক কুরীতিগুলির উপরে। রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে দেখিয়ে দিলেন, প্রগতিশীল হিন্দুগণ আত্মসংগঠন ও শুদ্ধিতে সম্পূর্ণ অবহিত। মধ্যযুগের কুসংস্কার সমাজদেহকে কলুষিত করলেও তা একেবারে অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে যায় নি রামমোহন রায়ের ঘোর প্রতিবাদে এবং প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়ে বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে আইন দ্বারা সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন।

রামমোহন পূর্ব দশকেই সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন সক্রিয়ভাবেই সুরু করে দিয়েছিলেন, এই মাত্র বল্লাম। জজ পণ্ডিতরূপে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার শাস্ত্রীয় নির্দেশ জানাবার জন্য আদিষ্ট হয়ে এই সময় কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানান যে, সতীদাহ প্রথার শাস্ত্রীয় নির্দেশ নেই। তাঁরাও এই-রূপে প্রশাসনের দিক থেকে ব্যবস্থাটির যথোপযুক্ত সংকোচ বিধানে যত্নপর হয়েছিলেন। এতদিন পরে এই মারাত্মক প্রথা রহিত হওয়ায় রামমোহন এবং তাঁর প্রগতিশীল বন্ধুগণ যে উৎফুল্ল হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! রামমোহনের নেতৃত্বে তারা বেণ্টিক মহোদয়কে একখানি অভিনন্দন পত্রও প্রদান করলেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা কিন্তু সামাজিক বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের দরুন খুবই খাপ্পা হয়ে ওঠেন। তারা বিলাতে আপীল পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হয়নি। এ সময় রামমোহন বিলাতে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বড়ই লক্ষণীয়। সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনকালে রামমোহন এ সম্পর্কে পুস্তক—পুস্তিকা প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি। নারীজাতিকে স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে দু'টি ব্যাপারের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রথম, নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সম্পত্তিতে, তা পৈতৃকই হোক বা পতির নিকট হতে প্রাপ্ত হোক নারীর উত্তরাধিকার

স্বীকার করে নিতে হবে। তাই, দেখি, রামমোহন সতীদাহ বিরোধী নেতিবাচক আন্দোলনই তখন শুধু করেন নি তিনি নারীজাতি সম্পর্কে স্থায়ী গঠনমূলক কার্যের কথাও লিখিতভাবে আমাদের জানান। আজিকার দিনেও তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের ফলে বাঙলা ভাষা সাহিত্য যেন সজীব হয়ে উঠল, আর এ তখন নূতন গতি পেলে।

রামমোহনের কলকাতায় বসতি-স্থাপনের সাত-আট বছরের মধ্যেই এখানে শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক নানা প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এসময়কার দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ভারতবাসীদের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ও দেশীয় ভাষাসমূহে সংবাদপত্র প্রকাশ। দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করেই রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন সুরু হয় এবং তাঁর স্বাধীনতা-প্রীতি সাধারণের গোচরে আসে।

কিন্তু এরূপ স্বাধীন মতামত প্রকাশ গবর্ণমেণ্টের বেশীদিন বরদাস্ত হ'ল না। তারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে মনস্থ করল। তাদের এ চেষ্টা নূতন নয়। এদেশের প্রথম সংবাদপত্র, অবশ্য ইংরেজী, ১৭৮০ সালের ১২শে জানুয়ারী জেম্‌স আগষ্টাস হিকি সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেট'। প্রকাশের পর দু'বছর যেতে না যেতেই এ কাগজখানাকে কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বন্ধ ক'রে দেয়। কারণ, সরকারের মতে হেষ্টিংসের স্ত্রী ও পদস্থ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মানহানিকর মন্তব্য এতে স্থান পেয়েছিল। এর পর 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' প্রভৃতি আরও কয়েকখানা কাগজ প্রকাশিত হয়। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এসব কাগজের উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। কেননা, এসবে শাসন ব্যবস্থার ও রাজ্য জয়ের গর্হিত উপায়গুলির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হ'ত। একারণে ১৭৯৯ সালের মে মাসে লর্ড ওয়েলেস্‌লী সর্বপ্রথম এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করলেন। এ বিষয়ে পূর্বে কিছু আভাস দিয়েছি। নিয়ম হ'ল, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত না হ'য়ে কোন সংবাদ, সম্পাদকীয় এমন কি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চলবে না।

ফল কি হ'ল শুনুন। কাগজ ছাপা হবার পূর্বে আবশ্যক সময় পাওয়া

RT — 27086

গেলে সেক্রেটারীর আপত্তিকর অংশ বদলে দেওয়া হতো। কিন্তু দেখা যেত প্রায়ই ছাপা হবার সমসময়ে এইরূপ সংশোধনের বা পরিবর্তনের নির্দেশ এসেছে। তখন কি করা যায়? তাড়াতাড়ি ঐ সব অংশে বাদ দিয়ে তারকা চিহ্ন বসিয়ে সংবাদাদি ছাপা হতে লাগল। প্রায় দুই দশক চলবার পর তৎকালীন বড়লাট লর্ড ময়রা এ নিয়ম তুলে দিতে বাধ্য হলেন। কারণটি বড়ই কৌতুককর। এ কথাও একটু বলি। সংবাদ পত্রের মালিক ছিলেন ইউরোপীয়েরা। বলা বাহুল্য কার্যত পত্র সম্পাদনাও তাঁরাই করতেন। কিন্তু আইন বড় কঠোর। কোন রকম ব্যত্যয় হলেই লাইসেন্স বাতিল করে দিয়ে এদের বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়ার বিধি ছিল। তাই তারা কি করেন? দেশীয় ফিরিঙ্গিদের নামে সম্পাদকের লাইসেন্স নিতেন ঐ রকম বিধি নিষেধ এড়াবার জন্য। ১৮১৮ সনে পূর্বোল্লিখিত কৌতুককর ঘটনাটি ঘটে। হিট্‌লি নামক একজন সম্পাদকের উপর বিধি অমান্য হেতু লাইসেন্স বাতিল করে দিয়ে স্বদেশে নির্বাসনে পাঠাবার হুকুম হ'ল। কিন্তু হিট্‌লি বল্লেন তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি এবং পুরাপুরি ভারতীয়। ভারতবর্ষই তার স্বদেশ। কাজেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোথায় পাঠাবেন? বড় বিপদের কথা! প্রচলিত বিধির কার্যকারিতা এ রকম অচল হতে দেখে তারা ভাবনায় পড়লেন। উপয়ান্তর না দেখে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সাপেক্ষে এ বিধি রহিত হ'ল। কিন্তু তলে তলে তারা চেষ্টায় রইলেন কি ভাবে এমন একটি ব্যাপক বিধি চালু করা যায় যার ফলে সংবাদপত্র সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে। পত্র পত্রিকা তখন সাময়িক ভাবে হলেও শৃঙ্খল মুক্ত।

এই সময় থেকে ১৮১৮-২৩ এই ক'বছরের মধ্যে ইংরেজী বাংলা ফারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় পত্র পত্রিকা প্রকাশের ধুম পড়ে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকখানির মাত্র এখানে উল্লেখ করি।

১৮১৮ সালের মে-জুন মাসে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম দুখানা সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর মিশনের তত্ত্বাবধানে পাদ্রী মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান; 'বাংলা গেজেট' প্রকাশিত হয় কলকাতার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়ের সহযোগে বাংলা গেজেট ছাপাখানা হ'তে। রামমোহনের বন্ধু সিল্ক বাকিংহামের ইংরেজী

'ক্যালকাটা জার্নাল' ১৮১৮ সালের ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হ'ল। রামমোহন রায়ের তত্ত্বাবধানে 'সম্বাদ কৌমুদী' বের হয় ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে মতান্তর ঘটায় কাগজখানির ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে রামমোহনের অন্যতর সহযোগী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৌমুদীর সংস্রব ত্যাগ করেন এবং নিজে 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করলেন। 'সম্বাদ কৌমুদীতে' রামমোহন নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখতেন। এর অনেকগুলির অনুবাদ 'ক্যালকাটা জার্নালে' প্রকাশ করা হ'ত। তখন ফারসী সমগ্র ভারতের আদালতের ও শিক্ষিত জনের ভাষা। রামমোহন রায় 'মিরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' নামক ফারসী সংবাদপত্র সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে। বাংলা 'সম্বাদ কৌমুদী' ও ফারসী 'মিরাৎ-উল্‌-আখবার'-এ রামমোহন নানা বিষয়ে তাঁর স্বাধীন মতামত নির্ভীকভাবে প্রচার করতে লাগলেন।

শুধু রাজনীতিক বিষয়েই নয় রামমোহন বিভিন্ন নিবন্ধে সমাজের উন্নতি-মূলক নূতন নূতন প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর মধ্যে যেটি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হ'ল দেশীয় জনগণের মধ্যে জীবন বীমা প্রচলন। দেশ তথা জাতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে এইটিও যে একান্ত দরকার তাও তিনি নানা যুক্তি দিয়ে দেখালেন। দু খানি ইংরেজী কাগজের এখানে উল্লেখ করি। একখানি হ'ল ১৮২২ সনে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া গেজেট', সম্পাদক ডক্টর জন গ্রাণ্ট। কাগজখানি ছিল মধ্যপন্থী। এই সময়ে কোম্পানির কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সমর্থনে মুখ্যতঃ তাদেরই কার্যকলাপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হ'ল এক নূতন ধরণের কাগজ— 'জনবুল'। এখানি পরে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ইংলিশম্যানে' রূপান্তরিত হয়।

সংবাদপত্র তখন শৃঙ্খল মুক্ত। কি দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র কি অন্য—প্রায় সব কাগজেই কর্তৃপক্ষের রাজ্য বিস্তার কার্য এবং প্রশাসনিক নীতির তীব্র সমালোচনা বা'র হতে লাগল। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ছিলেন অত্যধিক সজাগ। বড়লাট ময়রা তার দুই জন প্রধান সচিবকে নিযুক্ত করলেন এই সকল কাগজ সম্পর্কে মন্তব্যলিপি তৈরি করবার জন্য। ডব্লু. বি. বেলির উপর ভার পড়ল দেশীয় পত্র পত্রিকা সম্পর্কে মন্তব্য লিখবার। জন এডাম নিলেন ইংরেজী

কাগজের ভার। এই মন্তব্য দু'টির ভিত্তিতেই তৎকালীন সংবাদপত্রকে আবার শৃঙ্খলিত করার ব্যবস্থা হয়। ময়রা তখন বিদায় নিয়েছেন। তার স্থানে অস্থায়ী বড়লাট হন জন এডাম। এডামের সময়েই ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল কর্তৃপক্ষ এক কড়া প্রেস আইন জারি করে এর স্বাধীনতা হরণ করলেন। তখনকার দিনে কোন আইন বিধিবদ্ধ করতে হলে সুপ্রিম কোর্টের সম্মতি নিতে হ'ত। সম্মতিও যথারীতি পাওয়া গেল। এই সময়ে ঐ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হস্তারক বিধির বিরুদ্ধে রামমোহন কি ভাবে লড়েছিলেন একবার দেখা যাক।

আইনে এই নিয়ম হ'ল যে, কাগজ বের করার পূর্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হ'তে লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হলফ ক'রে সেই হলফনামা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর নিকট পাঠালে তবে লাইসেন্স মিলবে। কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ তার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব হ'তেই সম্পাদককে দিয়ে রাখা হ'ত। আইন বিরুদ্ধ বিষয়ের আলোচনা থাকলে কাগজ বন্ধ ক'রে দেওয়ারও ব্যবস্থা হ'ল।

পূর্ব নিয়মের ইউরোপীয় সম্পাদকদের এ দেশে বসতির লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়ারও কথা থাকল যদি সরকারী বিবেচনায় কোন রকম গর্হিত বিষয় কাগজে প্রকাশ পায়। এই নিয়মের প্রথম বলি হলেন রামমোহন বন্ধু 'ক্যালকাটা জার্নাল' সম্পাদক জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম (১৮৩০)। 'ক্যালাকাটা জার্নাল' সম্পর্কে, বলা বাহুল্য, এডামের মন্তব্যলিপিতে কঠোর সমালোচনা ছিল।

রামমোহন এরূপ আইন মেনে নিয়ে সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে রাজী হলেন না। তিনি এর প্রতিবাদে 'মিরাৎ-উল্-আখ্বার' প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিলেন। ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের অতিরিক্ত-সংখ্যায় এই মর্মে লিখলেন :

"......এ অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য সমাজে সর্বাপেক্ষা নগণ্য হ'লেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সঙ্গে এই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করলাম। বাধাগুলি এই :

"প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটারীর সহিত যে সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হ'লেও

আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দারোয়ান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়ে এরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া দুরূহ ; এবং আমার বিবেচনায় যা নিষ্প্রয়োজন সে কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ-আদালতের দুয়ার পার হওয়াও আমার পক্ষে কঠিন। কথায় আছে,—'যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, কোন অনুগ্রহের আশায় তাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।'

"দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ ব'লে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। তা ছাড়া, সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করবার মত বে-আইনী ও গর্হিত কাজ করতে হবে।

"তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করবার অসম্মানভাজন হবার পরও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হ'তে পারে এ আশঙ্কার জন্য সে ব্যক্তিকে অপদস্থ হ'তে হবে, আর এই কারণে তার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হবে। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল ; সত্য কথা বলতে গিয়ে তাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে হবে যা গবর্ণমেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর হ'তে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করলাম। —'হাফিজ ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ ক'রে থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন'।"

রামমোহন রায় এই ব'লে পারশ্য ও হিন্দুস্থানের পাঠকদের নিকট হ'তে বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু এতেই তিনি নিরস্ত হন নি। তিনি এ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু ক'রে দিলেন। তিনি সুপ্রীম কোর্ট ও বিলাতে রাজ-দরবারে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। প্রথমটিতে তাঁর সঙ্গে স্বাক্ষর করেছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রাজ-দরবারে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে, মুসলমান আমলে যথেষ্ট সম্মান ও কর্তৃত্ব লাভ করলেও সমাজে নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে স্বাধীন মানুষের মত জীবন যাপন করা তখন সম্ভবপর ছিল না। ইংরেজ রাজত্বে তা সম্ভব হচ্ছে ব'লে এ জনপ্রিয়ও হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু এরূপ বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হ'লে স্বাধীনতার

মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। রাজদরবারে লিখিত পত্রখানি সংবাদপত্র তথা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে একখানি উৎকৃষ্ট দলিল। অনেকে এখানিকে বিলাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হন্তারক আইনের প্রতিবাদে লিখিত মহামতি মিল্টনের সুবিখ্যাত এরিওপ্যাজেটিকার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

রামমোহনের জীবিতকালে তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। তবে বেন্টিঙ্ক বড়লাট হয়ে এ আইনের বন্ধন অনেকটা শিথিল করে দেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হন্তারক আইন বিধিবদ্ধ হবার চার বছরের মধ্যে ১৮২৭ সনে কর্তৃপক্ষ আর একটি আইন জারি করলেন যা ছিল আদপে ঘোরতর বিভেদ ও বৈষম্যমূলক। এটি হ'ল জুরি আইন। খ্রীষ্টান জুরিগণ, মায় দেশীয় খ্রীষ্টান এই আইন বলে হিন্দু ও মুসলমানদের বিচারের ক্ষমতা পান। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান জুরিদের খ্রীষ্টানদের বিচার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হ'ল। এ নিয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই ভয়ানক আপত্তি ওঠে। হিন্দু ও মুসলমানদের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র জে. ক্রফোর্ড মারফত পার্লামেণ্টে পাঠান হ'ল। রামমোহন এই ভেদ বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ১৮২৮ সনের ১৮ই আগস্ট ক্রফোর্ডকে লিখিত একখানি পত্রেও রামমোহন লিখলেন,—যে আইন সাম্প্রতি জারি হয়েছে তাতে খ্রীষ্টান জুরিগণ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের বিচারে নিয়োজিত হ'তে পারবেন, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান জুরিরা খ্রীষ্টানদের (এদেশীয় খ্রীষ্টানদেরও) বিচারে নিয়োজিত হ'তে পারবেন না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এরূপ ভেদ বৈষম্য হিন্দু ও মুসলানদের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। এ ধরণের ভেদ বৈষম্য যদি চলতে থাকে, তবে ইউরোপীয় জ্ঞানলাভের ফলে শতবর্ষ পরে হ'লেও এমন একদিন উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয় যখন তারা একযোগে অন্যায় ও গর্হিত আইনগুলির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়বে ও ল'ড়ে তাতে জয়যুক্ত হবে। ভারতবর্ষ আয়ার্লণ্ড নয় যে, দু'চারখানা রণতরীতে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে সহজেই শায়েস্তা করা যাবে। ভারতবর্ষ যদি আয়ার্লণ্ডের এক-চতুর্থাংশও উদ্যম ও আগ্রহ দেখায় তা হ'লে, সুদূরবর্তী হ'লেও, তার ধনসম্পদ ও বিরাট জনবল নিয়ে সে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুকূল হ'য়ে থাকতে পারে, তেমনি আবার দৃঢ়চিত্ত শত্রু হ'য়েও তার ভীষণ ক্ষতির কারণ হ'তে পারবে।

এখানে আয়র্লণ্ডের উল্লেখ পেলাম। রামমোহন শুধু স্বাদেশিক নন তিনি মানব দরদী ও মানব প্রেমিকও। এর পরিচয় পাওয়া যায় সেই ১৮২১-২২ সালে যখন আয়র্লণ্ড দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। দুর্গত আইরিশদের সাহায্যের নিমিত্ত কলকাতায় একটি ধন ভাণ্ডার খোলা হয়। এর উদ্যোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মানব দরদী রামমোহন। আর একটি কথাও এখানে বলি। রামমোহন এতই স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন যে, কোন দেশের স্বাধীনতালাভের সংবাদ পেলেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। নেপ্‌লসের স্বাধীনতা-লাভ উপলক্ষ্যে তিনি দেশী বিদেশী বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ প্রকাশকল্পে এক ভোজ সভারও আয়োজন করেছিলেন।

রামমোহন চাইতেন স্বদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। এই উদ্দেশ্যে ইউরোপীয়-দের সহযোগিতা ছিল তাঁর একান্ত কাম্য।

১৮১৩ সালের সনন্দ বলে বহু ইংরেজ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করতে এদেশে আসতে থাকে। তারা ক্রমে নূতন করে এদেশীয়দের সংস্রবে আসে এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। সরকারের অবিবেচনার ফলে তাতে ভাটা পড়বার উপক্রম হ'ল। ইউরোপীয়দের এদেশে স্থায়ী বাসিন্দা হবার অধিকার না থাকায় ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় আগ্রহশীল হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু, সরকারী ব্যবস্থায় প্রতিবছর কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেন্সন ও ব্যবসায়াদির জন্য বহু কোটি টাকা ভারতবর্ষের বাইরে চলে যেত।

ইউরোপীয়দের অর্থ, কর্মশক্তি ও ব্যবসায় নৈপুণ্যে ভারতবাসীরা যথেষ্ট উপকৃত হতে পারত যদি ইউরোপীয়েরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার পেত। এ কারণ কলকাতায় একটি আন্দোলন উপস্থিত হ'ল যাতে করে ইউরোপীয়েরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারে। এবং ভারতবর্ষে থেকেই এর উন্নতির নিমিত্ত অর্থ বুদ্ধি এবং নৈপুণ্য সম্যক নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়। এই উদ্দেশ্যে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে ১৮২৯ সনে। ঐ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রামমোহন স্বদেশের উন্নতি চিন্তায় ছিলেন বরাবর বাস্তবধর্মী। তিনি বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলে সভায় ইউরোপীয়দের এ দেশে স্থায়ী বসবাসের প্রস্তাবে আন্তরিক সমর্থন

জানান। তিনি এই উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পল্লী অঞ্চলে ইউরোয়পীদের ব্যবসায় শিল্প প্রসার হেতু স্থানীয় বাসিন্দারা বিশেষ উপকৃত; সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও সুনিশ্চিত হয়ে উঠছে। দ্বারকানাথও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এর সমর্থন জানালেন। পরবর্তী সনন্দে ইউরোপীয়েরা এ অধিকার পেলে। কিন্তু বিজ্ঞান এসে এর পথে বাদ সাধল। কেমন করে, পরে বলছি।

রামমোহন ১৮৩০ নভেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করেন। এর পূর্বে দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, বিলাতে গিয়ে তিনি বাদশার সপক্ষে ওখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবেন। বিলাতে পৌছিবার পূর্বে কিন্তু এ ব্যাপারটি এ দেশে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় নি। এই সময়ে বিলাতে রামমোহনের উপস্থিতি ভারতবর্ষের পক্ষে বড়ই শুভ হয়েছিল। স্বাধীন দেশে বসে স্বদেশ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের খুবই সুযোগ ঘটল তাঁর পক্ষে। রামমোহন ছিলেন সকল দেশেরই পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছে স্বাধীন ফ্রান্সের ত্রিবর্ণ পতাকাকে প্রথম সুযোগেই সম্মান দেখাতে রামমোহন ব্যগ্র হন। এ সময়ে তিনি পায়ে যে আঘাত পান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার জের তাঁকে ভোগ করতে হয়। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা, ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বাধীনতা-লাভ, খাস ইংলণ্ড থেকে ধর্মগত বৈষম্য বিদূরণের চেষ্টা—সকল ব্যাপার সম্বন্ধেই তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য সম্মুখে রেখে সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি যে, ইংলণ্ডে তখন সবে মাত্র রোমান ক্যাথলিকদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তারা এর কিছু আগে পর্যন্তও পার্লামেণ্টের বা মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সরকারে চাকরি করতেও তারা পারত না। এ সময় ইংলণ্ডে ক্রীতদাস-প্রথা নিরোধক আইন, ধর্মগত বৈষম্য বিদূরণ আইন যেমন বিধিবদ্ধ হয়, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তেমনি নূতন ক'রে সনন্দ লাভ করে। প্রথমোক্ত কারণ দুটিতে ইংরেজ জাতির উপর শ্রদ্ধা

রামমোহনের হয়ত বেড়ে থাকবে, কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি কর্তব্য-পালনে যথোচিত আগ্রহ প্রকাশ করতে তিনি কসুর করলেন না।

রামমোহন স্বদেশে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিলাত-যাত্রার পূর্বেই ওখানকার শিক্ষিত জনও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিয়েছিলেন। তিনি বিলাতে পৌঁছে নানা সভা-সমিতিতে যোগ দিলেন ও বিস্তর সম্মান লাভ করলেন। সনন্দ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টারী কমিটি রামমোহনকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করেন। যে কারণেই হোক, তিনি স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষ্য না দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত লিখে পাঠালেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থা ও ভারতবাসীদের যাবতীয় সমস্যার কথা তিনি এতে উল্লেখ করেন। তিনি লিখলেন, ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবার ফলে চল্লিশ বছরের মধ্যে জমিদার-শ্রেণী সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে বটে, কিন্তু প্রজাদের করদান-ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় তাদের একরূপ কোন উপকারই হয় নি। প্রজাসাধারণের উপকারের জন্য জমিদারের করভার লাঘব ক'রে তাদেরও দেয় খাজনা হ্রাস ক'রে দেবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এজন্য সরকারের রাজস্বের যে ঘাটতি হবে তা, বিলাস-দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসিয়ে ও রাজস্ব আদায়ের জন্য উচ্চ বেতনে ইউরোপীয় নিযুক্ত না ক'রে অল্প বেতনে ভারতীয় নিযুক্ত ক'রে পূরণ করা যাবে। আদালতে ও আপিসে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন, জুরি দ্বারা বিচার, দেওয়ানী আদালতে এসেসর নিয়োগ, জজ ও রেভিনিউ কমিশনারের পদ এবং জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য স্বতন্ত্র করা, ভারতে ফৌজদারী আইন-প্রণয়ন, আইন প্রণয়নকালে গণ্যমান্য ভারতীয়দের পরামর্শ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়-সমূহ সম্পর্কে তিনি অনুকূল মত প্রকাশ করলেন। পার্লামেণ্টে রামমোহনের এসব মত কিছু কিছু গৃহীতও হ'ল।

লিখিত সাক্ষ্যে রামমোহন বিভিন্ন বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেন তার যাথার্থ্য পরবর্তীকালে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এ কথা এখানে বলার তেমন প্রয়োজন দেখি না। একটি বিষয়ে কিন্তু তাঁর মতামতের কথা এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না। স্বদেশবাসীরা ইংরেজদের নিকট নানা কারণে বড়ই নিন্দাভাজন হয়েছেন। এর মূলে যে, সত্যের নিতান্তই অসদ্ভাব তাও একটি ব্যাপারে প্রমাণিত হ'ল। রামমোহনের নিকট প্রেরিত সাক্ষ্য-পত্রে

জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন ছিল। রামমোহন এর জবাবে লিখলেন বড় বড় শহরে যে সব বাঙালীর সঙ্গে ইংরেজরা পরিচিত তাদের দেখে এদেশীয়দের চরিত্র বিশ্লেষণ করায় তাঁরা মস্ত বড় ভুল করে থাকেন। ইংরেজ ব্যবসায়ী কর্মচারী প্রভৃতির সঙ্গে এবং কখন কখন অপরাপর জাতীয় লোকের সঙ্গেও যোগ সাজসে তারা অনেকে নীতি বিগর্হিত কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এতে করে তার স্বদেশবাসীদেরই শুধু নিন্দাবাদ করা হয়, অপরাপর ব্যক্তিরা এই নিন্দা থেকে সহজেই রেহাই পেয়ে থাকে। রামমোহন এর পর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ কারণ যে, কলকাতার মত বড় বড় শহর থেকে ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে যদি আমরা যাই তা হলে সত্যিকার বাঙালী চরিত্র সহজেই আমাদের চোখে পড়বে। সততা, সরলতা, দয়া, মমতা, সদালাপ ও সদ্ ব্যবহার, প্রভৃতি পল্লী অঞ্চলে বাঙালীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শহরের বাঙালীদের দেখে বাঙালী জাতীয় চরিত্রের উপর কটাক্ষপাত করা নিতান্তই ভ্রমাত্মক।

রামমোহন ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য ১৮৩৪ সালের ৫ই এপ্রিল কলকাতার টাউন হলে একটি জনসভা হয়। এই সভায় নব্যবঙ্গের মুখপাত্র-স্বরূপ ডিরোজিও-শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, নূতন চার্টার বা সনন্দ বহু বিষয়ে অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর হ'লেও এতে ভারতের পক্ষে যা-কিছু শুভকর তা রামমোহন রায়ের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। রামমোহন ইংলণ্ডবাসীদের বুঝিয়ে দিয়েছেন—ভারতীয়েরা নিজেদের বিষয় ভাববার ও নিজেদের কাজ করবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রামমোহনের চেষ্টা ও কার্য যাচাই ক'রে দেখলে তাঁকে ভারতের মুক্তিসাধনায় অগ্রদূতের সম্মান অবশ্যই দিতে হবে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও আমাদের স্বদেশ-চেতনা

পূর্ব অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায়ের স্বাদেশিকতা ভিত্তিক কার্যকলাপের কথা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। মৃত্যুর পর স্মরণ সভায় নব্যবঙ্গের মুখপাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক রামমোহন সম্বন্ধে যে সব উক্তি করেন তাও সংক্ষেপে জানতে পেলাম। নব্যবঙ্গ কথাটি খুবই অর্থবহ। এর বিষয় বলতে গেলে পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের সংগ্রামের কথাও স্বতঃই এসে পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে রামমোহন প্রমুখ নানা সুধী সজ্জন উচ্চমনা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের গুণাবলী সম্যক্ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এঁরা বুঝলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-লাভের দ্বারাই আমাদের উন্নতি সম্ভব। ইংরেজীর মাধ্যমেই আমরা এই শিক্ষা-লাভ করতে পারি। যে জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত হওয়ায় ইংরেজ জাতি এত বলীয়ান হয়ে ওঠে তার বিষয়ও আমরা এদের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারলাম। তাই দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এমন কি ইংরেজী না জানা পণ্ডিত প্রধানেরাও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়েন। সব দেশে সকল সময়ে যুবজনই জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসা। এই যুবশক্তিকে শিক্ষিত সংহত ও কর্মে তৎপর করার মধ্যেই রয়েছে জাতির সত্যিকার উন্নতি। এই বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের পূর্বসূরীরা গত শতাব্দীর প্রথমেই ইংরেজীর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হন। এই বিষয়টি এখন বলব।

রামমোহন রায় পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি প্রথমে ধর্মীয় ভিত্তিতে জাতির প্রধানগণকে একটি ব্যাপারে সম্মিলিত করার প্রয়াসী হন। তিনি এই উদ্দেশ্যে একটি বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখমাত্র করেছি। তবে তখনকার দিনে কেউ কেউ ইংরেজী শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। এই প্রসঙ্গে ডেভিড হেয়ারের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন রামমোহন বন্ধু। উক্ত প্রস্তাব শুনে হেয়ার ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম পাড়লেন। তাঁর বিবেচনায় তখনকার সামাজিক অবস্থার পক্ষে এইটিই ছিল আমাদের প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়। ইংরেজী শেখাবার

জন্যে প্রাথমিক স্তরের বিত্যালয় তখনই যে না ছিল এমন নয়। ইউরোপীয়দের সঙ্গে কাজ কারবার চালাতে হলে খানিকটা বিদেশী তথা ইংরেজীর জ্ঞান চলনসই রকমের থাকা দরকার হয়েছিল। ছড়া করে বাঙলা মানে সমেত ইংরেজী শব্দ মুখস্ত করার কথা আজকের দিনে কার না মনে কৌতুকের উদ্রেক করে! কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান সুষ্ঠুরূপে আয়ত্ত করতে হলে উন্নত ধরনের এমন বিত্যায়তন আবশ্যক যেখানে যুবজনেরা মিলিত হয়ে অল্প সময়ে এর সঙ্গে পরিচয়লাভে সক্ষম হতে পারেন। পূর্বেই বলেছি শুধু গণ্যমান্য বাঙালী প্রধানেরাই নন, সংস্কৃতজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতেরাও এই প্রয়োজনের কথা বুঝতে পারেন। আমরা দেখেছি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসেছেন। এদেশের বিবিধ বিত্যার চর্চায়ও ইউরোপীয়রা পণ্ডিতদের সহায়তা যাচ্ঞা করতেন। বিচারালয়ে জজ পণ্ডিতরূপেও তাঁরা ইংরেজদের গুণাগুণ উপলব্ধি করতে কতকটা যে সমর্থ হয়েছিলেন এ কথা সন্দেহাতীত। এ কারণ একটি সুষ্ঠু ইংরেজী বিত্যালয় স্থাপনের প্রথম উত্যোগেই তাঁরাও এসে হিন্দু প্রধানদের সঙ্গে হাত মেলালেন এবং ইউরোপীয় ও ভারতীয় যৌথ উত্যোগে বিত্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের ভবনে যে প্রথম সভা হয় তাতে পণ্ডিত প্রধানদের পক্ষে একজন তাঁকে স্বদেশীয় বিত্যার প্রতীক স্বরূপ একটি পুষ্প উপহার দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান লাভে তাঁরা উৎসুক। কিন্তু স্বীয় শাস্ত্র সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ এই পুষ্পটি উপহার দিয়ে তাদের স্বকীয় বিত্যার অস্তিত্বের কথাও তাঁকে জানালেন। ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে সামান্য কিন্তু বস্তুতঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সাহিত্য প্রভৃতির সম্যক শিক্ষার মাধ্যমেই উন্নতি আমাদের করায়ত্ত হ'তে পারে। নানারূপ উত্যোগ আয়োজনের পর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী কলকাতার একটি বিত্যালয় স্থাপিত হ'ল। নাম দেওয়া হয়, সাধারণের নিকট সুপরিচিত, হিন্দু কলেজ। ঐ সময়ে কিন্তু এটি বিত্যালয় বা মহাবিত্যালয় নামে বেশী পরিচিত ছিল।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি সুষ্ঠু ধরনের ইংরেজী

বিদ্যালয়ের কথা রামমোহনের গৃহে বসেই হেয়ার উল্লেখ করেন। কাজেই জল্পনা থেকেই এই ব্যাপারটি রামমোহনের জানা ছিল। এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, তিনি এর প্রতিষ্ঠায় খানিকটা তৎপরও হয়েছিলেন। কিন্তু ঈস্ট ভবনে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায়ই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সঙ্গে রামমোহনের সংযোগ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি ওঠে। কেননা তখন তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার, নিজ আচার আচরণ প্রভৃতির দ্বারা হিন্দু প্রধানদের নিকট বড়ই অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। যাতে বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এই ছিল বহু সুধী সজ্জনের মত রামমোহনেরও কাম্য ; তাই তিনি এ বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখলেন। বিদ্যালয়ের আদিকল্পক ডেভিড হেয়ারও কিন্তু অন্তরালেই রয়ে গেলেন। রামমোহন অবশ্য নিজেই একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্বীয় বাসভবনে প্রতিষ্ঠা করলেন। ঐ সময়ে, যেমন পূর্বে বলেছি, ইংরেজ শাসকেরাও এ দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে কতকটা রাষ্ট্রীয় কারণে বিমুখ ছিলেন। এ হেতু কর্তৃপক্ষের গোপন নির্দেশে ইংরেজ কর্মচারিরা এর সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু ঈস্ট প্রমুখ সজ্জনেরা এই আশ্বাসও দিলেন যে তাঁরা যুক্ত না থেকেও এ কাজে পরামর্শ দিতে নিরস্ত হবেন না। আজ এ কথা সুবিদিত যে, হিন্দু প্রধানদের চেষ্টা যত্নে এবং অর্থানুকূল্যেই ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অত সত্বর সম্ভব হয়েছিল। সরকারী সাহায্য যে তখন মেলে নি এ কথা বলাই বাহুল্য।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাঙলা তথা ভারতের নবযুগের সূচনা হ'ল। গত শতকের রেনেসাঁর কথা বলতে গিয়ে আমরা হয়ত সঙ্গত কারণেই ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ই বেশী উল্লেখ করি। কিন্তু এর মধ্যে যে আরো বিস্তর লোক প্রচুর রসদ জুগিয়েছেন তাও ভুললে চলবে না। আমাদের সর্ব-প্রকার বন্ধন মুক্তির পক্ষে এ সকলেরও কার্যকারিতা উপেক্ষনীয় নয়। যে সব হিন্দুপ্রধান হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রকারে তৎপর হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্ততঃ প্রথম দিককার কয়েকজনের নাম এখানে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ, গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ নেতৃবর্গ এঁদের মধ্যে ছিলেন। আরো অনেকে প্রথমাবধি কোন না কোন প্রকারে এর সঙ্গে যুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে অন্ততঃ দুইজনের

নাম আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করব। প্রথম হলেন রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) এবং দ্বিতীয় রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪)।

রামমোহনের মত বিভিন্ন কর্মব্যাপদেশে ইংরেজের সংস্পর্শ আসার সুযোগ না ঘটলেও রাধাকান্ত দেব পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের মহিমা যৌবনারম্ভেই উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার আদর্শে একখানি সংস্কৃত কোষগ্রন্থ প্রণয়নে তিনি মনস্থ করেন। একক্রমে সাত বছর চেষ্টার পর ১৮০৯ সন নাগাদ প্রথম খণ্ড প্রস্তুত করেন। কিন্তু তখনই এর প্রকাশে তিনি আগ্রহী হন নি। কারণ আরো অনেক নূতন বিষয় সংযোজনের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাঁর এই কার্যে তখনকার দিনের বড় বড় পণ্ডিতদের নিকট থেকেও তিনি ঢের সাহায্য লাভ করেছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'শব্দকল্পদ্রুম' নাম দিয়ে বিখ্যাত সংস্কৃত কোষগ্রন্থের প্রথম খণ্ড বের হ'ল। চল্লিশ বছরের অবিরাম চেষ্টায় ফলে ১৮৫৮ সনে পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। 'শব্দকল্পদ্রুম' জগতের বিদ্বজ্জন সমাজে সবিশেষ সমাদৃত হ'ল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিদগ্ধ মানুষেরা সংস্কৃতের অনুশীলনে এ থেকে বিশেষ সাহায্য পেলেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছিলেন সংস্কৃতের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ফলে ইউরোপেও একদা রেনেসাঁ বা নবযুগ ঘটবে। সত্যসত্যই এককথায় জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ও-সব দেশেও রেনেসাঁ বা নবজাগরণ দেখা দেয়। রাধাকান্তের 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশে এর পক্ষে সুযোগ ঘটল অনেকটা।

এই সংস্কৃতবিদ্ ভারতগত প্রাণ রাধাকান্ত দেব পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মহিমাও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি সুধী সমাজে 'সাহিত্যিক' বলে প্রখ্যাত হন। পিতা গোপীমোহন দেব কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ থেকেই এর অন্যতম পরিচালক ছিলেন। পুত্র রাধাকান্ত ১৮১৮ সন থেকে এর সঙ্গে এসে যুক্ত হন এবং দীর্ঘ ৩৫ বৎসর পর্যন্ত অন্যতম পরিচালক ও উৎসাহদাতারূপে নানাভাবে এই বিদ্যালয়ের হিতসাধন করে-ছিলেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম ৭ বৎসরে সরকার থেকে এক কপর্দকও পাওয়া যায় নি। প্রথম প্রথম সরকারী বিরূপতাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এই সময়ে রাধাকান্তের ঐকান্তিক যত্ন কলেজটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনে সহায়তা

কয়েন দেন। এর পরেও কলেজের নবরূপায়ণে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকেও তিনি বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টকে লেখা একখানি পত্রে কলেজীয় ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষায় উন্নতি দেখে কতই না আনন্দ জ্ঞাপন করেছিলেন তিনি। রক্ষনশীল এবং রামমোহনের সংস্কার প্রয়াস সমূহের বিরোধী বলে পরবর্তীকালের কোন কোন লেখক তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কার্পণ্য দেখান। কিন্তু আদতে সত্যিকার রেনেসাঁর পক্ষে যেমন নূতনকে বরণ করা আবশ্যক তেমনি পুরাতনের মধ্যে আমাদের যা কিছু মহান তাও সংরক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া দরকার। রাধাকান্ত দেব স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে রামকমল সেনের কথাও বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। তিনিও ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। কোন কোন বিদগ্ধ ইউরোপীয়ের সঙ্গে তিনি যৌবনাবধি পরিচিত হয়েছিলেন এবং বিবিধ হিতকর প্রতিষ্ঠানে তাদের সহযোগীরূপে কার্য করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, এগ্রি হোর্টিকালচারাল সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা আমরা স্মরণ করি। কেরী, উইলসন, বিশেষ করে, উইলসনের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় খুব বেশী। হিন্দু কলেজের নবরূপায়ণে রামকমল ছিলেন উইলসনের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাকালেও রামকমলের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের সুযোগ নেওয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে পূর্বে যে কমিটি গড়া হয় তাতে একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন রামকমল সেন। বিরাট ইংরেজী বাংলা অভিধান (প্রকাশকাল ১৮৩৪) রামকমলের এক অবিনশ্বর কীর্তি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বরাবর অবহিত থেকে হিন্দু কলেজের উন্নতি বিষয়ে তৎপর ছিলেন। অথচ স্বদেশীয় বিদ্যা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এই কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তথাকথিত রক্ষনশীল এবং সমসাময়িক সংস্কারপন্থীদের বিপক্ষতা করলেও রাধাকান্তের মত তাঁকেও আমাদের স্বদেশ চেতনায় একটি উচ্চস্থান দিতে হয়। রামকমল ছিলেন বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ।

এ কথা সত্য যে হিন্দু কলেজ প্রথমে একটি স্কুল মাত্র ছিল। আজিকার দিনে কলেজি শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি এখানে তার প্রবর্তন হয় বহু বৎসর পরে। কিন্তু এই প্রাথমিক স্তরেই এখানে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হ'ত তাতে কেউ কেউ ইংরেজী ভাষা সাহিত্য আয়ত্ত করে বেশ ইংরেজীনবীশ হয়ে ওঠেন। এই প্রসঙ্গে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র ঠাকুর এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তী কাশীপ্রসাদ ঘোষের নাম স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮) ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত ব্যক্তি, হিন্দু কলেজের অন্যতর গবর্ণর গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রতিষ্ঠাবধি হিন্দু কলেজে তিনি ইংরেজীর পাঠ নেন এবং ইংরেজী ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি যুবজনোচিত আগ্রহে রামমোহনের বিবিধ হিতকর প্রচেষ্টায় যোগ দেন। দেখি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হস্তারক বিধির বিরুদ্ধে রামমোহন যে দুইখানি আবেদনপত্র এ দেশে ও বিলেতে পেশ করেন তার অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন প্রসন্নকুমার। জনশ্রুতি, এর মুশাবিদায় প্রসন্নকুমারের যথেষ্ট হাত ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'কলোনাইজেশন' আন্দোলনের মধ্যেও প্রসন্নকুমারের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এর অনুকূলে আবেদনপত্র রচনার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তারও তিনি একজন সভ্য মনোনীত হন। 'বেঙ্গল হেরাল্ড' নামক ইংরেজী ও এর আদর্শে বাংলা, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষায় যে পত্রিকা সমূহ প্রকাশের আয়োজন হয় তাতেও রামমোহন দ্বারকানাথের সঙ্গে তিনি মিলিত হন। তিনি নিজেই ১৮৩১ সনে 'রিফর্মার' নামক একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছিলেন। এতে সমাজ-উন্নতি মূলক বিবিধ বিষয়ের আলোচনা থাকত। রামমোহনের ব্রহ্ম সভা বা ব্রাহ্মসমাজেরও তিনি একজন ট্রাষ্টি ছিলেন প্রথম থেকে (১৮৩০)। উত্তরাধিকার সূত্রে নিয়মানুযায়ী প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ সভায় স্থান পান এই সময়। প্রসন্নকুমারের পরবর্তী কার্যকলাপের কথা পরেও আমরা নানা সূত্রে জানতে পারব।—ইংরেজী ভাষা সাহিত্যে সুষ্ঠু জ্ঞান তাঁর যে হিন্দু কলেজের শিক্ষা থেকেই লব্ধ তা সহজেই বুঝা যায়।

বিশের দশকেই প্রসন্নকুমার এমন একটি উদ্যোগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হন যা ছিল আমাদের স্বদেশ চেতনার পথিকৃৎ। আর ঐ উদ্যোগে

তথাকথিত রামমোহন বিরোধী ব্যক্তিপ্রধানদের সঙ্গে রামমোহনের অনুরাগী ও সপক্ষ ব্যক্তিদেরও সংযোগ সাধিত হয়। দ্বিতীয় দলের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন প্রধান। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। হিন্দুদের সম্বন্ধে অপপ্রচারে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা, পাদ্রী-অপাদ্রী নির্বিশেষে অত্যন্ত মুখর হয়ে উঠেছিলেন। পুস্তক পুস্তিকাও বিস্তর প্রকাশ করেন। স্বজাতীয়দের আত্মরক্ষা ও আত্ম-সংগঠনকল্পে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাঙলা সাহিত্যের মাধ্যমে দেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান মূলক গ্রন্থাদি রচনা। এ জন্য অনুবাদের কার্যকারিতাও তারা সম্যক উপলব্ধি করেন। বিদেশীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির সঙ্গে নিজেদের প্রাচীন শাস্ত্রাদি থেকে কালোপযোগী বিষয়াদি অনুবাদের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। এইরূপে সার্থকভাবে অপপ্রচারকদের নিরস্ত করার নিমিত্ত মাতৃভাষা বাঙলাকে তাঁরা বাহন করে নিলেন। শুধু ইংরেজী নয় বাঙলা সাহিত্যের অনুশীলনের দিকেও প্রসন্নকুমারের অনুরাগ এই সময় থেকেই লক্ষণীয়। স্বদেশের এবং স্বদেশী সমাজের এমন একটি হিতকারক উদ্যোগের সম্পাদক হলেন প্রৌঢ় রক্ষণশীল রামকমল সেন এবং রামমোহনপন্থী যুবক প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এখানে পুনরায় বলা দরকার যে, পরবর্তীকালে রামমোহনকে আলাদা করে রেখে তার বিরোধীদের যে গুণাপকর্ষ করার চেষ্টা হয় তা এই সব তথ্যের নিরিখে ভ্রান্তিমূলক বলেই প্রতিপন্ন হতে বাধ্য।

হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-১৮৫৭)। প্রসন্নকুমার ধনীর দুলাল আর তারাচাঁদ এসেছিলেন স্বল্পবিত্ত দরিদ্র পরিবার থেকে। ষোল বছর বয়সে পিতৃ বিয়োগ হেতু ১৮২২ সনে তিনি কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। এই এত অল্প বয়সেই তিনি ইংরেজী ভাষা সুন্দর রূপে আয়ত্ত করেছিলেন। সৌভাগ্যের কথা, তারাচাঁদ এ সময় রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হন। তারাচাঁদ তখন খুবই বিপন্ন। অল্পকালের মধ্যেই রামমোহন তাঁর গুণপনা বুঝতে পারলেন এবং তাঁকে বন্ধুবর জেমস্ সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্নালের' জন্য অনুবাদের কাজ জোগাড় করে দেন। 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় অংশ

এই জার্নালের জন্য তিনি অনুবাদ করতেন। ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনের জন্য পুরাণ, কাব্য প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদ কার্যে তারাচাঁদ লিপ্ত হয়েছিলেন। এ কার্যে তাঁর সহযোগী ছিলেন তাঁরই সতীর্থ শিবচন্দ্র ঠাকুর। রামকমল সেনের নেতৃত্বে উইলসনের পক্ষে এই অনুবাদ শুরু হয়। উইলসন সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা-প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন এরই ভিত্তিতে। তারাচাঁদ কিছুকাল কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গাস্থ ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে ব্রতী ছিলেন। এই সময়ে ১৮২৭ খ্রীঃ তিনি একখানি বাংলা-ইংরেজী অভিধান সংকলন করেন। এখানি উৎসর্গ করলেন রামমোহন বন্ধু মানব দরদী উইলিয়ম এডামকে। রামমোহনের সঙ্গে তারাচাঁদের ঘনিষ্ঠ সংযোগের একটি প্রধান নির্দশন তৎকর্তৃক তারাচাঁদকে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম সভা বা ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারি পদে নিয়োগ। ইংরেজী সাহিত্যে অনন্যতুল্য ব্যুৎপত্তিহেতু তারাচাঁদ একাধিক ইংরেজের অধীনে কর্মলাভে সমর্থ হন। তাঁর বিস্তর ইংরেজী রচনাও ঐ সময়কার প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখি। শুধু ইংরেজী-ই নয়, সংস্কৃতেও তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। ১৮৩২ খ্রীঃ থেকে পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণের (ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা) সহযোগে মনু সংহিতার একটি অভিনব সংস্করণ বা'র করতে শুরু করলেন। জোন্স কৃত ইংরেজী সহ বাঙলা ও সংস্কৃত একই সঙ্গে মুদ্রাঙ্কিত হয়। তারাচাঁদই এই টীকা টিপ্পনী এবং কখন কখন মূলের সঙ্গে মিলিয়ে জোন্সের অনুবাদ সংশোধনও করেছেন। এ সমুদয় সুধী সমাজের নিকট বিশেষ প্রশংসিত হয়। মনুসংহিতার এই সংস্করণ ক্রমান্বয়ে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অমায়িকতা, কর্তব্যবোধ, সত্যপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি গুণের এমন সংমিশ্রণ ক্বচিৎ দেখা যায়। আর এই সব গুণেই তিনি হয়ে উঠলেন নব্যবঙ্গের প্রধান নেতা। এ বিষয়ে আমরা পরে আরও জানতে পারব।

এখানে কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯—১৮৭৩) সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। তিনিও ডিরোজিও-পূর্ব যুগের ছাত্র, কিন্তু উপরোক্তদের মত তিনি ইংরেজী সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজী রচনা সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা সাগ্রহে প্রকাশ করতেন। তিনি 'শায়ির অ্যাণ্ড

আদার পোয়েমস' (১৮৩০) ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ লিখে যৌবনেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের চর্চায়ও তিনি রত হন। বিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সারের' তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণে ইংরেজী শিক্ষার সার্থকতা কলেজের প্রথম দিকেই সবিশেষ অনুভূত হতে থাকে। ১৮২৫-২৬ খ্রীঃ কলেজের নবরূপায়ণের সময় থেকে ইংরেজী শিক্ষা এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হ'ল।

কিন্তু এ বিষয়ে বলার পূর্বে আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রামমোহন রায় পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার্জনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যখন দেখলেন সরকারী কর্তৃপক্ষ কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন তখন তিনি এই বলে ঘোর আপত্তি তুললেন যে, দেশের মধ্যে যে সব টোল চতুষ্পাঠী আছে তার দ্বারাই প্রচলিত রীতিতে সংস্কৃত শাস্ত্র সাহিত্যাদি শেখা সম্ভব, সরকারী অর্থে নূতন করে আর একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার কোন মানে নেই। এখন দরকার পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ। এর মধ্যে তিনি বেছে নিলেন রসায়ন, শরীরতত্ত্ব, শারীর সংস্থান বিদ্যা (anatomy), জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি। আর এর জন্য তিনি সংস্কৃত কলেজের বদলে একটি নূতন বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলেন এবং বললেন ঐ পরিমাণ অর্থের একাংশ দিয়ে ইউরোপ থেকে অধ্যাপকদের আনিয়ে এই সমুদয় বিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে। তিনি কিন্তু ঐ সময়কার হিন্দু কলেজের ভিতর দিয়ে এ সবের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। বড়লাট আমহার্স্টকে লেখা ১৮২৩, ১১ই নভেম্বর তারিখের পত্রে রামমোহন এসব বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। তিনি অবশ্য পরিষ্কার করে ইংরেজীর মাধ্যমের কথা বলেন নি। তবে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, তিনি একেই বাহন করতে চেয়েছিলেন, সংস্কৃতের বদলে। তখনকার শিক্ষা কর্তৃপক্ষ রামমোহনের এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি। কিন্তু এক যুগ যেতে না যেতেই এই উদ্দেশ্যে কাজ শুরু হ'ল। ১৮৩৫ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজ সে যুগের বিবিধ বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপে গণ্য হয়ে ওঠে। অধ্যাপক ওসাগনেসি বিদ্যুতের সাহায্যে সংবাদ চলাচলের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এখানে বসেই গবেষণা করেন। গবেষণার ফল দেখে বড়লাট অকল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ করে বহু সরকারী

বে-সরকারী গণ্যমান্ত লোকেরা চমৎকৃত না হয়ে পারে নি। এই ওসাগনেসির উপরে পঞ্চাশের দশকে টেলিগ্রাফ বিভাগ সংগঠনের ভার দেওয়া হয়েছিল।

আমরা এখানে কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের কথায় এসে পড়েছি। এখন আবার কলেজের বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক। হিন্দু কলেজের নবরূপায়ণের কথা বলতে গেলেই প্রথমেই একজন মহামনা সত্যসন্ধ সাহিত্যসেবী শিক্ষাব্রতীর কথা স্বতঃই আমাদের মনে আসে। ইনি হলেন হেনরি ল্যুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)। বাল্যে ও কৈশোরে দীর্ঘ আট বছর ডিরোজিও শিক্ষালাভ করেন ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা একাডেমিতে। এই বিদ্যালয়টি ঐ যুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদানের জন্ত স্থানীয় ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজে বেশ প্রসিদ্ধি-লাভ করে। এর প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড ড্রামণ্ড ছিলেন দার্শনিক ডেভিড হিউমের আদর্শে অনুপ্রাণিত। মানুষের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেন, কখনও বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কখনও বা সংবাদপত্রের দ্বারা। হিউমের যুক্তিবাদ তাঁর সকল কার্য নিয়মিত করত। সবার উপরে মানুষ সত্য—এই ছিল তাঁর জীবনের মূলতত্ত্ব। এইরূপ শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসে ডিরোজিও মানব প্রেমে অনুপ্রাণিত হন। ধর্মতলা একাডেমিতে প্রদত্ত শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে ভারতীয় ফিরিঙ্গি, এবং স্বল্পবিত্ত ইউরোপীয় সন্তানেরা একসঙ্গে বসে পাঠ নিতেন এবং এতে করে পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা ঐক্য ও সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল, তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসতেও শেখেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এই তিনটিই ছিল এখানকার বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয়। ডিরোজিও কৈশোরাবধি এই তিনটি বিষয়ের মূল সূত্রাদি অনেকটা বুঝে নিতে সক্ষম হন। বিদ্যাবত্তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রতি দরদ ও প্রীতি ডিরোজিও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কথা বলতে গেলে ড্রামণ্ডের একাডেমির কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়। তবে এই বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেদের শিক্ষাক্ষেত্র হলেও এর কার্য ছিল খুবই সীমিত। এ দিক দিয়ে হিন্দু কলেজের কর্মপ্রণালী ছিল ব্যাপকতর যদিও শুধু হিন্দু সন্তানদেরই এখানে শিক্ষালাভের সুবিধা ছিল।

ডিরোজিও মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে, ১৮২২ খ্রীঃ একাডেমির শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি ভাগলপুরের অন্তর্গত তারাপুরস্থ মাতুলের নীলকুঠিতে তিন

বছরের উপর কাটান, প্রধানতঃ কর্মীরূপে। বিদ্যার অনুশীলন কিন্তু কখনও ক্ষান্ত হয় নি। এখানকার পল্লী পরিবেশে ডিরোজিওর কবি প্রতিভা স্ফূরিত হ'ল। ১৮২৬ সনে হিন্দু কলেজের শিক্ষকপদে ব্রতী হয়ে আসার পূর্বেই তিনি কবিখ্যাতি লাভ করলেন। কলকাতায় এসে সে যুগের বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া গেজেট' সাপ্তাহিকের সঙ্গেও তাঁর যোগ সাধিত হ'ল। ডিরোজিও শুধু কেন, প্রায় সকল ফিরিঙ্গিই সে যুগে ভারতবর্ষকে স্বদেশ বা মাতৃভূমি বলে গণ্য করতেন। হিন্দু মুসলমানের মত তারাও ছিলেন ভারতবর্ষের মূল অধিবাসী। ডিরোজিওর কাব্য ও অন্যান্য রচনার মধ্যেও এই ভাব পরিস্ফুট হয়ে আছে। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ফকির তব ঝাংঘিরা' (১৮২৮) একটি দুঃখিনী হিন্দু বিধবার কাহিনী নিয়ে লেখা। যে দস্যু সর্দার সহমরণ থেকে এই নারীকে রক্ষা করেছিলেন তাকেও মৃত্যু বরণ করতে হয় এই মহান কাজের নিমিত্ত। কাব্য-গ্রন্থখানির এই হ'ল মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু এর মধ্যে ডিরোজিওর কবি প্রতিভাই শুধু স্ফূর্তি পায় নি, হিন্দু শাস্ত্রে, বিশেষতঃ বেদে তাঁর জ্ঞান এবং মানবপ্রীতি বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। প্রথমেই যে কবিতাটির দ্বারা গ্রন্থখানি আরম্ভ তা ছিল সত্যসত্যই দেশপ্রীতিমূলক। স্বদেশের পূর্ব অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করে ক্ষোভ ও দুঃখে তিনি যে কতখানি মর্মাহত ছিলেন এটি থেকে তা স্পষ্টই বুঝা যায়। তবে কবি মাত্রই আশাবাদী। তিনিও মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সুদিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যতদূর জানতে পেরেছি এটিই দেশাত্মবোধমূলক প্রথম কবিতা। এই কবিতাটি মূলে ও অনুবাদে এখানে দিলাম।

My country ! in the days of glory past.
A beautious halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where that reverence now ?
One eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery !
Well—let me dive into the depths of time,

And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime ;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country ! one kind wish for thee !

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এর এরূপ অনুবাদ করেছেন,—

স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্ত গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায় ! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !
কোথায় সে বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায় ।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি ;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী !

ডিরোজিওর এই শ্রেণীর আর একটি দেশাত্মবোধক কবিতা My Harp on India ইত্যাদি । এই রকম দেশপ্রেমিক ডিরোজিওর উপর ভার পড়ল হিন্দু কলেজের কিশোর ছেলেদের ইংরেজী ও ইতিহাস শিক্ষার । তিনি ছিলেন চতুর্থ শ্রেণীর শ্রেণী (class) শিক্ষক । কিন্তু যে ক' বছর তিনি কলেজের শিক্ষক তা করেন তার মধ্যে বহু শত ছাত্র এই শ্রেণীতে তাঁর নিকট পাঠ নেন । তাঁর শিক্ষাদানের এত সুনাম হয় যে, উপরের ক্লাসের ছেলেরাও, যেমন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তাঁর পড়ানো শুনতে আসতেন । আবার তাঁর নিকট থেকে যারা উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হতেন তারাও তাঁর সঙ্গে মেশার জন্য উৎকণ্ঠিত হতেন । এইরূপে এক ছাত্রগোষ্ঠী তাঁর চারদিকে এসে মিলিত হ'ল । শুধু অধ্যাপনা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত

অমায়িক ব্যবহার, মধুর আলাপ আলাপন, উন্নত চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠা সমুদয়ই এই কোমলমতি কিশোর ছাত্রদের প্রাণে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করতে থাকে। ডিরোজিওর পাঠন-রীতি সম্বন্ধে তাঁর কোন কোন সেরা ছাত্র, যেমন, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি পরবর্তীকালে তাঁদের রচনায় সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা তাঁর নিকট থেকে বিশেষ উপদেশ পেতেন। রাধানাথ লিখেছেন— কৈশোরে তাঁর মনে যে জ্ঞানস্পৃহা জন্মে শেষ জীবনেও তা অব্যাহত রয়েছে। ডিরোজিওর সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং পাপের প্রতি ঘৃণা তাঁর ছাত্রদের জীবনে এমনভাবে প্রতিফলিত হয় যে সমাজে তা যুগান্তর এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

ডিরোজিও ছিলেন যুক্তিবাদী মানবপ্রেমিক। যুক্তির ভিত্তিতে তিনি যেমন সব বিষয়ে যাচাই করে নিতেন তাঁর ছাত্র শিষ্যেরাও সেইরূপ সকল বিষয় বিচার আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছুতে চেষ্টা করতেন। বলতে গেলে ডিরোজিওর নিকট থেকেই তাদের এই শিক্ষা। পূর্বেও কলেজের ছেলেরা ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য অধিগত করেছিলেন। তার কিছু কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। ডিরোজিওর ছাত্ররাও ভাষা-সাহিত্যে ক্রমে বেশ পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। কিন্তু পূর্বেকার ছাত্রদল এবং এই ছাত্রদলের শিক্ষা-লাভের মধ্যে একটি বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। শেষোক্ত ছাত্রদল ইংরেজীর মাধ্যমে ইংরেজের সাহিত্যকীর্তি এবং অন্যান্য গুণপনার সঙ্গে পরিচিত হয়েও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে সব কিছু যাচাই করে নিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং সমাজের মধ্যে তার শুভ দিকটি অনুপ্রবিষ্ট করাতে তৎপর হয়েছিলেন। এইখানেই উভয় দলের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য সবিশেষ লক্ষণীয়। ডিরোজিওর ছাত্রদল সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আগত। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কল্যাণে স্বল্পবিত্ত বা প্রায় নিঃসম্বল পরিবারের মেধাবী ছেলেরা কলেজে পড়াশুনার সুযোগ পান। কাজেই বড় হয়ে তাঁরা ডিরোজিওর নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিজেদের স্তরে অনুক্রামিত করার সুযোগলাভ করেন। এখানেও পূর্বেকার ছাত্রদের সঙ্গে ডিরোজিওর ছাত্রদের মৌলিক প্রভেদ লক্ষ্য করি।

কলেজের এই যুগের ছাত্রদল ডিরোজিওর মত শিক্ষকের নিকটে কলেজের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বিদ্যালাভ করে তৃপ্ত হতে পারেন নি। তাঁরা অন্য সময়েও তাঁর নিকট গিয়ে ভিড় জমাতেন তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার নিমিত্ত। এর ফলে উৎপত্তি হয় একাডেমিক এসোসিয়েশনের। এই সভায় ডিরোজিওর সভাপতিত্বে কিশোর ছাত্রদল মিলিত হয়ে শুধু সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন নয়, সমসাময়িক ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনায় লিপ্ত হতেন। এই সকল আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল খুবই ব্যাপক। ঐ সময়ে রামমোহনের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব তরুণ দলের উপরে যে খানিকটাও পড়েছিল তা এ সকল আলোচনা থেকে বেশ বুঝা যায়। আস্তিক্য নাস্তিক্য, হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতা, পুরোহিত প্রথা প্রভৃতির সঙ্গে স্বদেশপ্রেম এবং অন্যান্য উন্নতিমূলক বিবিধ বিষয়ই এখানকার আলোচনার অঙ্গীভূত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার, সকল আলোচনাই ছিল যুক্তিভিত্তিক এবং মানবিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

একাডেমিক এসোশিয়েশনের আদর্শে কলকাতায় আরো কয়েকটি বিতর্ক সভা ঐ সময় স্থাপিত হয়। এগুলি ছিল প্রধানত সাহিত্যমূলক। কলকাতায় তখন বাঙালীদের মধ্যে আরো কয়েকটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত ভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এই প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গাস্থ ইংরেজী বিদ্যালয়, জগমোহন বসুর ভবানীপুরস্থ ইউনিয়ন একাডেমি, গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি (১৮২৯) প্রভৃতির নাম অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। কলেজ ব্যতীত অপরাপর বিদ্যালয়ের ছেলেরাও ঐ সকল সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। ডিরোজিও ছিলেন তখন ছাত্র সমাজের মধ্যমণি। এসোসিয়েশন ব্যতীত এই সকল সভাসমিতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ সাধিত হয় এদের সভ্যরূপে। তাঁর দ্বারা এই সকল ছাত্রও যে অনুপ্রাণিত হবার সুযোগ পান তাও আমরা লক্ষ্য করি। ডিরোজিও একবার পটলডাঙ্গাস্থ ইংরেজী স্কুলে দর্শন বিষয়ে এক প্রস্ত বক্তৃতা দেন। সভায় প্রতিদিনই দেড়শতাধিক ছাত্র উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। এ থেকেও ছাত্র সমাজের উপর তাঁর প্রভাব সূচিত হয়। ছেলেরা অল্প বয়সেই ইংরেজী ভাষায় এতটা ব্যুৎপন্ন

হয়েছিলেন যে তাদের লেখা সমসাময়িক বড় বড় পত্রিকায়ও স্থান পেতে থাকে।

এই তরুণ দল অর্জিত বিদ্যা ক্রমে সমাজের দরিদ্র নিঃসম্বল ছেলেদের মধ্যেও বিতরণ করতে আগ্রহী হলেন। দেখি তাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের বা বন্ধু-বান্ধবদের গৃহে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলেছেন এবং তাতে ছাত্রাবস্থায়ই প্রতিবেশী ছেলেদের নিয়ে শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হয়েছেন। কলেজ-ছাত্রদের পরিচালিত এইরূপ অন্ততঃ ছ'টি বিদ্যালয়ের উল্লেখ আমরা সমসাময়িক পত্রিকায় পাই। তরুণ দল তখন থেকেই এইভাবে সমাজ সেবা শুরু করে দিলেন। কেহ কেহ কলেজ ত্যাগের অব্যবহিত পরেই লোক-শিক্ষাকল্পে সংবাদপত্র সেবাতেও মন দিলেন। একথা আমরা একটু পরেই জানতে পারব।

ডিরোজিওর নেতৃত্বে তাঁরাও একখানি কাগজ বার করলেন 'পার্থেনন' নামে। ১৮৩০ সনের প্রথমেই এই সাপ্তাহিকখানি বার হয়। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরই কলেজ কর্তৃপক্ষ এখানি বন্ধ করে দেন। তথাপি এই প্রথম সংখ্যায়ই প্রকাশিত বিষয়াদি হতে ছাত্রদলের প্রগতিশীল মনোভাব সম্বন্ধে অনেকটা বুঝা যায়। তখনকার দিনের রামমোহন-দ্বারকানাথ সমর্থিত এদেশে ইউরোপীয়দের 'কলোনাইজেশন' ব্যাপারের অনুকূলে এই পত্রিকায় লেখা বার হ'ল। সতীদাহ নিরোধক আইন সবে মাত্র পাস হয়েছে। তবে শুধু আইন পাস করলেই তো নারীজাতির সম্যক উন্নতি সম্ভব নয়। তাদের চিত্তোৎকর্ষের জন্য শিক্ষার একান্ত দরকার। ছাত্রদল কাগজে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলেন। সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি সম্বন্ধেও কিছু কিছু সুচিন্তিত মন্তব্যও প্রকাশ পেল। তৎকালীন প্রবীণ রক্ষণশীলেরা এতে করে যে আতঙ্কিত হবেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সব আলোচনার মধ্যে নবীন ছাত্রদলের সমাজের ও দেশের উন্নতি সম্পর্কে গঠনমূলক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন মানদণ্ডে এই নবীন দলের কার্যকলাপ "উচ্ছৃঙ্খল" বলে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু কার্যে কতকটা এরূপ হলেও দেশোন্নতি এবং সমাজোন্নতি মূলক চিন্তাধারায় যে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সমাজের নিকট থেকে তাদের নির্যাতন ও উৎপীড়ন-

ভোগ করতে হয়। কারো কারো জীবন সংশয়ও ঘটে। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই তাঁদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। তাঁদের স্বদেশচেতনা যে দেশ ও সমাজের বহুমুখী শ্রীবৃদ্ধিকল্পেই পরিচালিত হয়েছিল তিরিশের দশকের প্রথমে তা আমরা বুঝতে পারি।

ডিরোজিও-শিষ্য এই ছাত্রদলের মধ্যে যারা তাঁর নিকট পাঠ নেন নি অথচ তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এইরূপ অন্ততঃ তিনজনের নাম আমরা আগে পেয়েছি। তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে সে যুগে বিভিন্ন বিভাগে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, মাধবচন্দ্র মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, দিগম্বর মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতির নাম আমাদের অনেকেরই জানা।

ছেলেদের তথাকথিত উচ্ছৃঙ্খলতায় সমাজ নেতারা প্রমাদ গণেছিলেন। হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ সভার হিন্দু সভ্যগণ এজন্য শিক্ষক ডিরোজিওকেই দায়ী করেন। কলেজ থেকে ডিরোজিওর অপসারণের ব্যবস্থা হ'ল। তিনি ১৮৩১, ২৫শে এপ্রিল শিক্ষকতা পদে ইস্তফা দেন। ডিরোজিও এর পর সংবাদপত্র সম্পাদনা আরম্ভ করেন। তাঁর সম্পাদনা ও পরিচালনায় 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ান' সান্ধ্য দৈনিক বা'র হ'ল ১লা জুন ১৮৩১ তারিখে। অতঃপর ডিরোজিও সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে স্বদেশ সেবায়, বিশেষ করে নিজ সম্প্রদায় ফিরিঙ্গিদের সেবা কার্যে তৎপর হলেন। দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর ১৮৩১ সনের শেষদিকে ফিরিঙ্গিদের পক্ষে সুদিনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সময় ডিরোজিও তাদের উদ্দেশ করে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তাও তাঁর ঐকান্তিক দেশাত্মবোধেরই দ্যোতক। তিনি বলেন তাঁর সম্প্রদায়ের যে সুযোগ সুবিধা-লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাতে যেন তাঁরা বিমূঢ় না হয়ে পড়েন। প্রতিবেশি হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে সকল কাজ করা আবশ্যক। কেন না অপরের নিকট থেকে এতদিন তারা যে সুবিচার ও সদ্ব্যবহার পেতে চেয়েছিলেন, প্রতিবেশিদের প্রতিও সেইরূপ সুবিচার ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে তাঁরা যেন পরান্মুখ না হন। ডিরোজিওর এই সার্থক সাবধানবাণী কতখানি দেশাত্মবোধ থেকে উদ্ভূত তার পরিচয় পরে যথেষ্টই

পাওয়া গিয়েছে। ডিরোজিও ২৩ বছর বয়স পূর্ণ না হতেই ১৮৩১, ২৬শে ডিসেম্বর ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা সমাজের নিম্নতন স্তরেও দ্রুত প্রসারলাভ করতে থাকে তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে।

রামমোহন রায় পূর্বে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন। তখন কিন্তু শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তাঁর একথায় আদৌ কর্ণপাত করেন না। কিন্তু ক্রমে নব রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজ এইরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। কলেজীয় ছাত্রদের ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি কর্তৃপক্ষকে ত্রিশের দশকের গোড়াতেই চমৎকৃত করে তোলে। তাঁরা এই মর্মেও লিখলেন যে স্বল্প সময়ের মধ্যে এতটা উন্নতি তাঁরা কখন ভাবতেও পারেন নি। 'সমাচার দর্পণ' প্রমুখ সংবাদপত্রেও যুবক ছাত্রদের এইরূপ ব্যুৎপত্তি বিশেষভাবে প্রশংসা করতে দেখি।

এখানে আর একটি কথাও কিন্তু মনে রাখা দরকার। কলেজী শিক্ষা ইংরেজী ভাষা সাহিত্যের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। যদিও এটি পাঠক্রমে বিশেষ স্থান পেয়েছিল। বাংলা, সংস্কৃত এবং ফারসীও, ইংরেজীর মত ছাত্ররা এখানে শেখবার সুযোগ পেলেন। ফারসী তখন রাষ্ট্রভাষা। কাজেই এ ভাষা শিক্ষায় প্রত্যেকেই যে বিশেষ আগ্রহ দেখাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! বাংলা এবং সংস্কৃত চর্চাও শুরু হয় কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকেই। প্রসিদ্ধ প্রাচ্য তত্ত্ববিদ ও সংস্কৃতবিশারদ পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানেই প্রথম সংস্কৃতের পাঠ নিলেন। বাঙালী ছেলেরা বাংলা ভাষাও শিখতে সমান আগ্রহী ছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যে মূলে ও অনুবাদে বাংলা পুস্তক রচনা, বাংলা পত্রপত্রিকাদি প্রকাশ প্রভৃতিতে তাঁরা লিপ্ত হন। কলেজে প্রদত্ত বাংলা শিক্ষার উৎকর্ষই এর দ্যোতক বলে আমরা মনে করি।

তখনই পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার মুকুরে এখানকার নবীন ছাত্রদল নিজেদের বিচার বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করছেন। তৎকালে সামাজিক অবস্থার দ্রুত ও সার্থক উন্নতি না হলে স্বদেশের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন যে সম্ভব নয় তাও বুঝতে সক্ষম হলেন। তখন স্পষ্টতঃ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা এঁদের মনে হয়তো আসে নি, কিন্তু কোন কোন বিদেশী চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে এরূপ সম্ভাবনার কথা উদয় হয়েছিল।

হিন্দু কলেজের মত একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে (পরে কিঞ্চিৎ সরকারী সাহায্য এর ভাগ্যে জুটেছিল) যে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হতো তার ফলাফল দেখে ভারতহিতৈষী ইংরেজগণ যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনি অন্য এক-দল ইংরেজ শঙ্কান্বিতও হয়েছিলেন খুব। এই জন্যই বোধ হয় ১৮৩৩ সালে প্রদত্ত সনন্দে—শিক্ষাবাবদ ব্যয়ের কোন বরাদ্দ হয়নি। তবে সনন্দ দানের পূর্বে ইংরেজী শিক্ষার আবশ্যকতা ও ফলাফল সম্পর্কে বহু সরকারী বে-সরকারী পদস্থ ইংরেজের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। মেজর জেনারেল সার লায়ওনেল স্মিথ নামে একজন ইংরেজ কর্মচারী ১৮৩১ সনের ৬ই অক্টোবর পার্লামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে ইংরেজী শিক্ষার ফল সম্পর্কে যা বলেন তা আজকের দিনেও উল্লেখ করার মত। তিনি এই মর্মে বলেন: "ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর মনে একদিন আত্মকর্তৃত্ব লাভের বাসনা জাগবে, এবং তখন আমাদের ভারতবর্ষ থেকে চলে আসতে হবে। এতে আমাদের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই-ই বরং কিছু লাভেরই আশা করা যেতে পারে। আমেরিকা যখন ব্রিটেনের অধীন একটা উপনিবেশ মাত্র ছিল তখনকার চেয়ে সে এখন স্বাধীন অবস্থাতেই আমাদের বেশী উপকারে আসছে। ভারতবাসীরা স্বভাবতই স্বাধীন হতে চাইবে। মুসলমান আমলে যে তারা স্বাধীন হতে চায় নি তার কারণ, তখন তাদের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার ফলে সুতরাং তারা তা চাইবেই। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধেও তারা সচেতন হবে ও নিজ শক্তির পরিমাণ বুঝতে পারবে। এর ফল হবে এই যে তারা স্বদেশ থেকে প্রত্যেক শ্বেতকায় ব্যক্তিকে বের করে দিতেও স্বভাবতই দ্বিধাবোধ করবে না।"

জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকা

দেশ চর্যায় নানান ধারা

লায়ওনেল স্মিথ যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন (পৃ. ৪৬) তা ফলবতী হতে প্রায় শতাব্দী কেটে যায়। তবে এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত আকৃতি ক্রমশঃ বেড়ে গেল। তিরিশের দশকের গোড়াতেই দেখি হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিরোজিও-শিষ্যেরা কেউ কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই নিজ নিজ বাসভবনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁরা নিজেরা যে বিদ্যা আয়ত্ত করছেন তা প্রতিবেশিদের মধ্যে বিতরণ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এ সকল বিদ্যালয় অবৈতনিক। পাড়া-প্রতিবেশি দরিদ্র নিঃসম্বল ব্যক্তিদের সন্তানেরা এখানে এসে শিক্ষালাভ করত। বলা বাহুল্য ইংরেজীও ছিল এ সব বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দেই কলকাতায় এবং কলকাতার উপকণ্ঠে কলেজী ছাত্রদের দ্বারা স্থাপিত অন্ততঃ ছ'টি বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'এনকোয়ারার' সাপ্তাহিকে। এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ এবং নানা উপায়ে শিক্ষার মান নির্ধারণকল্পে কখন কখন ছাত্র দরদী মানবহিতৈষী ডেভিড হেয়ার এবং ছাত্রগত প্রাণ ডিরোজিও যোগ দেন।

হিন্দু কলেজ এবং কলকাতার অপরাপর বিদ্যালয়গুলির ইংরেজী শিক্ষদানের কৃতিত্বের বিষয় স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ ক্রমশঃ অবগত হন ও তাদের মতামত এর অনুকূলে যেতে থাকে। তখনকার দিনে সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ামকরূপে সাধারণ শিক্ষা কমিটি কাজ করতেন। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে একদল ইংরেজী শিক্ষার সাফল্য দেখে এর অনুকূলে মত প্রকাশ করতে লাগলেন। আর একদল কিন্তু আগেকার সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি শিক্ষারই উপর জোর দিতে থাকেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ নাগাদ এই দুই দলের মধ্যে ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়। তখন কমিটির সভাপতি ছিলেন সদ্য আগত বড়লাটের আইন সচিব টমাস বেবিংটন মেকলে। তিনি উভয় দলের তর্কের

মধ্যে না গিয়ে বড়লাট বেন্টিঙ্ককে এই মর্মে একটি মন্তব্যলিপি পাঠান যে, সংস্কৃতাদির পরিবর্তে সরকারী বিদ্যালয়ে ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহন করা কর্তব্য (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫)। বেন্টিঙ্ক তাঁর মত গ্রহণ করে পরবর্তী ৭ই মার্চ সরকারীভাবে ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। এখনও কিন্তু কোম্পানির বিলাতি কর্তারা পূর্ব ধারণা বশে লক্ষ টাকা ব্যয়ের উপরে আর এক কপর্দকও বাড়ান নি ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত সনন্দে। এই নিয়ে তখন কলকাতায় বিশেষ আন্দোলনও উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু এই টাকার অঙ্ক বর্ধিত হয় অনেক পরে।

আর একটি ব্যবস্থার দরুনও ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব সাধারণের মধ্যে অনুভূত হতে লাগল। বেন্টিঙ্কেরই নির্দেশে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথমেই কলিকাতা মেডিকেল কলেজ খোলার আয়োজন হয়। মেডিকেল কলেজে শিক্ষার বাহন স্থির হ'ল ইংরেজী। তৎকালীন হিন্দু কলেজ এবং অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয় থেকেই একশত জন ছাত্র মেডিকেল কলেজের জন্য সংগৃহীত হ'ল। ১৮৩৪-৩৫ খ্রীঃ নাগাদ আরও দু'টি শিক্ষায়তন স্থাপিত হ'ল। একটি জেনারেল এসেমবলিজ ইনস্‌টিটিউশান, অপরটি সেন্‌ট জেভিয়ারস কলেজ। আলেকজেন্‌ডার ডাফ ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি কলকাতায় এসে রামমোহন রায়ের সহায়ে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় খোলেন। এই বিদ্যালয়েরই উন্নততর রূপ জেনারেল এসেমবলিজ ইনস্‌টিটিউশান। ডাফের সহায়তায় রামমোহন বন্ধু রায় কালীনাথ চৌধুরী টাকীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অন্যান্য ভাষার সঙ্গে ইংরেজীও ছিল এর প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। বেন্টিঙ্কের শিক্ষার বাহন সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর কলকাতায় ও মফস্বলে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার ধুম পড়ে যায়। সে সব কথা এখানে বিশদভাবে উল্লেখের প্রয়োজন দেখি না।

ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত কলকাতার ছাত্র-সমাজ ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের প্রথমেই একটি বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিলেন। সত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগই এ বিষয়টির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। হিন্দু কলেজের আদি-কল্পক ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে ডেভিড হেয়ার। কিন্তু ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে নেতৃবর্গ সার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টকে এই সম্মান প্রদানে উদগ্রীব হলেন। বহু অর্থব্যয়ে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি বিলাত থেকে আনা হ'ল। এই সঙ্গে ডাঃ হোরেস্‌

হেম্যান উইলসনেরও একটি তৈলচিত্র তৈরি করারও ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। কলকাতার ছাত্র সমাজ কিন্তু এ ব্যাপারটি বরদাস্ত করতে পারলেন না। সংবাদপত্রেও এ নিয়ে বিশেষ লেখালেখি হয়। ছাত্রদল প্রারম্ভিক আয়োজনাদির পর ডেভিড হেয়ারকে ১৮৩১, ১৭ ফেব্রুয়ারি, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একখানি মানপত্র প্রদান করলেন। তাঁর একটি তৈলচিত্র রচনারও ব্যবস্থা হ'ল এই সময়। আরও নানাভাবে ছাত্রদের বিশেষতঃ ডিরোজিওর শিষ্যগণের স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায় এরও কিছুকাল আগে থেকেই। এ কারণ রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পটলডাঙ্গাস্থ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকেও চলে যেতে হয়, যেমন হয়েছিল ডিরোজিওর বেলায়। তাঁরা কিন্তু দমবার পাত্র ছিলেন না। দেশচর্যা তথা লোকসেবার বিভিন্ন পথ খুঁজে নিলেন তাঁরা।

এই নূতন পথের একটি হ'ল সংবাদপত্র সেবা। লোকহিতকল্পে পুরোপুরি নিয়োজিত হয়েছিল এটি। তিরিশের দশকের শুরুতেই নব্যদল সংবাদপত্র সেবায় মন দিলেন। এই দলের মধ্যে শুধু ডিরোজিও-শিষ্য নয়, ডিরোজিও-পূর্ব যুগের হিন্দু কলেজীয় ছাত্রদেরও কাউকে কাউকে প্রথম থেকেই লিপ্ত হতে দেখি। আবার শুধু ইংরেজী জানা ব্যক্তিগণ নন, বাঙলা-নবীশ যুবজনেরাও বাঙলা সংবাদপত্র সেবায় অগ্রণী হলেন। দেশচর্যার এই ধারাটি আমাদের সর্ববিধ জাতীয় প্রযত্নকে পরিপুষ্ট করতে থাকে। এই কথাই এখানে এখন বলা যাক।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে কিছু জেনেছি। ইনি পূর্ব দশকেই রামমোহন-দ্বারকানাথের সঙ্গে মিলিত হয়ে সংবাদপত্র পরিচালনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। এবারে তিনি নিজেই একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন। এখানির নাম 'রিফরমার', প্রকাশকাল ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩১। পরিচালকরূপে আরও দুজন এই কাগজখানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রসন্নকুমারই ছিলেন এখানির পরিচালক ব্যতীত প্রধান সম্পাদকও। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় Address to Our Countrymen—আমাদের স্বদেশবাসীদের প্রতি—শীর্ষক একটি প্রস্তাব লিখলেন। এই প্রস্তাবে তিনি তৎকালীন প্রগতিশীল ভাবধারা সম্যক অথচ সংক্ষিপ্তরূপে বিশ্লেষণ করলেন। এই প্রস্তাবটি এখনো আমাদের ভূয়োদর্শন স্বরূপ হয়ে আছে।

প্রসন্নকুমার এই মর্মে লেখেন যে, আমরা তখনই স্বাধীনতা এবং সত্যের আস্বাদ পেয়েছি এবং এরই নিরিখে আমাদের যাবতীয় কর্ম পরিচালনায় আমরা অগ্রসর। পূর্বে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের জন্য দেশ বিদেশে বহু নিন্দা হয়েছে কিন্তু বর্তমানে আমরা যে ভাবে স্বাধীনতা ও সত্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি তাতে নিন্দুকেরা অবশ্যই নিরস্ত না হয়ে পারবেন না। আমাদের কাজ এখন উক্ত স্বাধীনতা ও সত্যকে ভিত্তি করে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা। সত্য কথা বলতে কি আমরা দ্রুত এই পথে চলেছি। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এবং নানা গলদ দূর করে সমাজ শীঘ্রই সবল ও সুস্থ হবে। তখন এ জাতিকে কেউ রুখতে পারবে না। প্রসন্নকুমার স্বদেশবাসীর নিকট পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সত্যের আদর্শ তুলে ধরলেন। বাস্তবিকই 'রিফরমার' এই সকল কারণে প্রথম থেকেই জাতির মুখপত্র হয়ে উঠল।

সমাজের সর্বপ্রকার হিতসাধনই প্রসন্নকুমারের লক্ষ্য। পত্রিকার মাধ্যমে এই লক্ষ্য ক্রমে প্রতিভাত হতে লাগল। দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধ হবে। তখনকার দিনে সমাজের স্ত্রী শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন খ্রীষ্টান পাদ্রিরা এবং তাদের স্ত্রীগণ। এই সব স্কুলে কিন্তু খ্রীষ্টতত্ত্ব শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। এবং এ কারণ উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা এর সুযোগ বড় একটা নিতেন না। প্রসন্নকুমার লিখলেন, স্ত্রী-শিক্ষা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে কোন এক বিশেষ ধর্ম শিক্ষার প্রচেষ্টা থেকে দূরে থাকতে হবে। তিনি লিখলেন, এ দিক থেকে হিন্দু কলেজই এই সব বিদ্যালয়ের আদর্শ হওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে প্রসন্নকুমার স্ত্রী-শিক্ষার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। এই পরামর্শ গৃহীত হলে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য আরও দুই দশক আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হত না।

'রিফরমারে' প্রকাশিত প্রসন্নকুমারের আর একটি প্রস্তাবের কথাও এখানে উল্লেখ করি। তখনকার দিনে ফারসী ছিল সরকারী ভাষা। আদালতেও এই ভাষারই আধিপত্য। তিনি ১৮৩১ সনেই লিখলেন যে, বিচারের সুবিধার জন্য এবং জনসাধারণের উপকারার্থে ফারসীর বদলে বাঙলা ভাষার প্রচলনই সর্বপ্রকারে সমীচীন। কথা উঠতে পারে, বিচারকেরা যেমন ফারসী বুঝেন তেমনি বাঙলা বুঝেন না। প্রসন্নকুমার লিখলেন মুষ্টিমেয় ইংরেজ বিচারকেরা ইচ্ছা

করলেই বাঙলা শিখে নিতে পারেন। তাদের সুবিধার জন্য অগণিত জনসমষ্টির অসুবিধা ঘটানো আজব ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রসন্নকুমারের প্রস্তাব কাজে পরিণত করতে আরও আট বছর সময় লেগেছিল সরকারের পক্ষে। বস্তুতঃ প্রসন্নকুমারের বাঙলা-প্রীতি ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি নানাভাবে পরে বাঙলা শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত কখন একক এবং কখন যৌথভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'অনুবাদিকা' নামে 'রিফরমারের' বাঙলা অনুবাদ সাপ্তাহিক প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি বৎসরখানেক ধরে।

'রিফরমার'-এর পরে ডিরোজিও-শিষ্য নব্যবঙ্গভুক্তদেরও এই লোকহিত প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে দেখি। নব্যবঙ্গের অন্যতম প্রধান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই দশকের প্রারম্ভে পটলডাঙ্গাস্থ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে ব্রতী ছিলেন। এই বিদ্যালয় কলিকাতা স্কুল সোসাইটির অধীন থাকলেও এর দেখাশুনা করতেন ডেভিড হেয়ার। এই সময় থেকে প্রধানতঃ হেয়ার সাহেবের তত্ত্বাবধানে আসে এই বিদ্যালয়টি। ডিরোজিও-শিষ্যদের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য তখন সমাজে বড় সোরগোল উপস্থিত হয়েছে। ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বিদায় নিতে হলে এই পটলডাঙ্গাস্থ স্কুলটির শিক্ষকদ্বয়ের উপর সমাজ নেতৃবর্গের কোপের অন্ত রইল না। স্কুলের ভবিষ্যৎ ভেবে অতি দুঃখের সঙ্গে হেয়ার এদের বিদায় দিতে বাধ্য হলেন। ডিরোজিও শিষ্যদল যে বিস্তর এবং বিবিধ নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন সে কথা আমরা পূর্বে জেনেছি। অনেকটা অকারণেই কৃষ্ণমোহনকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। এর পূর্বেই কিন্তু তিনি 'এনকোয়ারার' (১৭ই মে, ১৮৩১) নামক একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক বার করেছিলেন নতুন ভাবধারার প্রবক্তারূপে। ঘর ছাড়া হলেও তিনি কষ্টেসৃষ্টে কাগজখানিকে আগলে রেখেছিলেন। এখানিকে প্রগতিশীল উচ্চ ভাবাদর্শের মুখপত্র করে তুললেও কৃষ্ণমোহন হিন্দু সমাজের ভেতরকার গলদ এবং ত্রুটি বিচ্যুতিও কাগজখানিতে বিশেষ করে প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। দুই একজন বাদে ডিরোজিওর শিষ্যদের আর কেউ কিন্তু এ পথে যাননি ; তাঁরা বরাবর হিন্দুই থেকে গেলেন। সমাজের বিবিধ দোষ-ত্রুটি এবং অনাচার অবিচারের কথা বিশ্লেষণ করে তিনি 'পারসিকিউটেড' নামে

একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখেন মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে। হিন্দু যুবকদের উদ্দেশ্যে এখানি উৎসর্গ করা হয়। কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান হবার বছরখানেক পূর্বে এই নাটকখানি লিখেছিলেন। জাতির হিতসাধন যে তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, সাময়িক উত্তেজনা কেটে গেলে তা ক্রমশঃ বুঝা গেল। বরাবর গোঁড়া খ্রীষ্টান থেকে গেলেও তাঁর সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরে রাজনীতিমূলক কার্যকলাপ এর সাক্ষ্য বহন করে।

এখানে উক্ত নাটকখানির বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। সমাজের নিয়ামক যাঁরা তাঁদের মধ্যে ভণ্ডামির প্রাধান্য ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পেলে সমাজদেহ কলুষিত না হয়ে যায় না। এই কলুষ থেকে মুক্ত করাই ছিল কৃষ্ণমোহন প্রমুখ নব্যদলের মূল লক্ষ্য। এ কাজটি তাঁরা অতিদ্রুত সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। সমাজের আমূল পরিবর্তন এবং তা অতি দ্রুত ঘটানোর জন্য এই দল সমসাময়িকদের নিকট বিপ্লবী আখ্যা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহনের মত রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দাক্ষিণানন্দ (পরে রাজা দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক এবং আরও অনেকে এই জন্য বিশেষ নির্যাতন ও উৎপীড়ন ভোগ করেন। কিন্তু একটু আগে যেমন বলেছি, সাময়িক উত্তেজনা কেটে গেলে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি মত স্বদেশের এবং স্বদেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন সংবাদপত্র ও পুস্তক মারফত এই উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হন। তাঁর মত তাঁর বন্ধুরাও সংবাদপত্র সেবা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা সমাজের সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হলেন। 'এনকোয়ারার' ছিল ইংরেজী সাপ্তাহিক। প্রগতিশীল মতবাদ প্রচারের নিমিত্ত 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক একখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন দক্ষিণারঞ্জন ১৮৩১, ৩১ মে। রসিককৃষ্ণ ও মাধবচন্দ্র এর সঙ্গে এসে যোগ দেন ১৮৩৩, ১ জানুয়ারি থেকে। পত্রিকাখানি তখন বাঙলা ইংরেজী দ্বি-ভাষিকে পরিণত হ'ল। বলা বাহুল্য এটিতে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাও যথারীতি স্থান পেত। অজ্ঞানতা দূর করে স্বদেশবাসীদের মনে জ্ঞানের আলো বিকিরণ করাই এর মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল। দয়া ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং শঠতা বা ভণ্ডামির দূরীকরণ—এই ধরনের কাজে কাগজখানি প্রথমাবধি লিপ্ত হয়েছিল। পত্রিকাখানির 'মটো' বা শিরোভূষণ পাঠে এ সকল কথা আমরা

জানতে পারি। শিরোভূষণটি ছিল সংস্কৃত ও বাঙলায়। এখানে দুটিই পর পর দিলাম।

সংস্কৃত— এহি জ্ঞান মনুষ্যানামজ্ঞান তিমিরং হর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

বাঙলা— বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়েরে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার॥
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥

তিরিশের দশকে 'জ্ঞানান্বেষণ' একটি শক্তিশালী প্রগতিশীল পত্রিকা হয়ে দাঁড়ায়। আর এজন্য রসিককৃষ্ণের কৃতিত্ব আমাদের সর্বাগ্রে স্মরণীয়। হিন্দু কলেজের পড়ুয়া নন বা ইংরেজী নবীশও ছিলেন না এরূপ কোন কোন যুবক এসে ঐ একই উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র সেবা শুরু করে দিলেন। শুধু সংবাদপত্রই নয় পরস্পরের মধ্যে মিলন আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা সভাসমিতি স্থাপনেও অগ্রসর হলেন। এই দলে প্রধান ছিলেন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তখন তাঁর বয়স বিংশতিবর্ষও পার হয় নাই। এই সময়ে কলকাতা থেকে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের প্রতি-পোষকতায় ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশ ও সম্পাদনা আরম্ভ করলেন। তখন কলকাতায় দু'টি দল প্রবল। রামমোহন-পন্থীরা ব্রাহ্ম সমাজের অনুগামী দল এবং রক্ষণশীল নেতৃবর্গ নিয়ে ধর্মসভার দল। ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমে শেষোক্ত দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে প্রগতিশীল বিভিন্ন ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে বার হয়েছিল বটে, কিন্তু কিছুকাল বন্ধ থাকার পর বারত্রয়িক (১৮৩৬) এবং পরে দৈনিক রূপে (১৮৩৯) বার হ'ল। গোড়ায় রক্ষণশীল মতবাদ প্রচারে সহায়তা করলেও ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমে এখানিকে জাতীয় ঐক্যের আদর্শে উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর এই ক'টি পঙক্তির মধ্যেই ঐ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি।

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

তখন আরও কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর বহুল প্রচারিত বাঙলা ও ইংরেজী সংবাদপত্র এখানে ছিল। কিন্তু উক্ত পত্রিকাগুলিতেই সমসাময়িক উচ্চ ভাবাদর্শের কথা অনুরণিত হতে থাকে। আর এতে করে আমরা ভেদবৈষম্য ভুলে স্বদেশ সেবার ভিত্তিতে জাতীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হই।

এই সময়ে হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক বিভিন্ন উন্নতিমূলক কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন। শিক্ষার বাহন নিয়ে বিতর্কের কথা এবং শেষে ইংরেজীকেই বাহন ধার্য করা সম্পর্কে কিছু আগে বলে নিয়েছি। এই প্রসঙ্গে এখানে আরও কিছু বলা আবশ্যক। ইউরোপীয়দের মধ্যে একদল ছিলেন, আগেই বলেছি, সংস্কৃতাদি বাহন থাকার পক্ষে, অপর দল মত প্রকাশ করেন ইংরেজীর সপক্ষে। এই সময় কৃষ্ণমোহন ইংরেজীর সপক্ষতা করায় হিন্দু কলেজের গণিত-অধ্যাপক ডক্টর টাইট্লার তাঁকে পত্রিকায় কটুকাটব্য করেন। টাইট্লার নিজে ছিলেন প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্ এবং ইংরেজী থেকে সংস্কৃতে বই পত্র অনুবাদে লিপ্ত। পত্রিকা স্তম্ভে উভয়ের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়। এই বাদানুবাদ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যা উক্ত দুই দলের কেউই বলেননি। কৃষ্ণমোহন দূরদৃষ্টি বশে তাই ব্যক্ত করলেন। তিনি নানা যুক্তি দেখিয়ে বল্লেন আপাতত ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহন করা আমাদের লাভ। কিন্তু এমন একদিন আসবে, আর সেদিন দূরে নাও হতে পারে, যখন আমরা ইংরেজীর পরিবর্তে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করে নেব। ইংরেজীর সহায়ে মাতৃভাষাগুলি উন্নত হবেই হবে। এই আশার বাণী এমন করে ইতিপূর্বে স্বদেশবাসীকে আর কেউ শোনান নি।

১৮৩৩ খ্রীঃ দু'টি কারণে আমাদের নিকট বড়ই স্মরণীয়। আর এরই মধ্যে নব্যদলের ঐকান্তিক আকৃতি আমরা অনায়াসে লক্ষ্য করি। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩, ২৭শে সেপ্টেম্বর বিলাতে ব্রিস্টল শহরে পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কলকাতা টাউন হলে ১৮৩৪, ৫ই এপ্রিল এক বিরাট শোকসভা হয়। এই সভায় নব্যবঙ্গের নেতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক কৃতজ্ঞতাভরে রামমোহনের গুণপনার কথা উল্লেখ করেন। অপর একটি সভায় কৃষ্ণমোহন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। রামমোহনও ছিলেন প্রগতির পূজারী; সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে সংস্কারপন্থী। কিন্তু এই অত্যগ্রসর নব্যদলের নিকট

তিনিও এক সময় মধ্যপন্থী বলে বিবেচিত হন। ("Coming as far as half the way on religion and politics"—**Enquirer**)। তথাপি তাঁর গুণপনায় ও কৃতিত্বে নব্যদল বিশেষভাবেই মুগ্ধ ছিলেন। টাউন হলে শোকসভায় রসিককৃষ্ণ একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন তাঁর কৃতিত্বের, বিশেষ করে সনন্দ প্রদানকালে বিদেশে তাঁর কৃতকর্মের প্রশংসা করে। তিনি এই বক্তৃতায় একস্থলে এই মর্মে বলেছিলেন—আমাদের দিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে নূতন সনন্দ নিরতিশয় খারাপ ও অকল্যাণকর। তথাপি এর কোন কোন কল্যাণকর ধারার সন্নিবেশ রাজা রামমোহন রায়ের বিলাতে যাওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে। কোটি কোটি লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে যৎসামান্য ব্যবস্থাই এতে আছে। কারণ কতকগুলি চা-করের স্বার্থরক্ষার্থ জনগণের স্বার্থ বলি দেওয়া হয়েছে। তথাপি এই সনন্দে যা কিছু সুধারা আছে তার জন্য আমরা রামমোহনের নিকট ঋণী।

১৮৩৩ সনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোম্পানিকে নূতন সনন্দ প্রদান করেন এই মাত্র তার উল্লেখ পেলাম। এই সনন্দের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে এক জনসভা হয়। এ সম্বন্ধে নব্যদলের মুখপাত্র স্বরূপ রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বক্তৃতার কথা একটু পরেই আমরা জানতে পারব। এই সনন্দ সম্বন্ধে দুইটি বিষয় কিন্তু আমাদের বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। কেননা এ দিক থেকে এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এ কথাই এখন একটু পরিষ্কার করে বলা যাক।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারের উপর কর্তৃত্ব করতেন কোম্পানি। তাদের স্থানীয় প্রতিভূ বড়লাট। কিন্তু এই বড়লাটের ক্ষমতা ছিল সীমিত। তাকে বলা হত "গবর্ণর জেনারেল অফ ফোর্ট উইলিয়ম, বেঙ্গল", অর্থাৎ তিনি ছিলেন বাঙলার বড়লাট। এই শেষোক্ত কথাগুলি ছিল বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ-ভাবে এবং আইনের দিক দিয়েও বড়লাটই স্থানীয় ব্রিটিশ অধিকারের প্রধান কর্মকর্তা। কিন্তু কার্যতঃ এর ব্যত্যয় ঘটতো নানাভাবে। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিদ্বয় প্রশাসন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবেই চলতেন কোম্পানির ডিরেক্টর সভার নির্দেশে। তাঁরা যে সব আইন বিধিবদ্ধ করতেন তা ডিরেক্টর সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চালু হত। "বাঙলার বড়লাটের" তোয়াক্কা তাঁরা বড় একটা করতেন না। এতে অনেক রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বেন্টিঙ্ক যখন

বড়লাট তখন নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে কোম্পানিকে এ সব বিষয়ে লিখলেন। নূতন সনন্দে এর প্রতিষেধকরূপে নূতন ব্যাবস্থা হ'ল। বড়লাট সাক্ষাৎভাবে সমগ্র দেশের কর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। স্থির হ'ল উক্ত দুই প্রদেশের জন্য যে রকম আইন কানুনই করা হোক না কেন তা বড়লাটের অনুমোদন নিয়ে তবে চালু করতে হবে। বড়লাটের উপাধি হ'ল এই সময় থেকে বাঙলার বড়লাটের পরিবর্তে "ভারতের বড়লাট।"

দীর্ঘকাল ধরে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকট হয়ে পড়েছিল সরকারী বিভিন্ন বিধি বিধানে তা স্পষ্টই বুঝা যেত। ঐ স্বাতন্ত্র্যবোধের এই সময় থেকেই, কাজেকাজেই, ভাঁটা পড়ে যায়। কিন্তু এরূপ হলে কি হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপের দরুন এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ঐ ঐ প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যেও খুবই দৃঢ়মূল হয়। আর এ থেকে মুক্তি পেতে দুই দশকেরও বেশী সময় লাগে। আজকাল আমরা প্রাদেশিকতা কথাটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। এমনও শোনা গেছে যে, বাঙালীরা প্রাদেশকিতা বোধে উদ্বুদ্ধ; এমন কি তাঁরা প্রাদেশিকতা দোষেও দুষ্ট। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি আঞ্চলিকতা-প্রিয়তা বা প্রাদেশিকতারই নামান্তর এটি কিন্তু বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ঐ সময় বড় হয়ে দেখা দেয়। সর্ব-ভারতীয় জাতীয় প্রচেষ্টা যখন বাংলাদেশে—এই কলকাতায় শুরু হ'ল তখন ঐ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের কিন্তু এর সঙ্গে পাওয়া যায় নি। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এ বিষয়টি আরও ভাল করে অনুধাবন করতে পারব।

প্রশাসনের দিক থেকে সনন্দ-নিহিত উক্ত ব্যবস্থা আমাদের জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির পক্ষে যেমন সুফলপ্রসূ হয়েছিল তেমনি আর একটি ব্যবস্থা হ'ল যত অনর্থের মূল। পূর্বে ইংরেজদের এদেশে চলাফেরা করতে হলে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র পাওয়া প্রয়োজন ছিল। এবারে, ১৮৩৩ সনের সনন্দে লাইসেন্স প্রথা একেবারে উঠে যায়। পরিবর্তে ইউরোপীয়েরা যথেচ্ছভাবে এ দেশে বসবাস, শিল্পস্থাপন, ব্যবসায়-পরিচালন প্রভৃতির অবাধ এবং ঢালোয়া অধিকার পেলেন। আগেও তাঁরা কিছু কিছু কলকাতা থেকে দূরে মফস্বলে যেতেন। কিন্তু এবার এই সব অধিকার লাভ করে তাঁরা দলে দলে

দূরদূরান্তে গিয়ে শিল্প বাণিজ্যে লিপ্ত হতে লাগলেন। অনেকে ভূমি ক্রয় করে জমিদারও বনে গেলেন। তাদের বিচারের ভার কিন্তু স্থানীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত সমূহের (তাদের বলা হত কোম্পানির বিচারালয়) উপর দেওয়া হ'ল না। পূর্ববৎ কলকাতার সুপ্রিম কোর্টই এই উভয়বিধ বিচারের অধিকারী রয়ে গেলেন। এর কুফলের কথা কিন্তু টমাস বেবিংটন মেকলে পার্লামেণ্টে সনন্দ বিষয়ক বিতর্ককালে ১৮৩২ সনেই পরিষ্কার করে বলেছিলেন। কিন্তু তখন এ অনুযায়ী কাজ হয় নি। মেকলে বড়লাটের প্রথম আইন সচিব হয়ে এদেশে আসেন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং দুই বছর পরেই সনন্দের এই ত্রুটি সংশোধনকল্পে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের আয়োজন করলেন। মফস্বলের বিচারালয়গুলিকে ইউরোপীয়দের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা পরিচালনের অধিকার সম্বলিত তিনি একটি আইন পাসের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু দেখা গেল এই ক' বছরের মধ্যেই তাঁরা এতটা আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন যে, মেকলের এই সমীচীন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন শুরু করেন। এবং প্রস্তাবিত আইনের এই সর্বপ্রথম নাম দেন 'ব্লাক এক্ট' বা কালো আইন।

এখানেই এই কালো আইন সম্বন্ধে দু চার কথা বলে নিই। এই মাত্র বলেছি, মফস্বলের বিচারালয়ে ভারতবাসীদের মত ইউরোপীয়দেরও দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা বিচারের অধিকার দেওয়ার কথা হয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আইন সচিব মেকলে 'অর্দ্ধং ত্যজতি' সূত্র ধরে একটা আপোস রফায় উপনীত হলেন। মফস্বলের দেওয়ানী আদালতগুলিই মাত্র ইউরোপীয়দের দেওয়ানি মামলা বিচারের ভার পেল, ফৌজদারী অপরাধের বিচার ক্ষমতা রয়ে গেল কিন্তু পূর্ববৎ কলকাতার সুপ্রিম কোর্টেরই উপর। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বিচার বৈষম্যের কথা বলতে গেলে পরবর্তীকালের ইলবার্ট বিলের কথা স্বতঃই আমাদের মনে আসে।

সনন্দের পর প্রায় দশ বছরের মধ্যেও কিন্তু এ দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঐ ব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে আদৌ অবহিত হন নি; এবং দেখা গেল নেতৃস্থানীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর ইউরোপীয়দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উক্ত খসড়ার বিরোধিতা করছেন। ইউরোপীয়দের ঔদ্ধত্য, উৎপীড়ন এবং স্বৈরাচার প্রজাকুলকে-

ব্যতিব্যস্ত করে তুললো ক্রমে ক্রমে। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে এই যে জাতিবৈরিতা, এর বীজ সনন্দের উক্ত ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। এই জাতিবৈরিতা ক্রমে এত বীভৎস রূপ ধারণ করে যে, প্রায় চল্লিশ বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র এর উপর একটি চিন্তাশীল নিবন্ধ লেখেন। তিনি কিন্তু একে জাতীয়তার উত্তেজক বলেই অভিনন্দিত করেছিলেন। যা হোক, এখানে সনন্দ প্রসঙ্গে এই দু'টি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের গোড়া থেকেই পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। অবশ্য ১৮৩৩ সনের সনন্দ এ দেশে পৌঁছলে এর উপর ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের নেতৃবৃন্দ একটি সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে নিজ নিজ সমাজের প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করলেন এবং এমনও বল্লেন যে, এটি প্রত্যাহার করে এর বদলে নূতন করে সনন্দ আইন পাস করা হোক। এই বিখ্যাত সভাটি হয় কলকাতা টাউন হলে ১৮৩৫ সনের ৫ই জানুয়ারি।

এই জাতিবৈরিতার উৎস সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু জানা দরকার। আমরা দেখেছি পূর্ব দশকের শেষ নাগাদই কলকাতায় এ দেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের অনুকূলে একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। রামমোহন দ্বারকানাথ প্রমুখ প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ একে কার্যত স্বাগত করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসেই ভারতবর্ষের বিবিধ উপকার হবে। এ কথা পূর্বেই বিশদভাবে বলেছি। ১৮৩৩ সনের সনন্দে সকল বাধা নিষেধ দূর হওয়ায় এই ধারণা আরও দৃঢ় হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ক্রমে দেখা যায় এর বিপরীতটিই ঘটল। পূর্বে বিলাত যেতে ছ'মাস লাগত। এই দশকের শেষ নাগাদ ঐ সময় খুবই হ্রাস পেল। মিশরের পথে বিলাত যাওয়ায় লাগত মাত্র ৪৫ দিন। বাষ্পীয়পোত প্রচলনের ফলেই এটি সম্ভব হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজখাল কাটা হলে এই সময় কমে গিয়ে মাত্র ১৫ দিনে দাঁড়ায়। আগে বলেছি বিজ্ঞান এসে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে মিলন ঘটাবার পথে বিষম বাদ সাধে। অবশ্য এ অনেক পরের কথা। এখানে অবাধ বসতির সুবিধা পেয়ে, ইউরোপীয়েরা প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হলেন বটে কিন্তু যাতায়াতের আকস্মিক সুবিধা ঘটায় তারা তা স্বদেশেই দ্রুত পাচার করতে শুরু করেন। তারাও আর এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হবার প্রয়োজন বোধ করলেন না, যদিও এ অধিকার তারা পূর্ণ মাত্রায় পান। তারা ভারতীয়দের পক্ষে রয়ে যান

birds of passage বা উড়ো পাখি। ব্রিটিশের অর্থবল, বুদ্ধিবল, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতির দ্বারা একসময় ভারতবাসীর যে প্রভূত কল্যাণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা এই সব কারণে আর বাস্তবে পরিণত হতে পারল না। জাতি-বৈরিতা ক্রমে এত প্রকট হয়ে ওঠে যে উভয়েরই এই মিলনাকাঙ্ক্ষা পরে স্বপ্নের ন্যায় অলীক মনে হতে লাগল।

কিন্তু তিরিশের দশকের মধ্যে একটি ক্ষেত্র ব্যতীত এরূপ সম্ভাবনার-আঁচ্ পর্যন্ত করা যায় নি। বরং আমরা দেখি এই দশকব্যাপী যাবতীয় হিতকর্মে ইউরোপীয় ও ভারতীয় মনীষা সম্মিলিতভাবে প্রযুক্ত হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক—সব সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে। এখানে উক্ত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এমন কতকগুলি ব্যাপারের উল্লেখ করব যার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়েরই সম্মিলিত প্রযত্ন বিশেষভাবে নিহিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রুস্তমজি টার্ণার কোম্পানি, দ্বারকানাথের কার ঠাকুর কোম্পানি, কেলসাল ঘোষ কোম্পানি, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি কোম্পানি ও বীমা, ব্যাঙ্ক, বাষ্পীয়পোত প্রবর্তনকল্পে জাহাজ কোম্পানি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে রাজনীতির চর্চাই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের রস ও রসদ যোগায়। এ কারণ এই বিষয়টির আলোচনাই এখানে মুখ্যতঃ প্রয়োজন।

নূতন সনন্দ ভারতবর্ষে পৌছতে তখনকার দিনের স্বাভাবিক কারণেই বেশ সময় লাগে। এ দেশে পৌছবার পর তা বিভিন্ন মহলে প্রচারিত হয়। এতেও কিছু সময় কেটে যায়। এ কারণ দেখি এ সনন্দ সম্পর্কে কলকাতা টাউন হলে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩৫ সনের ৫ই জানুয়ারি। এটি ছিল পুরাপুরি প্রতিবাদ সভা। ইউরোপীয় ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এর দোষত্রুটি দেখিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। ব্যারিস্টার থিয়োডোর ডিকেন্স সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, বিধিবদ্ধ সনন্দ মারাত্মক দোষত্রুটি পূর্ণ, এ কারণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে এই সনন্দ সংশোধন ও পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান হোক। এই প্রস্তাবের সপক্ষে অনেকেই যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। আমরা এখানে নব্যবঙ্গের প্রধান রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বক্তৃতার সারমর্ম দিচ্ছি। ভারতবাসীর রাজনৈতিক জ্ঞান তখনই কত গভীর ও ব্যাপক

ছিল এ থেকে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। আমি পূর্বে যে জাতি বৈরিতার বীজের কথা বলেছি এবং যার প্রথম আভাস পাই পার্লামেণ্টে মেকলের বক্তৃতায়, তা অবশ্য এই সময় কারো চোখে ধরা পড়েনি। হয়তো তখন এটি সম্ভবও ছিল না। রসিককৃষ্ণের বক্তৃতার মর্ম এখানে পুরাপুরি দেওয়া হ'ল।

"মিঃ ডিকেন্স পার্লামেণ্টের নূতন আইনের গুরুতর দোষত্রুটিগুলির উল্লেখ করে বক্তৃতা করেছেন। আমি খুব যত্নসহকারে এ আইন পাঠ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, ভারতের অধিকৃত অঞ্চলগুলির সুশাসনের জন্য ধার্য হলেও এর ধারাগুলি দ্বারা মোটেই ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমি যতই পড়ছি ততই এই কথাটি আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে যে, এ আইনের মূলগত উদ্দেশ্যই হচ্ছে—'স্বার্থ'। এ আইন ভারতবর্ষের উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ হয় নি; কোম্পানির অংশীদারদের এবং ইংরেজ জাতির উপকারের জন্যই এরূপ আইন করা হয়েছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলের কথা মোটেই আইন-কর্তাদের মনে স্থান পায় নি। মিঃ ডিকেন্স কোম্পানির ব্যবসায়গত ঋণের বোঝা ভারতীয় রাজস্বের উপর চাপাবার বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমি এ কার্যকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত মনে করি, আর এতেই বোঝা গেছে—ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদারদের স্বার্থই দেখেছেন, আমার স্বদেশবাসীর স্বার্থ মোটেই দেখেন নি। আমরা একেই অত্যধিক ঋণভারে প্রপীড়িত, এর ওপর পার্লামেণ্ট আবার এই অতিরিক্ত ব্যবসাগত ঋণের বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপিয়েছেন। এ কথা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, ভারতবর্ষের রাজস্বকে এই ঋণের দায়ে আবদ্ধ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা। কারণ যদি কোম্পানির কর্মচারীদের বোকামি ও অব্যবস্থার জন্য এ ঋণ হয়ে থাকে তাহলে এ ভার তাদেরই স্কন্ধে পতিত হওয়া উচিত ছিল, আমাদের স্কন্ধে নয়।

"ডিকেন্স মহোদয় যে সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু না বলে যে দু-একটি বিষয় উল্লেখ করেন নি সে সম্বন্ধে কিছু বলব। আমি জানি অনেকে হয়ত মনে করেন, সামরিক ও বে-সামরিক খ্রীষ্টান কর্মচারীদের জন্য ধর্মযাজক নিয়োগ যুক্তিযুক্ত। এ কথার যুক্তিযুক্ততা আমিও অস্বীকার করি:

না। কিন্তু সামান্য অন্নবস্ত্রেরও কাঙ্গাল দুর্গত ভারতবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ—ভারতীয় রাজস্ব কেন তাদের ভিতরে এমন একটি ধর্মপ্রচারের জন্য ব্যয়িত হবে যা তারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের পরিপন্থী বলে মনে করে? খ্রীষ্টান সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের জন্যই যদি শুধু এ ব্যবস্থা হত তা হলে হয়ত বিশেষ কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু এখানে এর চেয়ে অধিক কিছু করা হয়েছে। আইনে এই মর্মে বলা হয়েছে যে, বড়লাট ইচ্ছা করলে বিলাতের কর্তাদের অনুমতি নিয়ে চার্চ অফ্ ইংলণ্ড এণ্ড আয়ার্লণ্ড ও চার্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ড ব্যতিরেকে অন্যান্য যাজক-সম্প্রদায়কেও এদেশীয়দের খ্রীষ্টতত্ত্ব শেখাবার জন্যে এবং গীর্জাদি নির্মাণের জন্যে অর্থ সাহায্য করতে পারবেন। এর দ্বারা কি এ কথাই স্পষ্টই বুঝায় না যে, ভারতবাসীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা তাদের এমন একটি ধর্মে দীক্ষাদানে ব্যয়িত হবে, যে ধর্মকে তারা মোক্ষলাভের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর বলে মনে করে? এ কি ন্যায্য?—এ কি সঙ্গত? যে ধর্ম নিয়ে ওঁরা এত গর্ব করেন তার শিক্ষা কি এই? আমি তাঁদের ধর্মপুস্তকে এমন কোন শব্দ পাই নি যার মানে এই হয় যে, অনিচ্ছুক লোকের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে যে ধর্মকে তারা অধর্ম বলে মনে করে তাদের মধ্যে সে ধর্ম প্রচার করতে হবে!

"অন্য কোন কোন বিষয়েও ভারতবাসী হিসাবে আমার কিছু বলা আবশ্যক। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেককেই গবর্ণমেণ্টের সকল রকম কার্য করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যাপারে ভারতবাসীদের কোন আপত্তি থাকতে পারে কি না। আমিও বলি, নিশ্চয়ই কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়টি একটু গভীরভাবে আলোচনা করলে আমরা বুঝব, যদিও সনন্দে এরূপ একটা ধারা রয়েছে তথাপি একে ব্যর্থ করবারও যথেষ্ট উপায় করা হয়েছে। আমি (বিলাতের) হেলিবেরি কলেজে অধ্যয়নের অনাবশ্যকতার কথাই বলছি। আমি এ কলেজের কথা অনেক শুনেছি, এবং শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যত শীঘ্র এর বিলোপ ঘটে ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। ভারতবর্ষে যারা কার্য করবে, ভারতবর্ষই তাদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। তারা হেলিবেরিতে যে সব পাঠ নিয়ে থাকে তাতে ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে

প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মানো মোটেই সম্ভব নয়। ভারতবাসীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে, কথা বলে, তাদের নিকৃষ্টতম কুটীরে গমন করে তবে এরূপ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এ ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, সবই বিফল হবে। সাধারণভাবে কলেজ সম্পর্কে আমার এই আপত্তি। কিন্তু আমি অন্য কারণও দেখাচ্ছি যাতে করে ভারতবাসীদের সরকারী কর্মে যোগদানের সুযোগ একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। যতই দুঃখ করি না কেন, একথা ঠিক যে, সমুদ্রপারে যাওয়া ভারতবাসীরা এখন পাপের কাজ বলে মনে করে। শিক্ষার জন্য বছরের পর বছর বিলাতে থাকা—সে ত আরও পাপের কর্ম। ব্যাপার যখন এই, তখন ভারতবাসী কিরূপে ও কাজের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে? হয় তাকে ধর্ম বিসর্জন দিতে হবে, নয় তাকে ঐহিক সুখ-সুবিধা ত্যাগ করতে হবে। হিন্দুরা এসব উচ্চ পদের যোগ্য কিনা সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু যতদিন তাদের মধ্যে এ সংস্কার থাকবে ততদিন পার্লামেণ্টের এমন কোন ধারা নির্ধারণ করা উচিত ছিল যার দ্বারা ভারতবাসীরা সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারে।

"আমি যতই এ আইন পাঠ করছি ততই বুঝতে পারছি যে, এতে ইংলণ্ড-বাসীর ষোল আনা স্বার্থই রক্ষিত হয়েছে। বলা হয়েছে, চা-এর উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে, কিন্তু এতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? আপত্তির কোনই কারণ নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে কেন? ভারতবাসীদের মঙ্গলের জন্য? না! ইংলণ্ডবাসীদের মঙ্গলের জন্যই এ কাজ করা হয়েছে। যদি আমাদের শুভই বিবেচনা করা হত তাহলে লবণ ও আফিঙের ব্যবসায়ে কোম্পানির একচ্ছত্র অধিকার বিলুপ্ত হল না কেন? স্যর্ চার্লস্ গ্রাণ্ট এ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কবে যে তা কার্যে প্রতিফলিত হবে সে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

"বড়লাটের অবাধ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মিঃ ডিকেন্স আপনাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, ইংলণ্ডের আগেকার দিনের সর্বাপেক্ষা স্বেচ্ছাচারী রাজার চেয়েও ইনি ক্ষমতাশালী। তাঁর ক্ষমতা সংযত করবার উপায় কি? এ আবেদন সাফল্যমণ্ডিত হলে অবশ্য একটা উপায় হবে; কিন্তু যে উপায়টি

এতদিন বলবৎ ছিল পার্লামেণ্ট তা কেড়ে নিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট সর্বদা বড়লাটের ক্ষমতার রাশ টেনে রাখত, কিন্তু এখন আর তা হবার জো নেই। সুপ্রিম কোর্ট এখন বড়লাটের অধীন করা হয়েছে, এবং সম্প্রতি কলকাতার একখানা সংবাদপত্র এরূপ মন্তব্য করেছে—'যে ইংরেজ জজেরা নিজ স্বাধীনতার জন্য এতদিন আমাদের পরম গর্ব ও গৌরবের বস্তু ছিল, তাঁদের ক্ষমতা অতঃপর বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনায়ই পর্যবসিত হবে।'

"মিঃ ডিকেন্স ভারতবর্ষের বাণিজ্য-স্বার্থের কথাও উল্লেখ করেছেন। আমি এ আইনে এরূপ কোন ধারা খুঁজে পাচ্ছি না যার ফলে ব্যবসায়গত বাধাগুলি নিরাকৃত হতে পারে। আমার স্মরণ হয়, মিঃ গ্রাণ্ট বলেছেন, ব্রিটিশ বণিকগণ এতই কর্মকুশল যে, তাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তিনি পারেন নি, তাই তিনি চা-এর উপর একচেটিয়া অধিকার তুলে দিয়েছেন। কলকাতার বণিকগণ কতখানি কর্মকুশল বলতে পারি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতীয় ব্যবসায়ের পক্ষে যে সব বাধা বলবৎ রয়েছে তা বিদূরিত হলে এদেশ অর্থ ও শক্তিসম্পদে আরও অধিক শ্রীসম্পন্ন হতে পারত কিনা?

"আর-একটি বিষয় সম্বন্ধেও আমরা আশা করেছিলাম, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কিঞ্চিৎ অবহিত হবেন, কিন্তু সে আশা বৃথাই হয়েছে। এ আইনে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথাও সংযোজিত হয় নি। সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের জন্য দুটি বিশপের পদ সৃষ্টি করা হ'ল, কিন্তু ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হ'ল না! এ অবস্থায় আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই? আইনটি বারবার পাঠ করুন, তা হলে আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন, কতখানি কুৎসিত আকারে এ আইনটি বিধিবদ্ধ হয়েছে। আমার নিবেদন, আইনের কুৎসিত ধারাগুলির পরিবর্তনের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আবেদন করা হোক। এ আইন ভারতবর্ষে ইংরেজের নাম ও শক্তিকে মসীলিপ্ত করেছে।"

এই ধরনের রাজনৈতিক সভা সমিতিতে আমরা নব্যদলকে বিশেষভাবে অগ্রণী দেখি। তবে এর থেকে এরূপ অনুমান করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে, প্রবীণেরাও এ সকল সভা সমিতিতে যোগ দিতেন না বা এ থেকে দূরে থাকতেন। এই ১৮৩৫ সনেই আর একটি সভার কথা এখানে আমরা উল্লেখ

করব। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে ভারতবাসীর জাতীয় আন্দোলনের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। রামমোহন রায় থেকেই এর সূত্রপাত। ১৮৩৫ সনের এপ্রিল মাসে অস্থায়ী বড়লাট স্যার চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েই মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খল মোচনে অবহিত হন এবং পরবর্তী ১৫ই সেপ্টেম্বর আইন জারি করে মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা দান করেন। মেটকাফের এই সাধু অভিপ্রায় জেনে কলকাতার দেশী ও বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঐ সালের ৮ই জুন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে টাউন হলে এক জনসভা আহ্বান করেন। এখানে তাঁকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়ার বিষয়ও স্থির হয়। সভায় বাঙালীদের মধ্যে বক্তৃতা করেছিলেন নব্য দলের রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জনের কথা আমরা পরে আরও জানতে পারব। এ সভায় 'কলিকাতা ক্যুরিয়র' সম্পাদক মিঃ অসবোর্ণ নামে একজন সাহেব দেশী সংবাদপত্রগুলির শৃঙ্খল মোচন অনাবশ্যক বলে এক বক্তৃতা করেন। রসিককৃষ্ণ এর একটি চমৎকার মুখরোচক জবাব দেন। তিনি বলেন—

"অস্‌বোর্ণ স্বীকার করেছেন তিনি দেশী সংবাদপত্র বুঝেন না; এমনকি তার নামগুলিও পড়তে পারেন না, অথচ তিনি তাদের দূষছেন ভয়ানক ভাবে। দেশীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে এ সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞান তাঁর থাকা উচিত ছিল। 'সমাচার দর্পণের' প্রচার বিভিন্ন জেলায়। নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্যে এ কাগজখানি পূর্ণ থাকে। (অস্‌বোর্ণ) মহাশয় নিশ্চয়ই সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয়গুলি দেখে ঐ সিদ্ধান্ত করেননি। দেশীয় কি ইউরোপীয় কোন সংবাদপত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচার করতে পারে না, এবং ইংরেজীর ন্যায় দেশীয় সংবাদপত্র একই আইন দ্বারা শাসিত হতে পারে। এদেশীয়দের উপর এরূপ অবিশ্বাস কেন? ভাল মন্দ সকল জাতের মধ্যেই আছে।"

দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই মর্মে বললেন—"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার আবশ্যকতা সম্পর্কে সভায় দ্বিমত নাই। তথাপি আমি কিছু বলতে উদ্যত হয়েছি এইজন্য যে, প্রস্তাবিত আইন ভারতবাসীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। স্যার চার্লস মেটকাফ আমাদের সর্বপ্রকারেই ধন্যবাদের পাত্র। মিঃ টার্টানের সঙ্গে আমি একমত যে, আমরা যে স্বাধীনতা চাই তা সীমাবদ্ধ

স্বাধীনতা নয়, তা দায়িত্বপূর্ণ অথচ অবাধ স্বাধীনতা। দোষী ব্যক্তি আইনের অধীন নিশ্চয়ই হবে। সে যদি দণ্ডার্হ হয় বিচারালয় নিশ্চয়ই তাকে দণ্ড দেবেন। আমি এজন্য দুঃখিত যে, প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ না করার জন্য লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে। যদি তিনি এ আইন ভাল বিবেচনা করতেন তবে উচিত ছিল এ আইন প্রয়োগ করা, যদি ভাল বিবেচনা না করতেন তবে উচিত ছিল আইনটি তুলে দেওয়া। এর কোনটিই না করা নিছক ভণ্ডামি মাত্র।…”

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত কলকাতার ইউরোপীয় ও ভারতীয়েরা মিলে বহু সভা সমিতির অনুষ্ঠান করেন এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থ উদ্যোগ আয়োজনেও প্রবৃত্ত হন। প্রচেষ্টার ফল—কলকাতার স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপরে প্রকাশ্য স্থলে মেটকাফ হল নামক স্মৃতি ভবন (১৮৪০)। এই ভবনটি ক্রমে সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মের একটি বিশেষ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিখ্যাত কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির স্থায়ী আবাস হ'ল এই ভবন। লাইব্রেরিটিও ইউরোপীয় এবং ভারতীয় যৌথ প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এখন মুখ্যতঃ রাজনৈতিক বিষয়ের কথায়ই আসা যাক। শুধু ভারতীয়দের দ্বারা কিরূপে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয় সে কথা এবারে বলব। কিন্তু এর পূর্বে আরও কোন কোন মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করা দরকার। পরবর্তী অধ্যায়ে এই সব বিষয় উল্লেখের প্রয়াস পাব।

সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভার পরিণতি : বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা

প্রথমেই ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদির কথা উল্লেখ করি। প্রশাসন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে ভূমি ও ভূমি সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিশিষ্ট ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বড়লাট কর্ণওয়ালীশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯২) মধ্যে এর নিরসন করেন। তখন কিন্তু একটি বিষয়ের দিকে মোটেই নজর দেওয়া হয়নি। বাংলা দেশ তথা পূর্বাঞ্চলের মোট ভূমির প্রায় এক তৃতীয়াংশই ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় কারণে নিষ্কর। এই নিষ্কর ভূমিকে 'লাখেরাজ' নামে আখ্যা দেওয়া হত। নির্ব্যূঢ় শক্তির অধিকারী হয়ে কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এদিকে মন দিতে শুরু করলেন দ্বিতীয় দশক শেষ হতে না হতে। ১৮১৯ এবং পরবর্তী ১৮২৭ সনে এই মর্মে আইন বিধিবদ্ধ হ'ল যে, যাবতীয় নিষ্কর জমি সরকার অধিগ্রহণ করবেন। ইংরেজীতে একে বলা হয় "Resumption of Lands"। এই সময়ে এর বাঙলা অনুবাদ দেখি 'নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত-করণ'। কিন্তু এর পরও কয়েক বৎসর কেটে গেল এদিকে কাজ শুরু হতে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দেই সরকার দৃঢ় হস্তে এ কাজটি সম্পন্ন করতে আরম্ভ করলেন। এ নিয়ে ভারতীয় সমাজে তখন বেশ একটা সোরগোল উপস্থিত হয়। এরই বাস্তবরূপ একটি সভার মধ্যে প্রতিফলিত হ'ল অবিলম্বে। কিন্তু এ ব্যাপারটি বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক এই কারণে যে, আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি সাহিত্য সভা রাজনৈতিক সভায় রূপান্তরিত হ'ল (১৮৩৬, ৮ই ডিসেম্বর)। এ সম্বন্ধে আগে কিছু পরিষ্কার করে বলি।

আমরা দেখেছি তৃতীয় দশকের পূর্বেই হিন্দু কলেজ ও ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহে কিশোর এবং যুব ছাত্ররা সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত বিতর্ক সভা স্থাপন করেন। এই সকল আলোচনার মাধ্যম ছিল ইংরেজী ভাষা। কিন্তু ১৮৩২ সনে এর ব্যতিক্রম বড় করেই দেখা দিল।

একটি সভার কার্যক্রমের মধ্যে। বাঙলা সাহিত্যের অনুশীলন এবং সমসাময়িক বিষয়াদির আলোচনা সবই বাঙলা ভাষার মাধ্যমে হবে স্থির হ'ল। এ সভাটির নাম দেওয়া হয়—সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের উদ্যোগে এই সভাটির প্রতিষ্ঠা (১৮৩২, ৩০শে ডিসেম্বর)। এবং বছর তিনেকের মধ্যেই উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যাপকতর ভিত্তিতে আর একটি সভা স্থাপিত হ'ল বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা নামে। পরবর্তীকালের বিখ্যাত 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ হলেন এর সভাপতি, সম্পাদক—দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এর সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হন। এদের মধ্যে ছিলেন 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় কালীনাথ চৌধুরী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, প্যারীমোহন বসু প্রমুখ সাহিত্যিক ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ। গৌরীশঙ্করের পৌরোহিত্যে সভার একটি অধিবেশন হয় ১৮৩৬, ৮ই ডিসেম্বর। একটু আগে বলেছি নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত-করণ ব্যাপারটি নিয়ে লোকের মন তখন তোলপাড় হচ্ছিল। এই সভায় এর সুষ্ঠু প্রতিফলন দেখি রায় কালীনাথ চৌধুরীর একটি প্রস্তাবের মধ্যে। কালীনাথ প্রস্তাব করলেন : সভা অতঃপর এই বিষয়টি নিয়েই আন্দোলন পরিচালনা করবেন। এই উদ্দেশ্যে খানিকটা কাজও হয়েছিল। যদিও এটি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। এটিই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের দেশে প্রথম রাজনীতিক সভা। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বহু বৎসর পরে নিজ 'সংবাদ প্রভাকর'-এ বিষয়টি সম্বন্ধে সখেদে লেখেন :

"রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক, ঐ সভায় মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মুন্সি আমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি সুচারু বিচার হয়, জিলা নদীয়ার বর্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার বিচার হইয়াছিল ঐ সময় সম্বাদ ভাস্কর পত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই,

কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে। রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা ব্রহ্মসভা পক্ষে থাকাতে ধর্মসভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমাদিগের অন্তরে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়।…" (সংবাদ প্রভাকর, ২রা মার্চ ১৮৫২)।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ক্ষোভের কারণ বুঝা এতটুকুও কঠিন নয়। কিন্তু অল্পকালেই ধর্মসভা এবং ব্রহ্মসভার অনুগামীদের মধ্যে অনৈক্য ও মতবিভেদ দূরীভূত হ'ল। নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার প্রয়াসে রক্ষণশীল প্রগতিশীল সকল ব্যক্তিরই কিছু না কিছু স্বার্থহানী ঘটল। এর মধ্যে মুসলমানের স্বার্থহানীও কম ঘটেনি। এ কারণ দেখা যায় বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার অবলুপ্তির পর বৎসর খানেকের মধ্যেই আর একটি সভা স্থাপিত হ'ল উক্ত বিষয়ে নিয়মিত আন্দোলন পরিচালনাকল্পে। আমরা দেখেছি পূর্বেই কোন কোন বিষয়ে প্রতিবাদ সভা হত। নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবও গ্রহণ করতেন এবং আবেদনের আকারে এ সব পাঠাবার ব্যবস্থাও ছিল। এ কারণ কখন কখন প্রতিনিধিও নিযুক্ত হতেন বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়দের নিকট এ সব পৌছে দেবার জন্য। কিন্তু এ সময়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এমন একটি স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হলেন যার মাধ্যমে সরকারী অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে আন্দোলন করা যেতে পারে। জনশ্রুতি, রক্ষণশীল দলভুক্ত প্রাজ্ঞবর দেওয়ান রামকমল সেন এরূপ একটি স্থায়ী সংগঠন স্থাপনের প্রস্তাব করেন সর্বপ্রথম। তখন সকলেই বিপদগ্রস্ত এবং সরকারের প্রশাসনিক বিধিবিধানকে প্রতিহত করতে হলে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই একথাও তাঁরা তখন বুঝতে পারলেন। তাই দেখি ১৮৩৭ সালের ১২ নভেম্বর এই উদ্দেশ্যে একটি প্রাথমিক সভা হ'ল এবং তাতে ভাবী সংগঠনের নিয়মাবলী রচনার জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছিলেন মূল প্রস্তাবক রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রসন্নকুমার প্রথমাবধি এর সঙ্গে যুক্ত থাকায় সকলেরই মনে হ'ল পূর্বেকার দলাদলি ও অনৈক্য ঘুচে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে তাঁরা অগ্রণী হয়েছেন। নিয়মাবলী রচনার উদ্দেশ্যে দু'টি নির্দেশ প্রথমেই দেওয়া হ'ল। একটি, ভূমির

অধিকারীমাত্রেই প্রস্তাবিত সংগঠনের সভ্য হতে পারবেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়টি—জাতি, দেশ ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এর সভ্য হতে পারবেন। এই দ্বিতীয় নির্দেশ থেকে আর একটি বিষয়ও আমরা জ্ঞাত হই। ইউরোপীয়েরা তখন এদেশে স্থায়ী বসবাসের এবং ভূমি ক্রয়ের অধিকার লাভ করেছেন। এই দশকের শেষ নাগাদ দেখা যায় অনেকেই মফস্বলে জমি কিনে শিল্প ও ব্যবসায়াদি কর্মে লিপ্ত। ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে যখন এই সংগঠন, তখন ইউরোপীয়েরাও এর সভ্য হবার ন্যায়তঃ অধিকারী। কাজেও তাই ঘটেছিল।

প্রারম্ভিক আলাপ আলোচনার পর কলকাতা টাউন হলে ১৮৩৮ সালের ২১শে মার্চ রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা হ'ল। এই সভায় প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম দেওয়া হ'ল ভূম্যধিকারী সভা বা জমিদার সভা। ইউরোপীয় ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি কার্য নির্বাহক সভা গঠিত হয়। এ সভায় ছিলেন—থিয়োডোর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ রায়, (আন্দুল), রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব, রামরত্ন রায়, রামকমল সেন, মুন্‌সি আমীর এবং রাধাকান্ত দেব (সভাপতি)। সভার সম্পাদক হলেন দুই জন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক উইলিয়ম কব হারি। সভা অবিলম্বে উদ্দিষ্ট কার্য আরম্ভ করে দিলেন। নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি চল্‌লো। এর ফল যে কতটা শুভ হয়েছিল একটু পরেই তা বলছি। প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয়েও সভার পক্ষ থেকে মতামত প্রকাশিত হতে লাগল; এর মধ্যে ছিল পুলিশ, আইন আদালত, আদালতে ব্যবহৃত ভাষা, রাজস্ব প্রভৃতি সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়। গবর্ণমেণ্ট এই সভাকে অনতিকাল মধ্যেই বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের মর্যাদা দান করলেন। তাদের প্রস্তাবিত আইন কানুন সম্বন্ধে সভার মতামত যাচ্ঞা করা হত। গৃহীত হোক কি না হোক সভার মতামতকে কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতেন। যে মূল উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত তার ফলও খানিকটা শুভ হয়েছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন ভূম্যধিকারী সভা পরিচালিত আন্দোলনের ফলেই প্রতি গ্রামে পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর ভূমি রাখার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেকে রাখতে পারতেন অনধিক দশ বিঘা। তথাকথিত

জমিদারদের সভা হলেও এর দ্বারা জনসাধারণই বিশেষ উপকৃত হন। আর এজন্য প্রসন্নকুমারের অবিরাম চেষ্টার কথা স্মরণ না হয়ে যায় না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রসন্নকুমারের প্রথম স্মৃতি সভায় এ কথাটির উপর বিশেষভাবে জোর দেন। তিনি বলেন সামান্য জমির মালিক রায়তেরাই এর দ্বারা বেশী উপকৃত হন। আর এর মধ্যে সভার সম্পাদক প্রসন্নকুমারের কৃতিত্ব নিহিত রয়েছে বেশী করে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভূম্যধিকারী সভার সার্থক কার্যকলাপ সম্বন্ধে পরে অন্যত্র সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই সভাটি ছিল এদেশের স্বাধীনতা তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা। সভার মাধ্যমে আমরা প্রথমে নিয়মানুগ আন্দোলন পরিচালনে অভ্যস্ত হই। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে জমিদারদের সভা বলে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল সাধারণ অধিবাসীদের পক্ষে একটি বিশেষ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। কি জমিদার কি রায়ত সকলেই এর ফলভোগী হয়েছেন।

ভূম্যধিকারী সভা প্রসঙ্গে আর একটি সোসাইটি বা সমিতির কথাও এখানে বলা একান্ত দরকার। এটি হ'ল ১৮৩৯ সনের জুলাই মাসে বিলাতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই সোসাইটি এখানকার ভূম্যধিকারী সভার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। দেখি ৩০শে নভেম্বর ১৮৩৯ তারিখে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সভার একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সভা এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, বিলাতের সোসাইটিকে এর প্রতিনিধি সভারূপে গণ্য করা হোক এবং সম্বৎসর ভারতবাসীর পক্ষে কার্য পরিচালনার নিমিত্ত থোক টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। বলা বাহুল্য প্রস্তাবটিকে সকলেই স্বাগত করলেন। এর পর থেকে বিলাতস্থ সোসাইটি সভার পক্ষে নানাভাবে প্রচার কার্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হলেন। উক্ত সোসাইটি প্রসঙ্গে জনৈক ভারত হিতৈষীর কথা এখানে বিশেষভাবে কিছু বলতে হয়।

উইলিয়ম এডামের উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা একবার মাত্র করেছি। তিনি এদেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদ্রি হয়ে আসেন। কিন্তু ক্রমে একেশ্বরবাদে আস্থাবান হন এবং রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এডাম প্রধানতঃ 'বেঙ্গল হরকরার' সম্পাদকীয় কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। এদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি-

মূলক বিবিধ ব্যাপারে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। এই এডামের উপরে বড়লাট বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ সনের প্রথমে দেশীয় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং কি কি উপায়ে এর উৎকর্ষ সাধন সম্ভব সে বিষয়ে নিরপেক্ষ মতামত সম্বলিত রিপোর্ট দানের ভার দেন। এডাম তৎকালীন দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করেন এবং একে ভিত্তি করে এর উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৩৫, '৩৬ এবং '৩৮ সনে তিন খণ্ড রিপোর্টে স্বীয় মতামত প্রকাশ করেন। ততদিনে সরকারী শিক্ষা কমিটির মত বদলে যায় এবং এই মূল্যবান রিপোর্টটিকে শুধু নথীভুক্ত করে রাখার নির্দেশ দেন তারা। এডামই প্রথম দেখালেন যে, বঙ্গ-প্রদেশে তখন এক লক্ষ পাঠশালা বিদ্যমান ছিল। যদিও এই সময়কার মাপকাঠিতে এর অধিকাংশই ছিল অনুন্নত। এডাম ১৮৩৮ সনের মাঝামাঝি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি নব্য দলের অন্যতম প্রধান রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে একটি বিষয়ে পরামর্শ করেন। বিলাতে বসে কিরূপে সার্থকভাবে ভারতের হিতসাধন করা যায় সেই বিষয়টিই ছিল এর উদ্দেশ্য। সত্যসত্যই এডাম বিলাত গিয়ে তখনকার দিনের কয়েকজন খ্যাতনামা মানবদরদী ব্যক্তিদের পুরোভাগে রেখে এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন। এদের মধ্যে ছিলেন লর্ড ব্রাউহাম, স্যর চার্লস ফোর্বেস এবং জন ক্রফোর্ড। সোসাইটির কাজ হ'ল ব্রিটিশ জাতিকে ভারতবর্ষের বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে খাঁটি তথ্য পরিবেশন করা। বিভিন্ন স্থলে বক্তৃতা, পুস্তক পুস্তিকা প্রচার এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তথ্যাদি জ্ঞাপন ছিল সোসাইটির কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিষ্ঠার বৎসর দুয়েকের মধ্যেই, ১৮৪১ সনের জানুয়ারি মাসে এডাম সোসাইটির মুখপত্র স্বরূপ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এডভোকেট' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। বিখ্যাত মানব হিতৈষী ক্রীতদাস প্রথার বিরোধী বাগ্মীবর জর্জ টমসন এসে অল্পকাল মধ্যেই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হলেন। তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা সম্যক অনুধাবন করে এ সম্বন্ধে বিলাতের বড় বড় শহরে সোসাইটির পক্ষে বক্তৃতা দেন। তাঁর এ বক্তৃতাগুলি একখানি পুস্তকে নিবদ্ধ হয়ে শীঘ্র প্রচারিত হ'ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির আদর্শে কিরূপে কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয় তার কথা আমাদের বিশেষভাবে জানতে হবে। কারণ এর

মধ্যেই ছিল বিবিধ বিষয়ে ভারতবাসীর আত্ম সচেতন হওয়ার বীজ নিহিত। একটু পরেই এ বিষয়ের আলোচনায় আমরা অবতীর্ণ হব।

ডিরোজিও শিষ্য নব্য দলের কথা আমরা অনেকক্ষণ কিছু বলি নি। এই দল তখনই ইয়ং বেঙ্গল বা নব্য বঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছেন। আমরা দেখেছি তাঁরা অর্জিত বিদ্যা দরিদ্র দেশবাসীর মধ্যে বিতরণে ছাত্রাবস্থায়ই কিরূপ অগ্রণী হয়েছিলেন। শিক্ষকতা কার্যে, পত্রিকা সম্পাদনায় এবং বিবিধ কল্যাণ প্রচেষ্টায় তাঁদের কারো না কারো বিশেষ যোগ ছিল এই তিরিশের দশক ব্যাপী। নব্যবঙ্গের প্রধান রসিককৃষ্ণ মল্লিক সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু ইতি-পূর্বে জেনেছি। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক নির্দেশিত ব্যবস্থাবলে রসিককৃষ্ণ, গোবিন্দ চন্দ্র বসাক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি ১৮৩৭ সনে ডেপুটি কলেক্টরির মত দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। তাঁদেরও আগে ১৮৩২ সন থেকে যোগ্য ব্যক্তিরা মুন্‌সেফি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের প্রখ্যাত ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং দ্বিতীয় যুগের অন্যতম প্রধান হরচন্দ্র ঘোষ। প্রশাসনিক দুর্নীতি তখন এতই প্রবল ছিল যে তারাচাঁদের মত সত্যসন্ধ, কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকেও তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে হয়। তারাচাঁদ কলকাতায় এসে অন্য কর্মে লিপ্ত হলেন। এখানে অবস্থান কালেই নিজগুণে নব্যবঙ্গের নেতৃপদে সমাসীন হন।

এখন আমরা এমন একটি সভার কথা বলতে যাচ্ছি যার মধ্যে শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক পরবর্তীকালের যাবতীয় জনহিতকর আন্দোলনের সূচনা হয় এবং যার পরিণতি ঘটে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে।

ভূম্যধিকারী সভার সমসময়ে কলকাতায় এই সভা স্থাপিত হয়। ভূম্যধিকারী সভার প্রধান উপজীব্য ছিল রাজনীতি অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে ভূমিভিত্তিক রাজনীতি। কিন্তু দ্বিতীয় সভাটি প্রথমাবধি রাজনীতির কাছ ঘেঁসেও যায় নি। এটি ছিল পুরাপুরি বিদ্যাভিত্তিক সংস্থা। নাম থেকেই এর খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। সভার নাম দেওয়া হয়, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। ইংরেজি নাম The Society for the Acquisition for General Knowledge. ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি নব্যদলের মুখপাত্রস্বরূপ তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ,

রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ কয়েকজনের স্বাক্ষরে এই সভার একটি অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হয়। এতে এই মর্মে লেখা হয়েছিল যে, বিদ্যালয়ে আমরা যে সব বিষয় আয়ত্ত করি তা পরবর্তীকালে চর্চার অভাবে কি ব্যক্তি কি সমষ্টি কারও কাজে আসে না; উপরন্তু বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগের উন্নতিও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ জন্য প্রয়োজন অর্জিত বিদ্যার নিয়মিত অনুধ্যান, অনুশীলন ও আলোচনা। ব্যক্তিগতভাবে এ সকল অনুশীলন করা যেমন দরকার তেমনি অনুশীলনের ফলাফল সাধারণে জানাবার জন্য একটি সংগঠনের আবশ্যকতাও যথেষ্ট। এর ফলে পরস্পরের মধ্যে উদ্দেশ্য সাম্য হেতু ঐক্য প্রতিষ্ঠারও সম্ভাবনা রয়েছে। এই শেষোক্ত বিষয়টির উপরে অনুষ্ঠানপত্রে খুবই জোর দেওয়া হয়। এই সনেরই ১২ই মার্চ সংস্কৃত এবং হিন্দু কলেজ হলে একটি সাধারণ সভা হ'ল। তিন শতাধিক যুবক এতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা একযোগে তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে সভাপতি পদে বরণ করলেন। সভায় প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হ'ল এবং এশিয়াটিক সোসাইটির আদর্শে কতকগুলি নিয়মও ধার্য হয়। যাদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হ'ল তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে নিজ নিজ বিভাগে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন: তারাচাঁদ চক্রবর্তী—সভাপতি; রামগোপাল ঘোষ, কালাচাঁদ শেঠ —সহকারী সভাপতি; প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী—সম্পাদক; রাজকৃষ্ণ মিত্র—কোষাধ্যক্ষ। এ ছাড়া উক্ত সমিতির সদস্য হন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন বসু, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ দে। ডেভিড হেয়ার হলেন ভিজিটর বা পরিদর্শক। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রামকমল সেন কলেজ হল ব্যবহারে সভা কর্তৃপক্ষকে ঢালোয়া অনুমতি দিলেন। এর পর সভার অধিবেশন এইখানেই হতে লাগল।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হবার প্রায় দু মাস পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে পুরাণ (ইতিহাস) পাঠের উপকারিতা সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল সারগর্ভ বক্তৃতা করেন (১৬ মে, ১৮৩৮)। এইটিই ছিল প্রথম বক্তৃতা। আর প্রকৃত প্রস্তাবে এর দ্বারাই সভার কার্য শুরু হয়। সভার কর্তৃপক্ষ বিনা আড়ম্বরে সব কাজ পরিচালনা করতেন।

নিয়মিত ভাবে বক্তৃতা দান ও প্রবন্ধপাঠের ব্যবস্থা হ'ল এখানে। এই সব বিষয় ছিল বহুমুখী। কাব্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ই ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করা যাক। প্যারীচাঁদ মিত্র এখানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে এক প্রস্ত বক্তৃতা করেছিলেন। প্রাচীনকালের স্ত্রী-শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তাঁর একটি বক্তৃতা তখনকার দিনে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের' তৎকালীন সম্পাদক উদয়চাঁদ আঢ্য এ দেশীয়দের দ্রুত উন্নতিকল্পে মাতৃভাষার তথা বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব বাঙলায় লেখেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইংরেজী ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই বক্তৃতাদান বা প্রবন্ধ রচনা চলত। বক্তৃতার আকারে হলেও এ সমুদয়ের অধিকাংশই ছিল লিখিত প্রস্তাব। নব্যবঙ্গের অনেকে তখন সরকারী কর্মব্যপদেশে দূর দূর অঞ্চলে যান। এদের মধ্যে ডিরোজিও-শিষ্য গোবিন্দচন্দ্র বসাক বাকুঁড়া, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থান, স্থানীয় লোকজনের কথা, কৃষি শিল্পের অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিস্তর প্রবন্ধ লিখে এই সভায় পাঠের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। সভায় প্রদত্ত ও পঠিত এ সমুদয় বক্তৃতা বা প্রস্তাব বাছাই করে তিন খণ্ড পুস্তকে ছাপা হয় যথাক্রমে ১৮৪০, ১৮৪২ ও ১৮৪৩ সনে। প্রত্যেক পুস্তকের মধ্যে একটি করে সদস্য তালিকাও সন্নিবেশিত দেখি। বাঙলার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যৌবনে প্রায় প্রত্যেকেই এ সভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

প্রকৃত দেশপ্রেম বা দেশভক্তি তখনই সম্ভব যখন আমরা স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে খাঁটি জ্ঞান লাভ করতে পারি। কোন কোন মনীষী এবম্বিধ জ্ঞানকে তিনভাগে ভাগ করেন। যথা, কালজ্ঞান, দেশজ্ঞান এবং লোকজ্ঞান। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার মাধ্যমে পূর্বসূরীগণ এই ত্রিবিধ জ্ঞানলাভে সমর্থ হন এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় নিজেদের ও সাধারণের মনে স্বদেশ-চেতনা দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে। বিজ্ঞানের আলোচনায়ও কিন্তু তখন সভ্যদের কেহ কেহ বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ তখন চিকিৎসা-বিদ্যার মত বিজ্ঞান-শিক্ষারও কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শারীরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞাতব্য অনেক প্রস্তাব পাঠ করেন মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা (সভার প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশের পূর্বে এ

কার্যক্রমের কথা বাইরে বড় একটা জানাজানি হয় নি)। বেঙ্গল হরকরা সম্পাদক এ কারণ ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সাধারণের অগোচরেই নীরবে নির্বাহিত হয়ে আসছে।

সভা কিন্তু ক্রমে প্রশাসনিক দুর্নীতি, পুলিশ ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনায়ও লিপ্ত হয়ে পড়েন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে তারাচাঁদের সভাপতিত্বে ১৮৪৩, ৮ ফেব্রুয়ারি উক্ত বিষয়ের উপর নব্যবঙ্গের অন্যতম প্রধান দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের একটি দীর্ঘ বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা যায়। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন নিমন্ত্রিত হয়ে এ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টের কার্যের যেখানে তীব্র নিন্দাবাদ ছিল সেখানটা শুনেই তিনি বললেন যে, কলেজ গৃহকে একটা রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হতে দিতে পারেন না। সভাপতি তারাচাঁদ রিচার্ডসনের মন্তব্যে ঘোরতর আপত্তি তোলেন এবং তাঁকে বলেন যে, কলেজ গৃহের অধ্যক্ষ তিনি নন, এরূপ মন্তব্য করার অধিকার তাঁর নাই। রিচার্ডসন অগত্যা তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করলেন। এ নিয়ে কিন্তু তখনকার দিনে সংবাদপত্রে খুবই বিতর্ক উপস্থিত হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বললেন, এ রকম বক্তৃতা সামারাঙে বা বাটাভিয়ায় (যবদ্বীপ) যদি দেওয়া হত তা হলে বক্তাকে নিশ্চয়ই নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হত। 'বেঙ্গল হরকরা' পরবর্তী ২ ও ৩ মার্চ তারিখে দক্ষিণারঞ্জনের দীর্ঘ বক্তৃতাটি পুরাপুরি ছেপে দেন। হরকরা সম্পাদক এই মর্মে লিখলেন যে, বক্তৃতার ভাষা তীব্র ও জোরালো হলেও এতে এমন কিছু নেই যাকে রাজদ্রোহাত্মক বলা যায়। এ নিয়ে এত হৈ চৈ করার কোন কারণ ছিল না। 'ইংলিশম্যান', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি এই নব্যদলকে তারাচাঁদের নেতৃত্বাধীন বলে 'চক্রবর্তী ফ্যাকশান' নামে অভিহিত করলেন। এই সময় থেকেই বুঝা যায় অধিকাংশ ইউরোপীয়েরা শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতি ক্রমে কতখানিই না বিরূপ হয়ে পড়ছেন।

রামগোপাল ঘোষ তখন নব্যদলের মধ্যমণি। নিজে ব্যবসায় কর্মে লিপ্ত থেকে আর্থিক দিকে কতকটা সচ্ছল। এইরূপ একটি সভার কার্যের মধ্যেই নব্যদলের হিতকর প্রচেষ্টাকে নিবদ্ধ রাখতে চাইলেন না। তাঁরই উদ্যোগে

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে একখানি দ্বিভাষিক মাসিক পত্র বার হ'ল ১৮৪২ সনের এপ্রিল মাসে। তিনি এর আর্থিক দায়-ঝুঁকিও নিজ স্কন্ধেই নিলেন। কাগজ-খানির প্রধান লেখক ও সম্পাদকরূপে বৃত হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। অপরাপর লেখকদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি। পত্রিকাখানিতে রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক বিষয় এবং কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা ও তথ্যাদি পরিবেশন করা হত। যতদূর জানা যায় ভূমি বণ্টন ও ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে এই পত্রিকাতেই প্রথম লেখা হতে শুরু হয়। প্রচলিত শাসনপদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাও এই পত্রিকায় স্থান পেতে থাকে। এই কাগজখানিতে আর একটি বিষয় ধারাবাহিক যা বের হয় তাতে ভারতবাসীর মহদুপকার সাধিত হয়েছিল। এ কথাটিও এখানে একটু বলা দরকার।

এই সময়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষীয়েরা পর্যন্ত লোকজনকে বেগার খাটাতেন। নব্যদলের অন্যতম প্রধান, জরীপ বিভাগের কর্মী রাধানাথ শিকদারকে এর বিরোধিতা করতে গিয়ে বড়ই নাজেহাল হতে হয়। তাঁকে হয়রানি তো করা হয়ই উপরন্তু বিচারের প্রহসনে তাঁর দুই শত টাকা জরিমানাও হ'ল। এ নিয়ে তখন জোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। এবং কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। এই অসহনীয় বেগার প্রথা এর ফলে উচ্ছেদ হয়ে গেল।

এখন জর্জ টমসনের কথায় আসা থাক। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ সনে বিলাতে গিয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির কল্যাণকর প্রচেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় লাভ করেন। এর অন্যতর প্রধান কর্মী মানবহিতৈষী বাগ্মীবর জর্জ টমসনের কার্যকলাপে দ্বারকানাথ মুগ্ধ হন এবং ঐ সনের ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরবার সময়ে নিজ ব্যয়ে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। তিনি কালবিলম্ব না করে নব্যদলের সঙ্গে টমসনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। যেন মণিকাঞ্চন যোগ হ'ল। জর্জ টমসনকে এই দল ১৮৪৩, ১১ জানুয়ারি সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার পক্ষে তাঁর হিতৈষণামূলক কৃতকর্মের উল্লেখ করে তাঁকে একখানা অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। এর পরে তাঁর বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হ'ল। নব্যদলের নেতৃস্থানীয় তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি এর ভার নিলেন। প্রতি সপ্তাহে ৩১, ফৌজদারি

বালাখানায় (কলুটোলা ষ্ট্রীট ও লোয়ার চিৎপুর রোডের মোড়) বক্তৃতা হতে লাগল। কলকাতার বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা টমসনের বক্তৃতা শুনবার জন্য এখানে ভিড় জমাতেন। টমসনের ওজস্বিনী বক্তৃতায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত ব্যাপক তথ্যাদি পরিবেশিত হত যে শ্রোতারা চমৎকৃত না হয়ে পারেন নি। এই সকল বক্তৃতা ও সভার বিবরণ 'বেঙ্গল হরকরায়' নিয়মিত সবিস্তারে বার হত। সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এর চুম্বক প্রকাশ করতে থাকেন। টমসনের বক্তৃতায় কলকাতার সমাজে বেশ একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বিদ্রূপাত্মক ভাষায় লিখলেন, এখন দুই দিকে কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে—পশ্চিমে বালাহিসারে এবং কলকাতায় ফৌজদারি বালাখানায় !

শুধু বক্তৃতার ব্যবস্থা করেই নব্যদল ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা টমসনের উপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তাঁরই নেতৃত্বে বিলাতের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির আদর্শে কলকাতায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে উদ্যোগী হলেন। টমসন ও নব্যদলের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর স্থির হ'ল যে, শীঘ্রই এই উদ্দেশ্যে সভা করে ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। বিলাতের সভাটি ছিল পুরাপুরি রাজনীতি সম্পর্কিত। নব্যদল সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার মাধ্যমে এতদিন ভিন্ন ধরনের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এখন থেকে এই সভা প্রস্তাবিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবলুপ্ত হ'ল। ১৮৪৩, ১৩ এপ্রিল একটি সভায় মিলিত হয়ে তাঁরা নূতন সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্বলিত কতকগুলি খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবগুলি হ'ল :

প্রথম, সম্যক্ আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা করে সভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের বর্তমান অবস্থায়, আর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে এর যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাতে প্রত্যেকেরই স্বজাতির উন্নতিবিধানে ও স্বদেশের সাধারণ কল্যাণসাধনে যত্নবান হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়, এই সভার মতে ব্যক্তিগত চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় এমন একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ও যুক্তিযুক্ত যার ভিত্তিমূলে সমবেত হয়ে ভারতবর্ষের মঙ্গলসাধনের জন্য এবং [ভারতীয়] ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উন্নতি, কর্মদক্ষতা ও স্থায়িত্ব-সম্পাদনের জন্য জাতি, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে

সকলেই বন্ধুভাবে একযোগে কার্য করতে পারবেন। তৃতীয়, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সোসাইটি স্থাপিত হোক। এর উদ্দেশ্য—ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের এবং এখানকার আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠানগুলি, ধনোৎপাদক উপায়গুলির বর্তমান সত্যকার অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও প্রচার করা এবং শান্তিপূর্ণ ও বৈধ এমন সব উপায় অবলম্বন করা, যার ফলে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর মঙ্গল ও তাদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ হওয়া সম্ভব। চতুর্থ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, তাঁর শাসন মান্য করে এবং ভারতীয় আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সোসাইটি সকল কার্য পরিচালিত করবে। সোসাইটি আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বা যা করলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে এরূপ সকল কর্মেরই বিরোধী। পঞ্চম, সাবালক ব্যক্তি মাত্রেই সোসাইটিকে নির্দিষ্ট হার মত চাঁদা দিলে এবং উপরের মূলবিধিগুলি মান্য করলে সভ্য হতে পারবেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কাউকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হবে না। ষষ্ঠ প্রস্তাবে কয়েকজন সভ্য নিয়ে সাময়িকভাবে একটি কর্মনির্বাহক কমিটি প্রতিষ্ঠার কথা হয়।

২০শে এপ্রিল (১৮৪৩) তারিখে ফৌজদারি বালাখানায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় এ সকল উদ্দেশ্য নিয়ে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হ'ল। ইংরেজ ভারতবাসী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এতে যোগদান করেন। যে চারজনের উপর প্রারম্ভিক কার্যের (জনসাধারণকে সোসাইটির উদ্দেশ্য জ্ঞাপন, কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি) ভার দেওয়া হ'ল তাঁরা ছিলেন—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। সোসাইটির সভাপতি হলেন জর্জ টম্‌সন ও সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। অন্যান্যদের মধ্যে চন্দ্রশেখর দেব ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সোসাইটির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হলেন। টম্‌সন ছাড়া তিন জন ইংরেজও এর কর্মীসভ্য হন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই এর সভ্য হতে পারতেন। তখনকার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নব্যদলও ব্রিটিশ সম্পর্ক বিবর্জিত ভারত শাসনের কল্পনাও করতে পারেন নি। পূর্ব যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা বিদূরণ করে যাঁরা দেশ ও সমাজে শান্তিস্থাপন করেছেন তাঁদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার রামমোহন রায়ের মত তাঁরাও কর্তব্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন। সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য

প্রকাশ পায় তৃতীয় প্রস্তাবে। ২০শে এপ্রিলের প্রকাশ্য সভায় এ প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও সমর্থন করলেন চন্দ্রশেখর দেব। তারাচাঁদ সম্পর্কে টম্‌সন বলেন, "এরূপ আগ্রহশীল নীরব বিনয়ী কর্মী খুব কমই দৃষ্ট হয়। তাঁর মহৎ কর্মৈষণা ও সাধুতা প্রত্যেকেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।" বাস্তবিক তারাচাঁদই নব্যদলের নেতৃত্ব করেন এবং এজন্য ইউরোপীয় সমাজের ওরূপ নিন্দাভাজন হন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের কথাই যখন এই সংগঠনের আলোচ্য তখন এর নাম কেন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি রাখা হ'ল। আগেই বলেছি বিলাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির আদর্শে এই সভা স্থাপিত হয়। মূল সোসাইটির সঙ্গে নূতন সোসাইটির পার্থক্য বোঝাবার জন্যই বেঙ্গল কথাটি এর আগে জুড়ে দেওয়া হ'ল। এর অন্য কোন ব্যাখ্যা করা সমীচীন নয়। কলকাতার নেতৃবর্গ ভারতের ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত সমুদয় অঞ্চলেরই কল্যাণ চিন্তা করতেন এবং এই উদ্দেশ্যে সোসাইটি মারফৎ কার্য করেন। ইদানীংকালে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক কথাটির খুব চল হয়েছে। এ কারণ বেঙ্গল কথাটির সংযোজনের মূলে যে ওরূপ কোন কারণ নেই তা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির বাংলা নাম দেন "ভারতবর্ষীয় সভা"। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষীয় সভা নামের মধ্যেই এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

স্থানীয় সোসাইটি রাজনীতি এবং রাজনীতি বহির্ভূত সমাজ কল্যাণকর নানা বিষয়ের আলোচনায়ই উদ্যোগী হন। পৌরসভার সংস্কার ও উন্নতি সাধন, স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে সভ্যগণ আলাপ আলোচনায় রত হলেন। স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁরা একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। জর্জ টমসনের ভারত-ত্যাগের পর তার স্থলে সভাপতি হন সুপ্রিম কোর্টের উকিল ডব্লু থিয়োবোল্ড। থিয়োবোল্ডের পরে সোসাইটির সভাপতি হন রামগোপাল ঘোষ। রামগোপাল প্রথমাবধি এর সহ-সভাপতি ছিলেন। এদেশে টমসনের অবস্থান কালে ভূম্যধিকারী সভাও পুনরুজ্জীবিত হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ঠাট্টা করে লিখলেন, নিদ্রামগ্ন এই সভাটির পুনরায় নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে। বস্তুতঃ ভূম্যধিকারী সভা অল্পকালের জন্য হলেও এই সময় সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং দেশহিতকর কর্মে

লিপ্ত হন। সভা জর্জ টমসনকে বিলাতস্থ এজেণ্ট বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কি ভূম্যধিকারী সভা কোনটিরই কাজকর্ম বেশি দিন ভালভাবে চলেনি। কয়েক বৎসর পরে কলকাতায় এমন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'ল যার মধ্যে উক্ত দুই সভারই নেতৃবৃন্দ এসে হাতে হাত মেলালেন। এ বিষয়টি পরে বিস্তারিত বলব। এর পূর্বে আরও কোন কোন বিষয়ের কথা বলে নেওয়া দরকার।

প্রথম বৎসরেই নব প্রতিষ্ঠিত সোসাইটি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করলেন। সরকারের কতকগুলি বিধি ব্যবস্থার উপরে তাঁরা মতামত দেন। বিলাতে হাউস অব কমনস্ এবং ডিরেক্টর সভার নিকটে স্মারকলিপি পাঠান। তখন কলকাতা ছোট আদালত (Small Causes Court) স্থাপনের প্রস্তাব হয়। সভা এ সম্বন্ধেও নিজ মতামত জ্ঞাপন করেন। সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে একখানি প্রয়োজনীয় পুস্তক এই সময় প্রকাশিত হ'ল। এখানি ছিল ভারতবাসীর পক্ষে ১৮৩৩-এর সনন্দে উল্লিখিত ৮৭তম ধারায় স্বীকৃত সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত স্মারকলিপির সমর্থনে লেখা। ঐ ধারায় দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে ভারতবাসীর নিয়োগের প্রস্তাব ছিল। প্যারীচাঁদ উক্ত পুস্তক সঙ্কলনকালে মুসলমান আমলে এবং সমসময়ে হিন্দুদের দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কার্যে লিপ্ত থাকার বিষয় সংযোজন করলেন। এ বছরের আরও একটি কাজের কথা উল্লেখ করতে হয়। সভার পক্ষে রায়তের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের নিমিত্ত মফস্বলে তথ্যাভিজ্ঞ লোকদের নিকট একখানি প্রশ্নমালা পাঠানো হ'ল।

সোসাইটির প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৪৪, ২ মে তারিখে। এই সভায় ১৮৪৪-৪৫ সনের নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। এবারে সভাপতি হলেন সুপ্রিম কোর্টের ব্যবহারাজীব ডব্লু, থিয়োবোল্ড। সহকারী সভাপতি হরিমোহন সেন ও জি. এফ. রেমফ্রি। হরিমোহন দেওয়ান রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র। সম্পাদক—প্যারীচাঁদ মিত্র ; কোষাধ্যক্ষ—রামগোপাল ঘোষ। কার্যকরী সমিতির সভ্যদের মধ্যে ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মিত্র, জি. এফ. স্পীড, এবং ই. কোলব্রুক।

দ্বিতীয় বর্ষে সভা এমন কতকগুলি কার্যে মনঃসংযোগ করেন যা ঠিক নিছক রাজনীতির পর্যায়ে পড়ে না। অবশ্য রাজনীতিই ছিল এর মূল উপজীব্য বিষয় নব্যদল স্বতঃই রাজনীতিতে অগ্রগামী ছিলেন না। তাঁরা সমাজের বিবিধ কুসংস্কার, গলদ ও দুর্নীতি নিরাকরণেও তৎপর হয়েছিলেন। আর এই কারণেই মনে হয় সমকালীন রক্ষণশীল নেতৃবর্গ সভার কার্যে তেমনভাবে যোগ দিতে পারেন নি। বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কর্মকর্তৃসভা আন্দোলন ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন এই সনে। কলকাতার পৌরসভাও তাদের দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি। গভর্ণমেন্টের আইন কানুন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাদের আলোচনা পূর্ববৎই চলে। বিধবা বিবাহের পুনঃ প্রবর্তন উদ্দেশ্যে এর প্রায় একযুগ পরে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সার্থক প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। তবে নব্যদলের মনেই এ বিষয়ে যে প্রথম ভাবনা দেখা দেয় তা এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। বহু বিবাহ-উচ্ছেদকল্পে বিদ্যাসাগর কয়েক দশক পরে যত্নপর হয়েছিলেন। এরও সূচনা দেখি এই সনের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে। নব্য দল স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায়ই তাঁরা এ বিষয়ের আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হন। এই সময় থেকে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে তাঁরা সবিশেষ তৎপর হন। দেখি এই দশকের শেষে বেথুন যখন একটি সাধারণগম্য ধর্মনিরপেক্ষ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী তখন এই নব্য দলের নেতৃবৃন্দই সর্বপ্রকারে তাঁর সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন।

সভার তৃতীয় বর্ষে (১৮৪৫—৪৬) সভাপতি পদে বৃত হন রামগোপাল ঘোষ স্বয়ং। এর কার্যক্রম সমসাময়িক পত্রপত্রিকাদিতে তেমন উল্লিখিত হতে দেখি না। তবে সভার পক্ষে রামগোপাল যে নানারূপ জনহিতকর কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। সভার সভাপতিরূপেই তিনি এই দশকের শেষে এমন একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন যার জন্য তাঁর উপর ইউরোপীয়দের কোপাগ্নি বর্ষিত হয়। এই সময়ে আর একটি কারণে রামগোপালের বিশেষ প্রশংসা হয়। বড়লাট হার্ডিঞ্জকে ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে (১৮৪৮ জানুয়ারি) স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে একখানি মানপত্র দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল। মানপত্রে এদেশীয়দের পক্ষে হিতকর তাঁর অনুসৃত শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উল্লেখ ছিল না। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব করলে

ইউরোপীয়দের পক্ষে তুমুল প্রতিবাদ হয়। রামগোপাল কৃষ্ণমোহনের সমর্থনে যুক্তি প্রমাণাদি সহ এমন চমৎকার বক্তৃতা করেন যে, শ্রোতারা একেবারে মুগ্ধ হন এবং সংশোধনী গ্রহণের সপক্ষে মত দেন। রামগোপালের বাগ্মিতাশক্তি খুবই প্রশংসার্হ হ'ল। পরদিনকার ইউরোপীয় সম্পাদিত কাগজগুলিতে গ্রীসের বিখ্যাত বাগ্মী ডেমস্থিনিসের নামে তাঁরও নাম দেওয়া হ'ল 'ইণ্ডিয়ান ডেমস্থিনিস' বা ভারতীয় ডেমস্থিনিস।

আমরা ভারতবর্ষীয় সভার কথা প্রসঙ্গে অনেক দূর চলে এসেছি। এই সভা প্রতিষ্ঠাকালে কলকাতায় আরও একটি প্রতিষ্ঠান বিবিধ জনহিতকর কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরও উদ্ভব হয় পূর্বোক্ত ভূমিভিত্তিক ভূম্যধিকারী সভা এবং বিদ্যাভিত্তিক সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রতিষ্ঠার দেড় বৎসরের মধ্যে, ১৮৩৯, ৬ অক্টোবর তারিখে। এ হ'ল সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী সভা। এটি ছিল মূলতঃ ধর্মভিত্তিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম দিকে এটি ছিল খানিকটা ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। তিন চার বৎসরের মধ্যে এর কার্যক্রম ব্যাপক হয়ে পড়ে এবং সে জন্য সাধারণ মানুষ বিশেষ উপকৃত হন। অবৈতনিক বাঙলা পাঠশালা স্থাপন, তথ্যসমৃদ্ধ বাঙলা পুস্তক প্রকাশ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে এই সভা শিক্ষা সংস্কৃতিমূলক নানা কার্যে অগ্রসর হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন : ভারতবর্ষীয় সভা এবং তত্ত্ববোধিনী সভা উভয়ে উভয়ের পরিপূরক রূপে শক্তিশালী সংগঠন হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন দিক থেকে স্বদেশ সেবায় প্রবৃত্ত হয়। তারই কথা এখানে কিছু উদ্ধৃত করি।

"তৎকালিক কৃতবিদ্য বাঙালী মাত্রেরই অন্তঃকরণে স্বদেশীয় সামাজিক দোষ সংশোধন করাই যে সর্বাপেক্ষা প্রধানতম কার্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ইহা সেই সময়ের ভারতবর্ষীয় সভার কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করিলেই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।......ফলতঃ ভারতবর্ষীয় এবং তত্ত্ববোধিনী সভার আনুপূর্বিক ক্রমে কার্য পর্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় যে, যতদিন তত্ত্ববোধিনী সভা বল প্রকাশ করিতে না পারিয়াছিলেন, তাবৎকাল ভারতবর্ষীয় সভাও আপন প্রকৃত কার্যে অভিনিবিষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু হার্ডিঞ্জ সাহেবের অধিকার কালের মধ্যেই এই উভয় কার্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

তত্ত্ববোধিনী সভা নব্যদলের ধর্মপ্রণালী সংস্থাপিত করিলেন, এবং একজন সুবিজ্ঞ বাঙ্গালীবাবু [রামগোপাল ঘোষ] ভারতবর্ষীয় সমাজের সভাপতি হইয়া রাজকার্যে সভার স্থির দৃষ্টি জন্মাইলেন। সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, এ দেশীয় লোকেরা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোন কার্যই করিতে পারেন না, আর ইহারা যাহা করিতে পারেন তাহাও অপরের অনুকৃতি মাত্র হয়। কিন্তু ব্রহ্ম ধর্ম [এখানে তত্ত্ববোধিনী সভা] এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ এই দুইটিই অপরের সহায়তা বা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার দ্বারাই হিন্দু সমাজের ভাবী পরিবর্তসমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃ. ৪১-৪২)।

চল্লিশের দশকে শেষ পাঁচ বৎসরকাল ভারতীয় সমাজে কোন কোন কারণে বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত হয়। বিবিধ প্রচেষ্টার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় তার দরুন সাময়িক অথচ গুরুতর সঙ্কট মোচন সম্ভব হয়েছিল একথা একটু পরেই আমরা বলব। এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করাও প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে কোন কোন লেখক গত যুগের জাতীয় আন্দোলন সমূহকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন বলে আখ্যাত করতে চেয়েছেন। একথা বলার উদ্দেশ্য বা ব্যঞ্জনা ঠিক ঠিক অনুধাবন করা শক্ত। তখনকার দিনে নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সরকারী ও সওদাগারী আপিসে কর্ম করে এবং স্বাধীন ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনের ফলে কিছু কিছু ধন সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। এরা অনেকেই বিভিন্ন স্তরের স্বল্পবিত্ত বা নিঃসম্বল পরিবার থেকে আগত। তাঁরা কিন্তু পূর্বাবস্থা কখনও ভোলেন নি। তাঁদের যাবতীয় কল্যাণ কর্ম সাধারণ মানুষের জন্যই উদ্দিষ্ট হয়েছিল। এ কারণ বলতে হয় তাদের প্রচেষ্টাসমূহ বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর সাধারণ মানুষের উপকারেই এসেছে বেশী করে। তবে এ সব আন্দোলনে সত্যস্পৃষ্ট তথাকথিত মধ্যবিত্ত লোকেরাই নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। এ কারণ একে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিচালিত আন্দোলন অবশ্যই বলা চলে। নেতৃবর্গ জাতীয় ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যুগে যে সব কল্যাণকর্ম শুরু করে দেন তা তাঁরা কখনও কোন শ্রেণী বিশেষের জন্য করেন নি, সাধারণ মানুষের জন্যই করেছিলেন। কাজেই ঢালোয়াভাবে ওরূপ দ্ব্যর্থবোধক কথা বলা আদৌ সমীচীন নয়।

আদর্শ-সংঘাত ঃ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা —সামাজিক ও রাজনৈতিক

নেতৃবর্গের যাবতীয় হিতকর্ম যে সাধারণ মানুষের জন্য উদ্দিষ্ট ছিল এই মাত্র তার আভাস দিয়েছি। এই সকল হিতকর্মের একটির কথা এখানে আগে বলা দরকার। এ থেকেই অবশ্যই বুঝা যাবে তাঁরা জনগণের হিতার্থেই নিজেদের কতখানি নিয়োজিত করেছিলেন। আর এ থেকেই বাঁধলো আদর্শ সংঘাত। এই কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা যাক।

সরকার দেশীয় প্রাচীন কি আধুনিক সকল ভাষাই অগ্রাহ্য করে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম বলে গ্রহণ করেন। সরকারী স্তরে উচ্চ অনুচ্চ সকল বিদ্যালয়ে এ মাধ্যম অনুসৃত হতে লাগল। যখন বুঝা গেল ইংরেজী জানা লোকেরা সরকারী চাকরি পাবেন তখন লোকে এ দিকে ঝুঁকে পড়ল। আবার নানা ধরনের নূতন নূতন ইংরেজী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এর ফলে বাঙলা শিক্ষার বিশেষ অপহ্নব ঘটে। বাঙলা শিক্ষা মানে জনগণের শিক্ষা। পূর্বেকার অত শুভকর স্কুল সোসাইটি তখন মৃত। বাঙলা পাঠশালাগুলির উৎকর্ষ সাধন তো দূরের কথা রক্ষণাবেক্ষণও কঠিন হয়ে পড়ে। সরকারী শিক্ষা নিয়ামক কমিটি কখন কখন বাঙলা শিক্ষার আবশ্যকতার কথা বললেও কার্যতঃ তেমন কিছু করেন নি। এই অভাব পূরণের জন্য এগিয়ে এলেন আমাদের নেতৃবৃন্দ। পূর্বে বলেছি সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় উদয়চাঁদ আঢ্য বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য এই ধরনের বিদ্যালয় অধিকতর উপযোগী বলেছিলেন। কেননা সাধারণের মনে সর্বপ্রকার বিদ্যার প্রতি—তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত—আগ্রহ জন্মানো এর দ্বারাই সম্ভব। বিলাতের স্কুলগুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বারা ছেলেরা দ্রুত বিবিধ বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হয়। এ দেশেই বা তা হবে না কেন?

দেশের মনীষীগণ বাঙলা শিক্ষার অপহ্নব বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ একটি আদর্শ বাঙলা পাঠশালা স্থাপনে অগ্রণী হন। হিন্দু কলেজের অধীন এই পাঠশালা স্থাপিত হ'ল ১৮৪০, ১৮ই জানুয়ারি।

এ দিনে পাঠশালার অধ্যক্ষ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাঙলা ভাষার সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। বিদ্যার এমন কিছু বিষয় নাই যা বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিদ্যাবাগীশ বলেন, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন যাবতীয় বিষয়ই বাঙলার মাধ্যমে পরিবেশন করা এতটুকুও অসাধ্য নয়। তাঁর এই বক্তৃতাটি পরবর্তীকালেও বাঙলা ভাষার একটি দিগ্‌দর্শন হয়ে থাকে। হিন্দু কলেজের এই পাঠশালাটি যদিও প্রাথমিক স্তরের তথাপি এখানে সকল বিষয়ই বাঙলায় শেখানো আরম্ভ হয়।

এই পাঠশালার আদর্শে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তী জুন মাসে (১৮৪০)। ক্রমে এই আদর্শে মফস্বলেও বাঙলা বিদ্যালয় কিছু কিছু স্থাপিত হয়। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই তো যথেষ্ট নয়। এজন্য বিবিধ বিষয়ের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক দরকার। এতদিন কলকাতায় স্কুল বুক সোসাইটি পাঠশালার পঠিতব্য পুস্তকাদি সরবরাহ করতেন। কিন্তু ক্রমে নূতন পরিবেশে জাতীয় আদর্শে নূতন ধরনের পুস্তক রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সকল পুস্তক লেখায় হাত দিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং আরও অনেকে। তবে এসব পুস্তক নিয়ে শীঘ্রই একটা গোল বাধল। হিন্দু কলেজ তখন সরকারের আওতায় এসে গেছে। এর অধীন পাঠশালায় পঠিতব্য বই পুঁথির উপর শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে। তাদের উদ্দেশ্য হ'ল এমন ধরনের বই পুঁথি প্রণয়ন করানো যার মধ্যে সাধারণ ভাবে জ্ঞান বিজ্ঞান মূলক বিষয় প্রকাশ পায়। সমাজের কোন রকম শ্রেণী বা সমস্যার কথা এর মধ্যে থাকবে না। তারা পাদ্রী উইলিয়ম ইয়েটসের পরামর্শ গ্রহণ করে স্থির করলেন যাবতীয় পাঠ্য বই প্রথমে ইংরেজীতে লেখা হবে তারপর তা থেকে অনুবাদ করে পুস্তকাদি প্রকাশিত হবে। এই ঘোরালো ব্যাপারটিতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয়নি। স্কুল বুক সোসাইটি তো বলেই ফেললেন যে, এমন আজগুবি, অবাস্তব ব্যাপার কখনো কার্যকরী হতে পারে না। পাঠ্য বই রচনা নিয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং দেশীয়দের মধ্যে মন কষাকষির সূচনা হ'ল। উভয়েরই পথ ভিন্ন। কাজেই সংঘাত উপস্থিত হবে না কেন?

শিক্ষা নিয়ামক কমিটি অর্থাৎ সংক্ষেপে শিক্ষা কমিটি বা সমাজ বাঙলা শিক্ষার উপরে বরাবর বিমাতৃসুলভ আচরণই করেছেন। এমন কি বড়লাট হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪-৪৫ সনে বঙ্গ প্রদেশে (বাঙলা, বিহার, ওড়িশা ও আসাম) যে ১০১টি আদর্শ বিদ্যালয়, যা সাধারণের নিকট বঙ্গ বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়—স্থাপন করেন তারও পরিচালনা ভার কিন্তু এই কমিটির উপরে দিলেন না, দিলেন রাজস্ব বোর্ডের উপর। কয়েক বৎসর পরে অবশ্য শিক্ষা কমিটি এর ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু কি রাজস্ব বোর্ড, কি শিক্ষা কমিটি কারো অধীনে থেকেই এ বিদ্যালয়গুলির শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তখন ইংরেজী প্রচারেই মশগুল। ১৮৪৮ সনের ১জুন হেয়ার স্মৃতি সভায় মনস্বী রাজনারায়ণ বসু সখেদে এই উক্তি করেছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিকেই পরিপোষণ করতে উদ্যোগী, তারা বাঙলা বিদ্যালয়গুলির প্রতি সপত্নীপুত্রবৎ ব্যবহার করে থাকেন। তাই এগুলির অবস্থা ভাল হওয়ার সম্ভাবনা তখনই সুদূরপরাহত হয়ে ওঠে।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলা সঙ্গত। ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির নীচের শ্রেণীগুলিতে বাঙলা শিক্ষা দেওয়া হত। তাতে করে বাঙলার চর্চা ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে খানিকটা অব্যাহত ছিল। কর্তৃপক্ষ মনে করতেন ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আহৃত বিদ্যা ক্রমে—পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান মূলক বিষয়াদি বাঙলা ভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করবেন। এবং তাতে করে বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি হবে। কোন কোন সদাশয় ইংরেজ পদাধিকার বলে বাঙলা ভাষার চর্চায় উৎসাহ দিতেও অগ্রসর হন। বেথুন সাহেব হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বাঙলা রচনাকারীকে স্বর্ণ পদক প্রদানের ব্যবস্থা করেন নিজে থেকে। তিনি হিন্দু কলেজ, ঢাকা কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ প্রভৃতির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায় ছাত্রদের বাঙলা সাহিত্য চর্চায় উদ্যোগী হতে বরাবর উপদেশ দিয়েছেন। অন্যান্যদের মত তাঁরও বিশ্বাস ছিল এই সকল ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা বাঙলা ভাষা ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করবে। কবিবর মধুসূদন দত্ত বেথুনেরই উপদেশে ইংরেজীর বদলে বাঙলা চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে অনেকেরই ধারণা। এত কথা বলার পরেও কিন্তু চল্লিশের দশকে বাঙলা শিক্ষা যে বিশেষ

উৎকর্ষলাভ করতে পারে নি সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। আদর্শ-বিরোধই ছিল এর মূলে।

এখানে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। জনশিক্ষা বা জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি সরকার সাধারণভাবে ঔদাসীন্যই প্রকাশ করে এসেছেন। উইলিয়াম এডাম লাখখানেক দেশীয় পাঠশালার অস্তিত্বের কথা পূর্ব দশকেই বলেছিলেন। তিনি যে মূল্যবান রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টে পেশ করেন তাতে এই দেশীয় পাঠশালা সমূহকেই ভিত্তি করে শিক্ষা সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনা সরকারের নিকট গ্রাহ্য হয় নি। অনাদর ও অবহেলা হেতু পাঠশালাগুলি অনুন্নত ও অসংস্কৃতই থেকে যায়। বহু ক্ষেত্রে ইংরেজী বিদ্যালয়ের চাপে পড়ে উঠেও যায়। তবে পরবর্তী দশকের মাঝামাঝি জনশিক্ষার এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন হয়। এর পরিকল্পনা এবং রূপায়ণের ভার পড়ে এক স্বদেশীয় প্রধানের উপর। তখন থেকে জনশিক্ষার মোড় ফিরল। একথা পরে যথাস্থানে বলা যাবে।

(২)

ইংরেজী শিক্ষার দিকে বিভিন্ন কারণে দেশবাসী ঝুঁকে পড়েছিলেন। এর সুযোগ নিয়ে মিশনারীরা নানা স্থানে, বিশেষতঃ কলকাতায় অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু করে দেন। আগে থেকেই যে কোথাও কোথাও তাঁরা এ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হন তা পূর্বেই বলেছি। এই মিশনারী প্রদত্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষা থেকে আর একটি সংঘাতের সূচনা হ'ল। অবৈতনিক শিক্ষার দিকে স্বভাবতঃই সাধারণে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু পাদ্রীদের স্কুলে অক্ষরজ্ঞান হবার পরই সকলকেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে খ্রীষ্ট-তত্ত্ব শেখাবারও ব্যবস্থা হয়। পাদ্রীদের প্ররোচনায় বিস্তর কিশোর বালক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করল। এর ফলে সমাজের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত হয়। ক্রমে এই আলোড়ন একটি সুনির্দিষ্ট আন্দোলনে পরিণত হ'ল। আর এর পুরোভাগে এসে পড়েন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মারফত দেবেন্দ্রনাথ ও সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত খ্রীষ্টানী উপদ্রব সম্বন্ধে সমাজের দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে লাগলেন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগও স্থাপিত হ'ল একে প্রতিহত করার জন্য। নব্যপন্থীদের সঙ্গে রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নেতৃবৃন্দও এসে মিলিত হলেন।

খ্রীষ্টান করার ব্যাপারটা এক বিশেষ কারণে ভারতীয়দের মনে আতঙ্কের সৃষ্টিও করে। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি ব্রজনাথ ঘোষ নামে জনৈক ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালককে খ্রীষ্টান করার উদ্দেশ্যে আটক রাখা হয়। তখন সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের ফলে বিচারপতিরা হেবিয়াস কর্পাসের অনুকূলে এই রায় দেন যে, ব্রজনাথকে ছেড়ে দিয়ে তার বাবার জিম্মায় ফিরিয়ে দিতে হবে। এই অনুযায়ী কাজ যে হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই দশকের মাঝামাঝি, ১৮৪৫ সন নাগাদ উমেশচন্দ্র সরকার নামে একটি বালককে মিশনরীরা খ্রীষ্টান করার উদ্দেশ্যে আটক করে। সে ছিল ডাফ স্কুলের ছাত্র। উমেশচন্দ্রের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের জন্য যথারীতি আবেদন করা হয়। কিন্তু এবারে বিচারপতিরা হেবিয়াস কর্পাস প্রয়োগ করা থেকে বিরত রইলেন। প্রত্যেকেই এই ব্যাপারে দেখলেন পাদ্রীদের প্রভাব প্রতিপত্তি শুধু শাসন কর্তৃপক্ষের উপর নয়, বিচার আদালতের উপরেও কিরূপ বিস্তার লাভ করেছিল। এ কারণে কি রক্ষণশীল কি প্রগতিশীল, আমাদের নেতৃবৃন্দ খ্রীষ্টান বিরোধী আন্দোলনে তৎপর হয়ে উঠলেন বেশী করে।

বুঝতে কারোরই কষ্ট হ'ল না যে, অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিই খ্রীষ্টানীর কেন্দ্রস্থল। সমাজ নেতৃবৃন্দ ইংরেজী অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা এর গতিরোধ করতে উদ্যোগী হলেন। এ বিষয়ে অগ্রণীদের মধ্যে দেখি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেনকে। তাঁরা রাজা রাধাকান্ত দেব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একযোগে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনে সমর্থ হন। এটির নাম দেওয়া হয় হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠাকাল ১ মার্চ ১৮৪৬। এরূপ একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে কিছু বিলম্ব হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কলকাতার 'রথচাইল্ড' মতিলাল শীল কয়েক বৎসর পূর্বে শীল্‌স্ ফ্রি কলেজ নামে একটি অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজ ভবনে পুনরায় ১৮৪৫ সনে সাধারণগম্য আর একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সহস্রাধিক ছেলে এই দু'টি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে এসে ভিড়

জমালো। মতিলালের স্কুলটির কথা পরে আর শোনা যায় নি। তবে তাঁর শীলস্ ফ্রি কলেজে বরাবরই ছেলেদের অবেতনে পড়ার সুবিধা করে দেওয়া হয়। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের শাখা স্বরূপ কলকাতার নিকটবর্তী কোন কোন স্থলেও অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টানীর স্রোত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই উপায়টি সর্বপ্রথম অবলম্বিত হয়। কিন্তু একে সার্থক করে তোলার জন্য তাঁরা অল্পদিন পরে একটি সভায় মিলিত হলেন। এই সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৪৭ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের নেতৃবৃন্দ এতে যোগদান করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী নেতৃবৃন্দ যে উপস্থিত ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। সভায় সমবেত সকলে একটি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করলেন। এটি ছিল এই মর্মে—হিন্দু সমাজের কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টান পাদ্রীদের স্কুলে ছেলে পাঠাবেন না, নিজেদের অবৈতনিক বিদ্যালয়েই পাঠাবেন। যদি কেউ সঙ্কল্প ভঙ্গ করেন তবে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হবে। সাধারণ মানুষের মন তখন খ্রীষ্টানীর উপর কতখানি বিরূপ হয়েছিল, সভা শেষে একজনের একটি উক্তিতে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি ছেলেদের উদ্দেশ্য করেই বলেন—"বাবা, তোমরা একেশ্বরবাদী হও, যা খুশি কর, যা খুশি খাও তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু দেখ তোমরা খ্রীষ্টান হয়ো না।" এই সভায় হিন্দু সোসাইটি নামে স্থাপিত হ'ল একটি স্থায়ী সংগঠন।

খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রতি সরকারের মনোভাব এই দশকে বিবিধ ব্যাপারে প্রসন্নই ছিল। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নানা ব্যপদেশে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকে লেখা এক পত্রে একথা বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করেন। পরবর্তী দশকের গোড়াতেই হিন্দুদের আর এক বিরাট সভা হ'ল খ্রীষ্টানীর উৎপাত এড়াবার জন্য ১৮৫১, ২৫ মে তারিখে। এবারেও সভায় পৌরোহিত্য করেন রাজা রাধাকান্ত দেব। শুধু নেতৃবৃন্দ নন, বহু বিখ্যাত পণ্ডিত এখানে উপস্থিত থেকে সভার কার্যে যোগদান করেন। সমস্যা এই যে, ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্ম পুনঃগ্রহণের ব্যবস্থা না থাকায় বিধর্মীরা হামেশা এ কার্যে প্রলুব্ধ হয়। এর সমাধানকল্পে কি উপায় গ্রহণ সম্ভব তাই ছিল সভার বিবেচ্য। সভাপতি রাধাকান্ত দেব

শাস্ত্রসম্মত বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, যুগে যুগে এ ব্যবস্থার সময়োচিত পরিবর্তন ঘটেছে। এ সময়েও এর পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। তাঁর মতে সামান্য মাত্র কড়ি বা অর্থ দিলেই প্রায়শ্চিত্ত হ'ল বলে গণ্য করা যেতে পারে। উপস্থিত পণ্ডিতগণও এতে সায় দিলেন। তখনকার দিনে এ ব্যাপারটিকেও উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে শ্রীরামপুর মিশন পরিচালিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' উল্লেখ করেন। এরই কথায় ঃ "constitute one of the most important events that has occurred in India in the present century".

মনে হয় এদিনকার সভারই অনুসরণে পরবর্তী 'পতিতোদ্ধার সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য—বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু যারা ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রে পতিত হয়েছে তাদের নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে স্ব স্ব শ্রেণীতে গ্রহণ করা চলবে। এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থাপত্রিকা প্রকাশিত হ'ল। সমাজের উপরে খ্রীষ্টানীর প্রচণ্ড আক্রমণ অতঃপর অনেকাংশে হ্রাস পায়। মানুষের মনে এই যে চেতনাবোধ জাগ্রত হ'ল তা অন্যান্য ব্যাপারেও অনুক্রামিত হতে বড় বিলম্ব হ'ল না। এই বিষয়েই এখন কিছু বলব। মনে হতে পারে, হিন্দুদের জন্যই তো এই সব করা হয়েছিল। এতে সমগ্র জাতির কি লাভ হয়েছিল? নব্যশিক্ষা পেয়ে হিন্দুরাই সে যুগে সর্বপ্রথম আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠেন এবং নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করতে শুরু করে দেন। নিজেদের উপরে যখন আঘাত এলো তখন তা প্রতিরোধে অগ্রসর না হলে যে আত্মশক্তির অবমাননা করা হত। এদিক থেকে পরোক্ষভাবে হলেও সমগ্র জাতি উপকৃত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

(৩)

কোন কোন রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক সভা সমিতির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে তত্ত্ববোধিনী সভা খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ভূম্যধিকারী সভার নাম গন্ধও তখন শোনা যেত না। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কিম্বা ভারতবর্ষীয় সভা বা সমাজের কার্যকলাপ তখন খুবই

সংকুচিত হয়ে পড়েছে। নব্য বঙ্গের নেতা রামগোপাল ঘোষ তখনও এর সভাপতি ছিলেন এবং সভাপতি রূপে কোন কোন বিষয়ের উপর স্বীয় স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে ভোলেন নি। এই রকম একটি ব্যাপারের কথা আমরা একটু পরেই জানতে পারব।

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তখন ভারত সরকারের ব্যবস্থা সচিব। শিক্ষা ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের কথা ইতিপূর্বে কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। তিনি শিক্ষা ব্যপদেশে নব্য বঙ্গের নেতা রামগোপাল ঘোষের সংস্রবে আসেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনা থেকেই দেখি রামগোপালের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করছেন। শীঘ্রই নব্যবঙ্গের অন্যতম প্রধান দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়। এ সব পরামর্শ ও আলাপ আলোচনার ফলশ্রুতি—বেথুন কর্তৃক ১৮৪৯ সনের ৭ই মে প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

বেথুন যে সত্যসত্যই ভারতহিতৈষী ছিলেন অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ হতে তা আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। বেথুনও ছিলেন মেকলের মত রাজনীতিতে উদার মতাবলম্বী। কিন্তু মেকলে যেমন ভারতবাসীর সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্বন্ধে এক রকম অজ্ঞতাবশতঃই কটুকাটব্য করেছিলেন বেথুন কিন্তু সেরূপ আদৌ করেন নি। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সতত শ্রদ্ধাশীল। কোন কোন বিষয়ে রক্ষণশীল নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটলেও অন্যবিধ হিতকর কার্য, যেমন, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতির জন্য রাধাকান্ত তাঁর প্রশস্তি করেছিলেন।

ভারত সরকারের আইন সচিবরূপে বেথুন ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবহার বৈষম্য বিদূরণে তৎপর হলেন। এরই ফল—মফস্বলের আইন আদালত প্রভৃতি সম্বন্ধে সরকার পক্ষে কয়েকটি খসড়া প্রস্তাব প্রচার। কিন্তু এ বিষয়ে বলার আগে আমাদের পূর্ব কথাও কিছু স্মরণ করা দরকার।

এ দেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাস সম্বন্ধে সব রকম বাধা নিষেধই ১৮৩৩ সনের সনন্দে নিরাকৃত হয় বলেছি। তারা ভারতবাসীর মতই ভূমি ক্রয় বিক্রয়েরও অধিকারী হলেন। নীল ব্যবসায় ব্যপদেশে বহু পূর্ব থেকেই

তারা মফস্বলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এখন সব রকম বাধা বিমুক্ত হয়ে তারা দেশের দূরদূরাঞ্চলে নীল চাষ ও নীলের ব্যবসায় এবং অন্যবিধ বাণিজ্যাদি করতে বেশী করে লেগে গেলেন। আগে যে এ দেশে বসবাসের পক্ষে প্রতিটি ইউরোপীয়কে লাইসেন্স বা অনুমতি পত্র নিতে হত, এবারকার সনন্দে তাও রদ করা হ'ল। মফস্বলের বিচার আদালত কিন্তু তাদের বিচারের অধিকারী ছিল না। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টই তাদের বিচারের একমাত্র অধিকারী রয়ে গেল। আগেই উল্লেখ করেছি পার্লামেণ্টে মেকলে সাহেব বলেছিলেন, লাইসেন্স প্রথার বিকল্প কোন নিয়ম না করা হলে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরা বা শ্বেতাঙ্গরা স্বেচ্ছামত বিচরণ ও ব্যবহার করতে থাকবেন। তখন কিন্তু সনন্দে কোন বিকল্প নির্ণীত হয় নি। ১৮৩৪ সনে কোম্পানির ডিরেক্টর সভা ভারত সরকারকে নির্দেশ দিলেন যে, মফস্বলবাসী ইউরোপীয় সাধারণকে মফস্বলের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। ভারতীয় জনসাধারণকে এইরূপেই ইউরোপীয়দের উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। বড়লাট পরিষদের প্রথম আইন সচিব মেকলে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবহারসাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি আইনের প্রস্তাব করেন। ভারতীয়দের মত মফস্বলের ইউরোপীয়েরাও মফস্বলের বিচার আদালতের অধীন হবে এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের ভার ওদের উপরই বর্তাবে। তখনই যে কলকাতায় এ নিয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল সে কথা পূর্বে বলেছি। এর ফলে মেকলে ডিরেক্টর সভার নির্দেশ আধাআধি মান্য করে মফস্বলের দেওয়ানী আদালতগুলির উপর মাত্র ইউরোপীয়দের বিচারের এক্তিয়ার সাব্যস্ত করলেন। এই আইনটি ১৮৩৬ সনের একাদশ আইন নামে পরিচিত। এতে কিন্তু তেমন কিছু সুরাহা হ'ল না। মফস্বলবাসী ইউরোপীয়েরা প্রকৃত প্রস্তাবে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টেরই অধীন রয়ে গেল। ফৌজদারী বিচার তো হতোই। দেওয়ানী মকদ্দমার ভার জেলা বা মহকুমার বিচারাদালতের উপর অর্পিত হ'ল বটে, কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার সীমিত না হওয়ায় ইউরোপীয়েরা অনেক সময় মফস্বলের দেওয়ানী আদালতে স্থানীয় অধিবাসীদের কর্তৃক মামলা রুজু হলেও কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে পাল্টা মামলা রুজু

করতেন। এভাবে দেখা গেল অনেক সময় সুপ্রীম কোর্টের রায় তাদের অনুকূল হওয়ায় মফস্বল আদালতগুলির বিচারকে একেবারে অগ্রাহ্য করা হত। এ আদালতগুলি এইরূপে নিষ্ক্রিয় বা অকেজো হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন: "কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে এবং সদর দেওয়ানী ও তদধীন যাবতীয় কোর্টে এক প্রকার পরস্পর বিদ্বেষভাব ছিল। মফস্বলে কোন আদালত যদি কোন নীলকর বা কোন সওদাগর সাহেবের প্রতি হস্তার্পণ করিতে যাইতেন, অমনি ঐ আদালতের বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ হইত; এবং ঐ নালিশের খরচার দায়ে বিচারপতি পীড়িত হইতেন। এই জন্য গভর্ণমেন্ট ঐ সময়ে এমত নিয়ম করেন যে, সুপ্রীম কোর্টের খরচার টাকা সরকার হইতেই দেওয়া হইবে। গভর্ণমেন্ট এইরূপ নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের সমক্ষে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে সে মোকদ্দমা আর কোম্পানির কোন আদালত গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা ও-রূপ কোন নিয়ম করেন নাই। যে মোকদ্দমা কোম্পানির আদালতে রুজু আছে তাহারা সে মোকদ্দমা আপনারা বিচার করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিতেন। এই সকল কারণে কোম্পানির আদালতগুলি বিলক্ষণ অবমানিত ও হীনবল হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইংরেজরা কোম্পানির আদালতের অধীন ছিলেন না এবং ঐ সকল আদালতের কোন তোয়াক্কাই করিতেন না। এক দেশের মধ্যে থাকিয়া কতকগুলি প্রজা এক আদালতের অধীনে এবং কতকগুলি তাহার অধীনে নয় এরূপ ব্যাপার সহজেই নিতান্ত বিসদৃশ। তাহাতে আবার অনেক ইংরেজ মফস্বলে থাকিয়া কৃষি বাণিজ্যাদি নির্বাহ করেন অথচ এ দেশীয়েরা যে আদালতের অধীনে সে আদালতকে মান্য করেন না, এরূপ করাতে যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা ঘটে।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ, পৃ. ৬১-৬২)।

এই বিশৃঙ্খলা চল্লিশের দশকের শেষ দিকে উৎকট আকার ধারণ করে। কয়েক বৎসর পূর্বেই ১৮৪৩ সনে এই বিশৃঙ্খলার কথা আঁচ করে সি. এইচ. ক্যামেরন প্রমুখ ল' কমিশনারগণ ভারত সরকারকে এই মর্মে খুব জোরের সঙ্গে লিখেছিলেন যে, শুধু কার্যের সুবিধার জন্যই নয়, প্রয়োজনের দিক দিয়েও

দেশের অভ্যন্তরভাগস্থ ইউরোপীয়দের মফস্বল আইন আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত করা নিঃসন্দেহে অত্যাবশ্যক। কারণগুলি তো ডিরেক্টর সভা আগেই উল্লেখ করেছেন। মফস্বলের আদালতগুলির ফৌজদারী বিচারের কোন এক্তিয়ার না থাকায় ইউরোপীয়েরা দেশের অভ্যন্তরে কলকাতা হতে শত শত মাইল দূরে এরূপ অনাচার অত্যাচারে প্রবৃত্ত হত যে সাধারণ লোকদের রক্ষার আর কোন উপায়ই রইল না। তাদের পক্ষে সুদূর কলকাতা শহরে গিয়ে শক্তিশালী ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে লড়া তখন ছিল কল্পনারও অতীত। ইউরোপীয়েরা তখন এর সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করতে ছাড়ে নি। তারা নীল চাষীদের উপর নানারকম উৎপীড়ন করতে অভ্যস্ত হ'ল বিনা বাধায়। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে এবং পরবর্তী দশকের প্রথমেই এ সম্বন্ধে দেশীয়দের মধ্যে বেশ কিছু আলোড়ন উপস্থিত হয়। পত্রিকা ও পুস্তকাদিতে এদিকে জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হতে থাকে।

সরকার আর নিরস্ত থাকতে পারলেন না। ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যে ব্যবহার সাম্য প্রতিষ্ঠা, প্রবল প্রতাপ ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং মফস্বলের সরকারী কর্মচারীদের ইউরোপীয়দের হাত থেকে রক্ষার নিমিত্তই প্রধানতঃ সরকার পক্ষে আইন সচিব বেথুন ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চারিটি আইনের খসড়া সাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করলেন। এ খসড়াগুলি ছিল নিম্নলিখিত মর্মে: প্রথম—মফস্বলের ফৌজদারী আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার প্রথা প্রবর্তন। দ্বিতীয়—ইউরোপীয় প্রজাবৃন্দের অধিকারের সীমা নির্দেশ। তৃতীয়—জুরী দ্বারা বিচার। এবং, চতুর্থ—সরকারী কর্মচারীদের সংরক্ষণ।

এতদিনে মফস্বলবাসী ইউরোপীয়েরা শুধু স্বৈরাচারীই হয়ে ওঠে নি, তারা নিজেদের মধ্যে জোট বেঁধেছিল। তখনও কলকাতায় তাদের পক্ষে সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত না হলেও তাদের সমর্থক বা মুখপাত্র সেখানে বিস্তর ছিল। ইউরোপীয় সম্পাদিত ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির অধিকাংশই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সোচ্চার। আইনের খসড়াগুলি প্রচার হওয়া মাত্রই যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল। মফস্বলের ইউরোপীয়েরা তখন "Free Briton" বা "স্বাধীন ব্রিটন" বলে ভাবতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে

অভ্যস্ত হয়েছে। তারা মফস্বলের আইন আদালতের তোয়াক্কা আদৌ করত না। এখন এ খসড়াগুলির মধ্যে 'স্বাধীন ব্রিটনরা' তাদের "স্বাধীনতা" হরণের গন্ধ পেল। কাজেই তারা কি আর চুপ করে থাকতে পারে! কলকাতার ইউরোপীয়েরা ও স্থানীয় ইংরেজী পত্রিকাগুলিও তাদের হয়ে বলতে ও লিখতে শুরু করল। ফলে ভারত সরকার খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন। এই রকম বিরোধিতার সামনে তারা এই আইনগুলি নিয়ে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করলেন না। প্রজাকুলের দুঃখ পূর্ববৎই রয়ে গেল।

(৪)

এ সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কিন্তু প্রস্তাবিত আইনগুলির সারবত্তা এবং যুক্তিযুক্ততা বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁরা একবাক্যে এর সমর্থনও করেন। কিন্তু তাঁদের প্রভাব তখন সরকারের উপর খুবই সামান্য। বরং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন কোন কারণে ইউরোপীয়দের উপরে তাঁদের বেশী করে নির্ভর করতে হত। সাহেব পাত্রীদের প্রশ্রয় দানের কথা তো আগেই বলেছি। তবে ভারতীয়েরা একেবারে নীরব ছিলেন না। তাঁদের মুখপাত্র স্বরূপ রামগোপাল ঘোষ এই খসড়া আইনগুলির সমর্থনে একখানি পুস্তিকা লিখলেন। 'স্বাধীন ব্রিটনেরা' ঐ আইনগুলিকে Black Acts বা কালো আইন নাম দিয়েছিল। রামগোপালের বইখানিরও নাম দেওয়া হ'ল ইউরোপীয়দের অনুকরণে ব্যঙ্গ করে Black Acts। মফস্বলে ইউরোপীয়দের কাজগুলি ছিল বাস্তবিক কালো বা কালিমাময়। পুস্তিকাখানির দ্বারা প্রস্তাবিত আইনগুলিই নয়, এদের কালো কাজগুলির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছিল। পুস্তিকার একস্থলে রামগোপাল এই মর্মে লিখলেন,—মফস্বলের আইন আদালত সমূহের অধীন না হওয়ার দরুন ইউরোপীয়েরা নিজেদের একরূপ নিরাপদ মনে করে থাকে। আমি নিজ অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি, তথাকার জনসাধারণের একরূপ ধারণা জন্মেছে যে নীলকরদের অত্যাচার উৎপীড়নের হাত থেকে তাদের উদ্ধার পাওয়ার আর উপায় নেই। দেখি,

রামগোপালের এই পুস্তিকা প্রকাশে দুই বিপরীত ফল ফলে। ভারতবাসীরা রামগোপালকে তাদের নেতৃপদে বসালেন। এমন করে স্বদেশের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার কথা পুস্তকাকারে ইতিপূর্বে আর কেউ প্রকাশ করেন নি। পূর্বেও তাঁর কথা আমরা কিছু কিছু জেনেছি। কিন্তু এবারে তিনি সাধারণ মানুষের মুখপাত্র হয়ে উঠলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরে যথার্থই বলেছেন ঃ "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙলাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।" হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে আমরা পরে অনেক কিছু জানতে পারব। নীল আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনাকালে নীলকরদের অত্যাচার এবং প্রজাবৃন্দের অসহায় অবস্থার কথা বিশেষ করে আলোচনা করা যাবে।

উক্ত পুস্তিকা প্রকাশে কি শহর কি মফস্বল সর্বত্র ইউরোপীয়েরা তো খেপিয়া আগুন। কলকাতাস্থ ইংরেজরা রামগোপালের উপর এ কারণ প্রতিশোধ নেওয়ারও ব্যবস্থা করলেন। আজিকার দিনে হয়তো কৌতুককর ঠেকবে, কিন্তু সত্যসত্যই তারা এরূপ করেছিল। কেরী প্রতিষ্ঠিত এগ্রি-কালচারাল এণ্ড হরটিকালচারাল সোসাইটির কার্যকলাপ ভারতের কৃষির উন্নতির পক্ষে খুবই সহায়ক হয়। এইরূপ একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামগোপাল ঘোষের স্বভাবতঃই সংযোগ ঘটে। কয়েক বৎসর পরে তিনি হন এর একজন সহকারী সভাপতি। এই সোসাইটির বাংলা নাম কৃষি সমাজ। সোসাইটির অধিকাংশ সদস্য ছিলেন ইউরোপীয়। উক্ত পুস্তিকা প্রকাশের পর এই ইউরোপীয় সদস্যগণ ভোটের জোরে রামগোপালকে সহকারী সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করলেন। কয়েক বৎসর পরে সুবিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাগ্যে অনুরূপ লাঞ্ছনা ঘটেছিল, অবশ্য সে অন্য একটি সভায়।

ইউরোপীয়দের এরূপ জোট বাঁধার ফল দেখে ভারতীয় নেতৃবৃন্দও সবিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে তাঁরা ভাবতে শুরু করে দিলেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে সরকার শুধু দৌর্বল্য দেখান নি, পর পর এমন কতকগুলি ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন যার প্রতিবাদ করতে তাঁরা বাধ্য হন। এইরূপ একটি বিষয় হ'ল দেশীয় খ্রীষ্টানদের পিতৃ সম্পত্তিতে অধিকার দান সম্বন্ধীয় আইন। খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আন্দোলনের

কথা ইতিপূর্বে বলেছি। আন্দোলন অনেকাংশে সার্থকও হয়। কিন্তু সরকার খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্ররোচনায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করে ফেললেন। ভারতীয়দের ওজর আপত্তি কিছুই টিকল না।

এদিকে আবার শীঘ্রই কোম্পানিকে প্রদত্ত সনন্দ পার্লামেণ্টে পুনর্বিবেচনা এবং পুনঃপ্রদানের কথা। কুড়ি বৎসর অন্তর এইরূপ সনন্দ নূতন করে দেওয়া হত। কোম্পানির বিলাতস্থ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে এ সময় পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাইরে খুবই বাদ প্রতিবাদ হত।

পার্লামেণ্ট সিলেক্ট কমিটি গঠন করতেন। এই কমিটির সম্মুখে বিলাতের ও এদেশের বহু তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রাজা রামমোহন রায় বিলাতে অবস্থানকালে ১৮৩১-৩২ সনে এই সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দানের জন্য আহূত হয়েছিলেন। তিনি সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত না হয়ে ভারত সংক্রান্ত নানা বিষয়ে লিখিত সাক্ষ্য পেশ করেছিলেন। এই সময়ে সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে এবং পার্লামেণ্ট সভায় প্রতিপক্ষীয়েরা কোম্পানির শাসকবৃন্দের অনাচার উৎপীড়ন ও অব্যবস্থার বিষয় তন্ন তন্ন করে আলোচনা করতেও ছাড়তেন না। গত দুই বৎসরের মধ্যে ভারতবাসীরা অনেকটা আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন। সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয়দের কাজকর্ম তাঁরা পরখ করে দেখতে লাগলেন। আসন্ন সনন্দ প্রদানকালে ভারতীয় নেতৃবৃন্দও এবার শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজ নিজ মতামত প্রকাশে এবং এর সংশোধন ও উন্নতির উপায় নির্দেশে তৎপর হলেন।

(৫)

দেখি ১৮৫১, সেপ্টেম্বর মাসে এজন্য একটি সভার আয়োজন হচ্ছে। পূর্বেকার দু'টি রাজনৈতিক সভাই সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৎসর কয়েক মাত্র কাজ করার পর একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, উঠে যায় বলাও চলে। এবারে কিন্তু এই সভার উদ্যোক্তারা বিনা আড়ম্বরেই মাত্র অল্প কয়েকজনকে নিয়ে তা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর (১৮৫১), কলকাতাস্থিত পাইকপাড়ার

প্রতাপচন্দ্র সিংহের বাসভবনে এই উদ্দেশ্যে প্রায় ৫০ জন প্রতিপত্তিশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সমবেত হন। এদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপচন্দ্র বাদে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীকুমার রায় প্রভৃতি। তাঁরা সভার নাম দেন স্থাশনাল এসোসিয়েশন। সম্ভ পুনরুজ্জীবিত 'সমাচার দর্পণে' এর বাঙলা নাম পাই 'দেশ হিতার্থী সভা'। সভা প্রতিষ্ঠার সংবাদে 'বেঙ্গল হরকরা' পরবর্তী ১৮ সেপ্টেম্বর এই মর্মে লিখলেন: "প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন কোন কাজের সঙ্গে তাঁদের নাম যুক্ত হতে দেবেন না যাতে তাঁরা সিদ্ধিলাভ করার আশা পোষণ করেন না...এবারে এর প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্বাধীনচেতা মান্যগণ্য লোকই আমরা পেয়েছি।"

এই সভায় এমন কতকগুলি প্রস্তাব হেতুবাদ সহ ধার্য হ'ল যা থেকে আমরা এর উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পারি। এগুলির মর্ম এখানে দেওয়া হ'ল।—যেহেতু দেখা গেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় কতকগুলি আইন এই সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের স্থায়সঙ্গত অধিকার ও সম্পত্তির মালিকানার প্রতিকূলে বিধিবদ্ধ হয় এবং যেহেতু দেশ শাসনের রীতি পদ্ধতি বিষয়ক সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেওয়ানী বিচার আদালতের কোন কোন বিচারকের কার্যকলাপের দরুন সাম্রাজ্য প্রশাসনের ক্ষেত্রে সমস্ত আশা ভরসা প্রতিহত হচ্ছে, সে কারণ স্থির হ'ল যে, সেই সব উপায়, যা এ দেশবাসীর হিতসাধন করতে সক্ষম, অবলম্বনের জন্য স্থাশনাল এসোসিয়েশন নামে একটি সভা গঠিত হোক। এদেশের অধিবাসীদের জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে এই সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করা হোক। যাতে এই সভার মাধ্যমে আইনানুগ উপায়ে আমাদের বিধিসম্মত অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হতে পারা যায় সেজন্য আরও স্থির হ'ল যে, প্রয়োজনবোধে স্থানীয় সরকার অথবা বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কোন বিধি সংশোধন বা সংস্কারের আবেদন করা হোক।

স্থির হ'ল যে সভার অভিমত কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে নিয়মিত চাঁদার দ্বারা একটি ধনভাণ্ডার বা তহবিল গঠন করা হোক। এই তহবিল দিয়ে স্থানীয় আপিস এবং এই সভার পক্ষে কাজ করার উদ্দেশ্যে বিলাতে একজন

এজেন্টের খরচ খরচা নির্বাহ হবে। এই এজেন্ট সভার পক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

—এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা আমাদের দেয় চাঁদা তিন বছরের জন্য দিতে স্বীকৃত হলাম। এ সময়ে সভার পক্ষে বিস্তর গুরুত্বপূর্ণ কার্য সমাধা করতে হবে, কেননা আশা করা যাচ্ছে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ তখন নূতন করে দেওয়া হবে। পার্লামেণ্টে যখন সনন্দ সম্পর্কে আলোচনা চলবে সেই সময় আমাদের অভাব অভিযোগ পেশ করার জন্যই এই এজেণ্ট নিয়োগ করা আবশ্যক। আমাদের যা কিছু উপায় এবং সাধ্য তার বিনিয়োগ দ্বারা আমরা এই সভা কর্তৃক উদ্দিষ্ট বিষয়াদি নিষ্পন্ন করার জন্য প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।

সভার কার্য যে অবিলম্বে শুরু হয় নানা সূত্র থেকে আমরা তার প্রমাণ পাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভার সম্পাদক হলেন। সভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 'হরকরা' আরম্ভেই যে কথা বলেছিলেন তা আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। দেবেন্দ্রনাথ কর্মদক্ষ মানুষ। তাঁর নেতৃত্বে এক যুগের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা ধর্ম সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই দেবেন্দ্রনাথ যখন ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের সম্পাদক তখন এর সাফল্য সম্বন্ধে কারো সন্দেহের অবকাশ রইল না। ১৮৫১, ২৩ অক্টোবর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায়' একটি সংবাদ বের হ'ল। এটি বাঙলা কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয়, পরে 'বেঙ্গল হরকরা' এর অনুবাদ প্রচার করেন। এতে পাই যে, সভার সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর অধীনে একদল কর্মী নিযুক্ত হয়েছেন যার শীর্ষে ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাব্রতী উইলিয়ম কারপেণ্ট্রিক। অল্পদিনের মধ্যেই এ সভা ঐ একই উদ্দেশ্যে ব্যাপকতর আকারে আর একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এরও পুরোভাগে ছিলেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ। এই কথাই এখন বলি।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা : প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম

ন্যাশনাল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার মাত্র দেড় মাসের মাথায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হয়। মধ্যবর্তী এই দেড় মাসকাল ছিল খুবই কর্মতৎপরতার সময়। কারণ এই সময়ের মধ্যে ভাবী সভার উপযোগী নিয়মাবলী সমেত উদ্দেশ্যপত্র রচিত হয়। সভার প্রথম অধিবেশনেই এগুলি গৃহীত হ'ল। প্রথম অধিবেশনের তারিখ ১৮৫১, ২৯শে অক্টোবর। এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার পূর্বে আরও দুই একটি কথা বলি।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে সব সময় বাঙলায় ভারতবর্ষীয় সভা নামে আখ্যাত করা হয়েছে, আমরাও এই নামটি গ্রহণ করব। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে তাঁর ইতিহাস পুস্তকে ভারতবর্ষীয় সভা বা সমাজ নাম দিয়েছিলেন। যখন আলোচ্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পূর্বেকার প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বও এক রকম ছিল না। ভূদেব প্রদত্ত ঐ নামটিই পরবর্তীয়েরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি বুঝাতে ব্যবহার করতেন। কর্মকর্তারা ন্যাশনাল এসোসিয়েশন নামটিও পরিত্যাগ করেন বর্তমান নামের অনুকূলে। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন শেষোক্ত নাম দ্বারাই সভার বাস্তবরূপ স্পষ্টতর হবে। ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের বাঙলা নামটি—দেশ হিতার্থী সভারও আর ব্যবহার দেখি না। ভারতবর্ষীয় সভার মধ্যেই ব্যাপকতা হয়ত অধিকতর স্পষ্টীকৃত অনুভব করা হয়েছিল। তখন ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিষয়াদি নিয়েই এই সভার আবির্ভাব। ঐ সময়ই ভারতবর্ষে দুই রকম শাসন দেখি। একরকম, ব্রিটিশের সাক্ষাৎ অধিকারভুক্ত অঞ্চল; দ্বিতীয়, ব্রিটিশের প্রভাবাধীন করদ বা মিত্র রাজ্যসমূহ। তখনই প্রকাশ্যতঃ শাসন ব্যাপারে ভারতবর্ষ যেন দুটি স্বতন্ত্র অংশে পরিণত! যে অংশে ব্রিটিশের শাসন প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত,

নেতৃবৃন্দ ভেবেছিলেন সেই অংশ সম্বন্ধেই আমাদের আলাপ আলোচনা আন্দোলনের যথার্থ অধিকার। যতদূর মনে হয় এই কারণেই তাঁরা সভার ঐ রকম ইংরেজী নামকরণ করেছিলেন। অবশ্য বাঙলা নামটি থেকে কিন্তু এই বিশিষ্টতা আমাদের বোধগম্য হয় না। তথাপি এক হিসাবে এ নামটির সার্থকতাও আমাদের স্বীকার করা প্রয়োজন। অতঃপর আমরা এই পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেও ভারতবর্ষীয় সভা নামটি আমাদের আলোচনায় ব্যবহার করব।

আগেকার ভূম্যধিকারী সভা এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তী বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির কার্যকলাপ তখন বন্ধ হয়ে গেছে। দেখা যায় জাতীয় আশু প্রয়োজনে এ দুটি সভার নেতৃবৃন্দই প্রস্তাবিত সভায় এসে মিলিত হয়েছেন। রক্ষণশীল এবং প্রগতিপন্থী উভয় দলের নেতৃবৃন্দই এখানে সমবেত। এ দিক দিয়ে কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের চেয়ে এই সভা ব্যাপকতর। সভার প্রথম দিনের অধিবেশনেই, ২৯শে অক্টোবর ১৮৫১ তারিখে পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্য সম্বলিত নিয়মপত্র গৃহীত হ'ল। এগুলি ছিল সর্বসাকুল্যে ৪৭টি। দেখা যায় আগেকার এসোসিয়েশনের অধিবেশনে যে মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছিল এখানে তাই পুরাপুরি অনুসৃত হয়। চারিটি নিয়মে সভার উদ্দেশ্য প্রথমে নির্ণীত হ'ল। এগুলি ছিল এই মর্মে :

ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের সাধারণ স্বার্থরক্ষাকল্পে এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর অবস্থার উন্নতি বিধানার্থে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে সরকারী প্রশাসনের দক্ষতা ও উন্নতি সাধনে সভা সচেষ্ট হবে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ সম্পর্কে শীঘ্রই পার্লামেন্টে সলা পরামর্শ চলবে। এই সময় প্রচলিত আইন কানুন ও প্রশাসনের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা এবং স্বদেশবাসীর কল্যাণ সাধন ও স্বার্থ রক্ষার জন্য আবেদন করা হবে। সভা এটিকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে গ্রহণ করলেন।

সভার মতে যে সব ক্ষতিকর আইন কানুন বিধিবদ্ধ হয়েছে বা হতে পারে সে সব রদ করা এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে হিতকর বিধি বিধান প্রবর্তনের জন্য বিলাতের পার্লামেন্টে ও এ দেশের সরকারের নিকট যথাসময়ে আবেদন পত্র সভা পেশ করবে।

সভা বিশেষ কারণে, মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে নিগৃহীত মানুষের সাহায্যার্থে সকল শক্তি প্রয়োগ করবে—যাতে করে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব হয়।

লক্ষণীয় যে পূর্ব পূর্ববারের ন্যায় এবারেও ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সম্পর্ক যে অচ্ছেদ্য তার বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে। তখনকার দিনে ব্রিটেন ব্যতীত এককভাবে ভারতবর্ষের উন্নতি চিন্তা বা স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা যেন একরূপ অসম্ভবই ছিল। উভয়ের কল্যাণ পরস্পরের সহযোগিতা সাপেক্ষ। তবে ভারতবর্ষের কল্যাণ কোন রকমে ব্যাহত হয় এরূপটিও তাঁরা চান নি। উভয়ের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় অবহিত হওয়াই নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য ছিল। ভারতবর্ষীয় সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে এ সব কথা পরিব্যক্ত।

বলা বাহুল্য নিয়মাবলী এরূপভাবে রচিত হয় যার ফলে সভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। এগুলিতে সভ্য গ্রহণ, পরিচালনার রীতি পদ্ধতি, আর্থিক সংস্থান প্রভৃতির বিষয় স্পষ্ট করে উল্লিখিত হয়। ধার্য হ'ল প্রত্যেক সভ্যকেই বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। এই চাঁদার পরিমাণ কমিয়ে পাঁচ টাকা করার সপক্ষে বিশ বৎসর পরে বেশ একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু সভা কর্তৃপক্ষ তখনও তাতে কর্ণপাত করেন নি। প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তি-প্রধানদের নিয়ে কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হ'ল। পূর্বেই বলেছি এই সভায় রক্ষণশীল, প্রগতিপন্থী উভয়েই এসে স্বদেশের কল্যাণ সাধনকল্পে মিলিত হন। সভ্যবৃন্দ হলেন যথাক্রমে (রাজা) প্রতাপচন্দ্র সিংহ, (রাজা) সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ দত্ত, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, আশুতোষ দেব, রামগোপাল ঘোষ। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক হন যথাক্রমে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা)।

এই অধিবেশনে কিন্তু সভাপতি ও সহকারী সভাপতি স্থিরীকৃত হয় নাই। আমরা দেখি, সভার পক্ষে সম্পাদকের লিখিত অনুরোধে রাজা রাধাকান্ত দেব কিছু পরে এর স্থায়ী সভাপতি হয়েছেন। আ-মৃত্যু (১৮৬৭) তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সহকারী সভাপতি হন রাজা কালীকৃষ্ণ। রাধাকান্ত দেব সভা সম্পর্কে সম্পাদকের পত্র পাঠে সব বিষয় অবগত হয়ে খুবই আনন্দ

প্রকাশ করেন এবং সাগ্রহে সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মতি জানান। এই উপলক্ষে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে পর পর তিনখানি মূল্যবান চিঠি লেখেন। এই চিঠিগুলিতে সভার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর কতই না আকুতি লক্ষ্য করি! প্রথম চিঠিখানিতে রাধাকান্ত এই মর্মে লিখলেন যে, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথের ৩১শে অক্টোবর এবং ৬ই নভেম্বরের দু খানি চিঠিই পর পর পেয়েছেন। তিনি স্বদেশের কল্যাণকল্পে এমন একটি প্রশংসনীয় সভার সভাপতির পদ গ্রহণের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে কোন ক্রমেই পারেন না। তাই বৃদ্ধ বয়সে সক্রিয়ভাবে যোগদানে অসমর্থ হলেও তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে সম্মতি জানাচ্ছেন। তিনি আরও লেখেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বদেশের অভাব অভিযোগ পেশ করার জন্য সুসংবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বহুদিন থেকেই অনুভূত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কোম্পানির সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তির মুহূর্তে এই রকম একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। কাজেকাজেই সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি রাধাকান্ত আন্তরিক সম্মতি জানান।

এতদিন পর্যন্ত এরূপ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ার সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। রাধাকান্তের আশা ও বিশ্বাস বর্তমান সভা এরূপ সুষ্ঠু রীতিপদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হবে যার ফলে এর স্থায়িত্ব ও কর্মকুশলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সভাপতি রাধাকান্ত সভার করণীয় বিশ্লেষণ করে সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন। দ্বিতীয় পত্রখানি লেখেন ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৫১ তারিখে। এ পত্রখানিতে তিনি সভাকে কতকগুলি বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি লিখলেন যে তখনকার সনন্দ (১৮৩৩) অনুযায়ী কি কি কাজ হয়েছে, কতটাই বা বাকি, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া কিরূপ —ভারতবাসীর পক্ষে এর দোষত্রুটি কতটা অহিতকারী—এ সকল বিচার বিশ্লেষণ করে আসন্ন সনন্দে কিরূপ সংশোধন ও সংস্কার করা যায়, ভারতশাসন কার্যে বিলাতের ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন বিষয়ের দোষত্রুটি স্খালন করে কিরূপে একে জনহিতকর করে তোলা যায় এই সকল উদ্দেশ্য সম্বলিত একখানি আবেদনপত্র অবিলম্বে রচনা করে পার্লামেন্টে পেশ করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ

ভারতসভার পক্ষে বিলাতে এমন একজন এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে যিনি হবেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তথ্যাভিজ্ঞ এবং সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এঁকে উন্নত এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের লোক হতে হবে, যাতে করে তাঁর কথা তথাকার অধিবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণিধান করেন। রাধাকান্তের এই সময়োপযোগী পত্রখানি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সভার কর্তৃপক্ষের কার্যের পথ-নির্দেশক হয়েছিল। এ দু'টি বিষয়েই সভা কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু এ কথা বলার পূর্বে আর একটি বিষয়ের এখানে অবতারণা করি।

সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫১, ১১ই ডিসেম্বর সভার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও আগ্রার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে একখানি পত্র লেখেন। আমাদের জাতীয়তার দিক থেকে এ পত্রখানি শুধু সময়োপযোগী নয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ পত্রে এই মর্মে লিখলেন যে, কোম্পানিকে নূতন করে সনন্দ প্রদান আসন্ন, এ কারণ বিলাতে পার্লামেন্টের নিকট ভারতবাসীর পক্ষে শাসন ব্যবস্থা ও এর সংস্কার সম্বন্ধে একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চল সমূহে প্রশাসনিক অবস্থা একই প্রকারের। সাধারণ ভারতবাসীরাও একই প্রকার শাসন দ্বারা পরিচালিত, ভালমন্দ সকল ব্যাপারেরই তারা সমান ফলভোগী। এ কারণ তাদের পক্ষে সম্মিলিতভাবে একখানি আবেদনপত্র পার্লামেন্টে পেশ করলে সমুদয় ভারতবাসীর স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন তা স্পষ্টই প্রমাণিত হবে। এর দ্বারা তাদের অভিন্নতা এবং ঐকমত্যও বিলাতের কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বুঝতে পারবেন। আরও একটি কারণে ঐকমত্যসূচক এইরূপ একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ আমাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। বিলাতে সকলের হয়ে একজন মাত্র এজেণ্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করলেই চলবে। এতে শুধু আমাদের ভিতরকার ঐক্য ও অভিন্নতাই কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করবেন না, তদুপরি একজন মাত্র এজেণ্ট থাকলে আমাদের তরফে খরচ খরচার দিক থেকেও অত্যন্ত সাশ্রয় হবে। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু উক্ত পত্রে একটি বিকল্প ব্যবস্থার কথাও পাড়লেন। এর কারণও ছিল। এ সম্বন্ধে আগে দু চার কথা বলি।

পূর্বেই বলেছি ১৮৩৩-এর সনন্দে সমগ্র ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতকে কলকাতায়

বড়লাটের সাক্ষাৎ শাসনাধীনে আনা হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে বোম্বাই ও মাদ্রাজের স্বাধীন সত্তা আর রইল না। কিন্তু ঐ ঐ স্থলে কর্তৃপক্ষের মধ্যেই শুধু নয়, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যেও বহুকালপুষ্ট স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। স্থানীয় সরকারগুলিকে সাক্ষাৎভাবে কলকাতাস্থ কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনা হ'ল বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভিতরকার স্বাতন্ত্র্য-বোধ বহুকাল পরেও অবলুপ্ত হয় নি। স্বাতন্ত্র্য-বোধের পরিবর্তে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে তাদের বেশ সময় লেগেছিল। ১৮৩৩-এর পর কুড়ি বৎসর পরেও যে আগেকার বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বলবৎ ছিল দেবেন্দ্রনাথের পত্রের প্রতিক্রিয়া থেকে তা বেশ বুঝা যায়। দেবেন্দ্রনাথ হয়তো তাদের এই মনোভাব বুঝে উক্ত ঐতিহাসিক পত্রে একটি বিকল্প ব্যবস্থার কথাও লিখেছিলেন। তিনি বলেন, যদি কলকাতার মূল সভার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আবেদনপত্র প্রেরণে অরাজি থাকেন তা হলেও তাঁরা যেন প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে পার্লামেণ্টে অবশ্যই আবেদনপত্র পাঠান। আর এ উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অঞ্চলে সভা সমিতি স্থাপন করেন। দেখি বিকল্প ব্যবস্থার প্রতিই বোম্বাই ও মাদ্রাজের অধিবাসীদের অধিকতর আকর্ষণ। ১৮৫২ সনের প্রথম দিকেই পুণা ও বোম্বাইয়ে দুইটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। পুণায় বিষ্ণু মোরেশ্বর বিনায়ক এইরূপ একটি সভা স্থাপনের সঙ্কল্পের কথা ভারতবর্ষীয় সভাকে জানান। এপ্রিল ১৮৫২ নাগাদ পুণায় ডেকান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বোম্বাই এসোসিয়েশনের পুরোভাগে ছিলেন নৌরজী ফুরদুঞ্জী ও দাদাভাই নৌরজী। মাদ্রাজে এই সময় আর একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল দেখা যায়। সকলই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষীয় সভার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলীর নিরিখে, এরই আদর্শে।

সভাপতি রাধাকান্ত নির্দেশিত আবেদন-পত্র রচনার দিকে সভা কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে আত্মনিয়োগ করলেন। এই আবেদনপত্রখানি আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টার দিক থেকে দিগ্‌দর্শন হয়ে আছে। ১৮৫৩, এপ্রিল নাগাদ আবেদন-পত্রের খসড়া প্রস্তুত হয়। এ খসড়া তৈরির ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় সভার বিখ্যাত সভ্যগণ অনেকে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ বাদে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল এবং সহসম্পাদক দিগম্বর মিত্রের নাম কেহ কেহ উল্লেখ করেছেন। এর রচনায় আরও যে কারো কারো হাত ছিল

তা বলাও সমীচীন। রামগোপাল সান্যাল 'বেঙ্গল সেলিব্রেটিস' গ্রন্থে একমাত্র হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে এ খসড়া তৈরির কৃতিত্ব অর্পণ করেছেন। ৮ই মে, ১৮৫২ তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা' এই খসড়াখানি সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য করলেন। হরকরা বলেন ঐ সময়ের পূর্বেই খসড়া রচিত হয়ে সভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-বর্গের সংশোধন সংযোজনান্তর অনুমোদনের জন্য প্রচারিত হয়। এখানি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে কথা হরকরা তখনই উল্লেখ করেন। এর থেকে আর একটি নূতন কথা জানা যায়। 'এ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ছদ্মনামে এক ব্যক্তি প্রচলিত সনন্দের ভারতীয়দের অনুকূলে কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন তা আলোচনা করেছিলেন একখানি পুস্তিকায়। মোটামুটিভাবে এই পুস্তিকা অনুসরণেই আলোচ্য খসড়া রচিত। এই ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কে তা অবশ্য জানা যায় নি। রামগোপাল সান্যালের উক্তি থেকে এটা মনে করা যেতে পারে যে, এই ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হওয়াও বিচিত্র নয়।

ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষীয় সভা জে. জে. গর্ডন নামক জনৈক খ্যাতনামা কর্ম-কুশল ব্যক্তিকে বিলাতে এজেণ্ট বা উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। আবেদনপত্র-খানি চূড়ান্ত রূপ দিতে বেশ সময় লেগে যায়। তবে সভা কর্তৃপক্ষ বিলম্ব না করে ১৮৫২ সালের ৮ই আগস্ট হিন্দুস্থান জাহাজ যোগে বিলাতে গর্ডনের নিকট আগাম এখানি পাঠিয়ে দিলেন। প্রাপ্তিমাত্র গর্ডন পার্লামেণ্টের বিশিষ্ট সদস্যগণ, পার্লামেণ্ট নিযুক্ত কমিটিগুলি এবং ভারতহিতৈষী বন্ধুবর্গের নিকট এখানি পেশ করবার ব্যবস্থা করলেন। এর অব্যবহিত পরে তিনি পরলোকগমন করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন বি. ম্যাকফারসন। তিনিও গর্ডনের মত আন্তরিকভাবে সভার পক্ষে কাজ করতে থাকেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ সভা সমিতির পক্ষে পার্লামেণ্টে আবেদন প্রেরণে তৎপর হলেন। তাঁদের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় সভা আবেদনলিপির খসড়া ঐ সব স্থলেও পাঠালেন। এরই ভিত্তিতে তাঁদের আবেদনপত্রও মূলতঃ রচিত হ'ল, যদিও স্থানীয় সমস্যাদি তাতে খানিকটা প্রাধান্য লাভ করে। আমরা দেখছি ১৮৫২ সেপ্টেম্বর নাগাদ উভয় প্রদেশের নেতৃবৃন্দ পার্লামেণ্টে স্বতন্ত্রভাবে আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। ভারতবর্ষীয় সভার আবেদনপত্রখানির চূড়ান্ত রূপ পেতে বেশ বিলম্ব হয়। সভার সভাপতি, সম্পাদক, সভ্যবৃন্দ এবং বহু সহস্র অধিবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত

হয়ে এখানি বিলাতে পৌছায় পর বৎসর ১৮৫৩, ১৯শে এপ্রিল তারিখে। তবে আগের প্রেরিত আবেদনপত্রেই কাজ হয়েছিল অনেক। জাতীয় সংগঠনে, তথা জাতির সর্ববিধ উন্নতিকল্পে, শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক, এই ভাবনার দ্বারা প্রাণদিত হয়েই ভারতবর্ষীয় সভা আবেদন পত্রখানি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ কারণ এই আবেদনপত্র আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার দিকের একখানি প্রকৃষ্ট দলিল।

আবেদন পত্রখানির বিষয়গুলি সম্বন্ধেও সুতরাং আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। একটি মৌলিক বিষয়ের কথাই প্রথমেই আবেদনে উল্লিখিত হ'ল। এতদিন ভারতবর্ষের শাসক ও ব্যবস্থাপক বা আইন প্রণেতা ছিলেন স-কৌন্সিল বড়লাট। সভা আবেদনপত্রে এর অপকারিতা সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করেন। তাঁরা প্রস্তাব করেন শাসন পরিষদ এবং আইন সভা সম্পূর্ণ আলাদা হবে। শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় আইন প্রণয়নের ভার থাকবে আইন সভার উপর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপরাপর ক্রাউন কলোনির মত এখানেও আইন সভাকে প্রতিনিধিমূলক করা দরকার। সভা প্রস্তাব করেন, মোট সতেরো জন সদস্য নিয়ে আইন সভা বা আইন পরিষদ গঠিত হবে। এই সদস্যদের নয় জন হবেন ভারতীয়। বাঙলা, বোম্বাই, ও মাদ্রাজ প্রত্যেকটি প্রদেশ থেকে তিন জন করে সদস্য গ্রহণ করতে হবে। বড়লাট প্রথমে মনোনয়ন এবং পরে নির্বাচনের উপায় নির্ধারণ করে সদস্য গ্রহণ করবেন। আইন সভায় গৃহীত কোন বিধি সম্পর্কে বড়লাটের সম্মতি পেলেই তবে তা আইনে পরিণত হবে। শতবর্ষ পূর্বে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ভারতবর্ষীয় সভার কর্তৃপক্ষ কিরূপ গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন এই প্রস্তাব থেকে তা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।

এই বিখ্যাত আবেদনপত্রখানিতে আলোচিত আরও বহু সাময়িক ও স্থায়ী প্রয়োজনের কথা আমাদের প্রত্যেকেরই জেনে রাখতে হবে। কারণ অর্ধশতাব্দী বা ততোধিক সময়েরও স্বদেশের রাষ্ট্রীয় এবং অন্যবিধ কল্যাণ প্রচেষ্টার সূত্র এর মধ্যে নিহিত দেখতে পাই। শাসন সংস্কার বিষয়ক অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে কোম্পানির সনন্দের মেয়াদ কুড়ি বৎসর হতে অন্তত দশ বৎসরে কমানো, বিলাতের বোর্ড অব কন্ট্রোলের বিলুপ্তি, কোম্পানির ডিরেক্টর সভার

সম্প্রসারণ, বাংলা দেশকে বড়লাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না রেখে একজন লেঃ গভর্ণরের শাসনাধীন করা, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, উচ্চতম কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করে নিম্নতম কর্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধি, বিচার বিভাগের সংস্কার, সুপ্রীম কোর্ট ও সদর আদালতগুলি একীভূত করে হাই-কোর্ট গঠন, সমাজস্থিতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনবিধি প্রণয়ন, লবণ ও অহিফেনের একচেটিয়া ব্যবসার বিলোপসাধন, শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে ব্যাপক ব্যবস্থা—এই বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আবেদনপত্রের বাঙলা ও উর্দু অনুবাদ সভা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।

ভারতবর্ষীয় সভা গণস্বাক্ষর যুক্ত আবেদনপত্র প্রেরণের ভেতরেই তাঁদের উদ্যোগ সীমিত রাখেন নি। তাঁরা অবিলম্বে লোকমত গঠনকল্পেও সাধারণ সভা সমিতির আয়োজন করলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৩, ২৯শে জুলাই কলকাতা টাউন হলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ল। এই বৎসরের গোড়ার দিকে ভারতহিতৈষী কয়েকজন পার্লামেণ্ট-সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তি মিলে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটি স্থাপন করেন। এরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন সনন্দকে যথোপযুক্তভাবে ভারতবাসীর অনুকূল করে তোলা। একে শুধু অভিনন্দন জানিয়েই ভারতবর্ষীয় সভা নিরস্ত হলেন না, প্রচারকার্য পরিচালনার নিমিত্ত অর্থ সাহায্যও মঞ্জুর করলেন। অধিকতর অর্থ সাহায্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে সভা কলকাতায় ২৬শে জুন ১৮৫৩ তারিখে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে একটি জনসভাও আহ্বান করেন। লণ্ডনস্থ সভার সভাপতি পার্লামেণ্ট সদস্য ডান্‌বি সিমুর এই বৎসরের প্রথমে স্বচক্ষে ভারতবর্ষের অবস্থা দেখবার জন্য ভারত পর্যটন করেছিলেন। পার্লামেণ্ট-নিযুক্ত কমিটিগুলিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সব সদস্য সাক্ষ্য দেন তাঁরা সকলেই শ্বেতাঙ্গ। ভারতহিতৈষী ইংরেজগণ সাক্ষ্যদানকালে ভারতবর্ষীয় সভার আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ও যুক্তির উপর বেশী করে নির্ভর করেন। ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষ প্যারীচাঁদ মিত্র ভারতবর্ষের পক্ষাপক্ষ সকল সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্তসার মন্তব্যসহ ইংরেজীতে একখানি পুস্তক লিখলেন—*Notes on the Evidence on Indian Affairs*।

৩১শে জুলাই ১৮৫৩ উভয় পার্লামেণ্টে নূতন সনন্দ পাস হয়ে পরবর্তী ২৭ আগস্ট রাজকীয় সম্মতি লাভ করে এবং যথাবিধি আইনে পরিণত হয়।

নূতন সনন্দ আইন এদেশে পৌছিলে ভারতবর্ষীয় সভা তাঁদের আবেদন পত্রের নিরিখে একে যাচাই করে নিতে কালবিলম্ব করলেন না। তাঁদের প্রস্তাবগুলি কোনটি অংশতঃ এবং কোনওটি সম্পূর্ণ গৃহীত হয়। আবার কোন কোন বিষয়ে তাদের প্রস্তাব আদৌ টেকে নাই। বড়লাটের শাসন পরিষদ থেকে আইন সভা পৃথক করা হ'ল বটে, কিন্তু এতে একজনও ভারতীয় গ্রহণের ব্যবস্থা হ'ল না। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সনন্দ আইন চালু হবার পর বড়লাটের বিবেচনার উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। বোর্ড অব কনট্রোল (পরবর্তীকালের ইণ্ডিয়া কৌন্সিল) উঠে গেল না বটে, তবে ডিরেক্টর সভার খানিকটা সংস্কারের ব্যবস্থা হ'ল। বাঙলাদেশ একজন স্বতন্ত্র শাসন কর্তার অধীনে আনবার প্রস্তাবও পুরাপুরি গৃহীত হয়। সভা সনন্দ আইনের একটি বিষয়ের উল্লেখ করে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। এতে স্থির হয় যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন সময় নির্দিষ্ট না করে প্রয়োজন হলেই যে কোন সময়ই কোম্পানির সনন্দ পুনঃপ্রদান সম্বন্ধে বিবেচনা করতে পারবেন। একটু আগেই বলেছি সভার মূল প্রস্তাব ছিল, কোম্পানির সনন্দ-প্রাপ্তির কাল কুড়ি বৎসর থেকে কমিয়ে দশ বৎসর করা। এর পর প্রতি বৎসর ভারত শাসন সম্পর্কে পার্লামেণ্টে আলোচনা হতে শুরু হয়।

পৃথকীকৃত আইন সভা বা পরিষদ মোট এই বারো জন সদস্য নিয়ে গঠনের কথা হ'ল—সপরিষদ বড়লাটকে নিয়ে পাঁচ জন (এর মধ্যে জঙ্গীলাট একজন), বাঙলার লেঃ গভর্ণর, বাঙলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও আগ্রা থেকে একজন করে সিবিলিয়ন (অন্যূন দশ বৎসরকাল কার্যে লিপ্ত) এবং কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অপর একজন বিচারপতি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কিছুকাল পরে ভারতবর্ষীয় সভা পুনরায় আন্দোলন করতে শুরু করে দেন। ভারতীয় সিবিল সার্বিসের দ্বার এতদিন সাধারণের নিকট এক রকম রুদ্ধ ছিল। কোম্পানির ডিরেক্টরদের সুপারিশেই সিবিলিয়ান কর্মচারীগণ বিলাত থেকে নিযুক্ত হয়ে আসতেন। নূতন সনন্দে এর দ্বার সাধারণের নিকট উন্মুক্ত হ'ল বটে, কিন্তু এ কার্যকর করার কে

রকম ব্যবস্থা হয় তাতে শুধু ইংরেজ সন্তানদেরই সুবিধা হ'ল। ভারতবাসীরা পূর্বের ন্যায়ই বঞ্চিত রয়ে গেলেন। ভারতবর্ষীয় সভা এতাদৃশ ব্যবস্থায় বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন, আর এ বিষয়ে আন্দোলন করতেও তারা অবিলম্বে অগ্রসর হন। দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে শাসনে আত্ম-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সকল আন্দোলন পরিচালনায় মনঃসংযোগ করেন, এই সময়ে ভারতবর্ষীয় সভার কার্যের মধ্যেই তার বীজ উপ্ত হয়েছিল।

নূতন সনন্দের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতবর্ষীয় আইন সভা নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নিয়ে ১৮৫৪, ১ মে তারিখে কার্য আরম্ভ করেন। আইন সভার সকল সদস্যই শ্বেতাঙ্গ, ভারতীয় একজনও ছিলেন না। এই কারণেই বোধ হয় নূতন নূতন বিধি প্রণয়নকল্পে আইন সভাকে সাহায্যের জন্য দুটি পদ সৃষ্ট হয়। একটি ক্লার্ক এবং অপরটি ক্লার্ক এসিস্ট্যাণ্ট। ক্লার্ক হলেন সুপ্রিম কোর্টের এক্টিং মাস্টার মিঃ মরগেন। দ্বিতীয় পদে প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিযুক্ত হন। আইন প্রণয়ন কালে দেশীয় রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রেখে যাতে এ বিষয়ক খসড়াগুলি তৈরি হয় তারই উদ্দেশ্যে প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় পদে নিয়োগ। প্রসন্নকুমার ছিলেন ভারতবর্ষীয় সভার একজন সক্রিয় সদস্য। তাঁর উপদেশ ও পরামর্শে সভা খুবই লাভবান হয়েছিলেন। তাঁরা ১৪ই জুলাই, ১৮৫৪-এ অনুষ্ঠিত একটি মাসিক সাধারণ অধিবেশনে নতুন পদে নিয়োগের জন্য প্রসন্নকুমারকে অভিনন্দিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, তাঁর মত সুবিজ্ঞ, বহুদর্শী এবং প্রজ্ঞাদরদীর পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তাঁরা খুবই দুঃখিত। আইন সভার কার্যারম্ভের প্রাক্কালে ভারতবর্ষীয় সভা প্রস্তাব করলেন যে, তিনটি বিষয়ে সভাকে তৎপর হতে হবে। এগুলি যথাক্রমে— ১. পরিষদের অধিবেশনে আবশ্যক নিয়মাদি সাপেক্ষে দর্শক এবং প্রেস তথা সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণকে উপস্থিত হতে অনুমতি দিতে হবে; ২. সংবাদ-পত্রে প্রতিটি অধিবেশনের কার্যবিবরণ প্রকাশ করতে হবে, এবং, ৩. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্থাপিত সংগঠন সমূহের প্রতিনিধিগণকে প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে মতামত এবং সমাজ কল্যাণকর বিষয়সমূহ পরিষদের সামনে উপস্থিত হয়ে পেশ করবার অনুমতি দিতে হবে।

সভার প্রস্তাবের প্রথম ও তৃতীয় অংশ গৃহীত হয়নি। দ্বিতীয়টি অনুমোদন

লাভ করে। প্রতিটি অধিবেশনের কার্যবিবরণ যথানিয়মে অতঃপর সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়।

ভারতীয় আইন সভার মূল ত্রুটির দিকে কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভা প্রথম থেকেই স্থানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং আবেদনপত্র ও স্মারকলিপি মারফত এই ত্রুটি দূর করে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ দ্বারা একে সম্প্রসারণ করারও কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু তখন তাদের কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। বড়লাটের উপরে ভারতীয় সদস্য গ্রহণের ভার অর্পিত হয়। কিন্তু তখন বড়লাট ডালহৌসী বিবিধ উপায়ে ব্রিটিশ অধিকার সুদৃঢ় করার কাজে অতি মাত্রায় ব্যস্ত। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করলেন না। আইন সভা চালু হবার তিন চার বৎসরের মধ্যেই এর কুফল প্রত্যেকেরই বোধগম্য হ'ল। মুসলমান সমাজের বিখ্যাত নেতা স্যর সৈয়দ আহ্‌মেদ এই সময়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে মুন্সেফী কর্মে রত ছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিষম ত্রুটির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, আইন সভায় একজন মাত্র ভারতীয় সদস্য থাকলেও সিপাহী বিদ্রোহের মত এমন ব্যাপক অনর্থ সৃষ্টি হতে পারত না। ভারতবাসীর মনোভাব ইংরেজ সদস্যদের পক্ষে জানবার কোন উপায় ছিল না। ক্লার্ক এসিস্ট্যান্ট প্রসন্নকুমারকে শুধু আইনের খসড়া পরীক্ষার ভারই দেওয়া হয়, নূতন আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তনের কোনরূপ ইনিশিয়েটিভ বা প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর উপরে আদপে ছিল না। আরও একটি কথা এখানে বলে রাখি। ভারত-হিতৈষী পাদ্রী জেমস্ লঙ ১৮৫৩ সনে দেশীয় তথা উর্দু ভাষার বই পুঁথি সংগ্রহের জন্য দিল্লী যান। সেখানে সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে মিশে তাঁর এই ধারণাই জন্মে যে মুসলমানেরা ব্রিটিশ শাসনের উপর ভয়ানক বিদ্বিষ্ট হয়ে রয়েছে। শুধু পাণ্ডুলিপির আকারে নয়, যে সব পুস্তক পুস্তিকা ছাপা হয়েছে তাতেও এই বিদ্বেষ সম্যক প্রকট। লঙ্ পরে আক্ষেপ করে লিখেছেন যে, ভারতীয়দের মনোভাব বুঝবার কোন রকম আয়োজন বা চেষ্টাই তৎকালীন সরকারী কর্তৃপক্ষের ছিল না। ভারতবর্ষীয় সভার অভিমত অনুযায়ী অবিলম্বে এই ত্রুটি সংশোধন করে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করলে অব্যবহিত পরবর্তী বহু বিপদ থেকে শাসক শাসিত উভয় সম্প্রদায়ই রক্ষা পেতেন।

ভারতবর্ষীয় সভা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রস্তাবিত আইন সমূহ বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে কালবিলম্ব না করে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করতেন। স্থানীয় ও সর্বভারতীয় বিবিধ বিষয়ই এর মধ্যে ছিল। ক্রমে কর্তৃপক্ষ সভার কর্মপ্রচেষ্টার সার্থকতা স্বীকার করলেন। তাঁরা আইন বিধিবদ্ধ হবার পূর্বে সভার বিবেচনার জন্য খসড়াগুলি প্রেরণ করতেন। সভাও অনুকূল বা প্রতিকূল অভিমত দিয়ে নিজ কর্তব্য পালন করতেন। কখন কখন নূতন নূতন ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ও সভা কর্তৃপক্ষকে জানাতে ভুলতেন না। আইন সভায় বিধিমত বিরোধী পক্ষ ছিল না, যাকে আমরা বলতে পারি পার্লামেণ্টারি অপোজিশন। ভারতবর্ষীয় সভা বাইরে থেকে নিয়মিত ভাবে এই সরকারী স্বীকৃত অপোজিশন বা বিরোধী পক্ষেরই কাজ করে চলতেন।

পূর্বোক্ত বিখ্যাত আবেদনপত্রখানিতে সভা শাসন সংস্কার, সংশোধন প্রভৃতি বহু প্রস্তাব করেছিলেন। এর কোন কোনটি যে অংশতঃ বা সম্পূর্ণ সনন্দে স্থান পেয়েছিল তাও আমরা লক্ষ্য করেছি। এর তিন চার বৎসরের মধ্যে ভারত শাসনে যুগান্তর উপস্থিত হয়। কিরূপে, একটু পরেই আমরা জানতে পারব। তবে কোন কোনটি সম্বন্ধে এখানে পূর্বাহ্নেই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি। আবেদনপত্রে প্রস্তাব করা হয় সুপ্রিম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত একীভূত করা একান্ত আবশ্যক। লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় রদ করার কথাও এতে ছিল। প্রায় ২৫ বৎসর ধরে 'ল' কমিশন' ভারতবর্ষের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। দশ বৎসরের মধ্যেই এই সকল সম্বন্ধে কার্যকর পন্থা অবলম্বিত হয়। ভারতীয় দেওয়ানী আইন ও ফৌজদারী আইন স্বতন্ত্রভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে যায়। এই ধরনের আইন সংস্কার ও সংগঠনের কথাও উক্ত আবেদনপত্রে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল। এত সব কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভা ঐ সময় আঁচও করতে পারেন নি। তথাপি সভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করলেন এবং একে স্থায়িত্ব দান করতেও অগ্রসর হলেন। কথা ছিল সনন্দ পুনঃপ্রদান উপলক্ষ করে মাত্র তিন বৎসরের জন্য ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হবে। কিন্তু এর কার্যকারিতা উপলব্ধি করে এ প্রস্তাব বাতিল করা হয়। সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন হ'ল ১৮৫৪-এর জানুয়ারি মাসে।

কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর অতীব কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করার পর সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবসর নিলেন। তাঁর স্থলে সম্পাদক হন, সভা প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অন্যতম প্রধান অগ্রণী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। সহকারী সম্পাদক দিগম্বর মিত্রই থেকে যান। তৎকালীন গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সভার দিকে আকৃষ্ট হলেন এবং অনেকে হয় এর সভ্য, নয় কর্মকর্তৃসভার সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। এঁদের মধ্যে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' সম্পাদক কবি ও সাহিত্যিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আইন বিশারদ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নাম সকলের আগে উল্লেখ করতে হয়।

আরও একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠাবধি ভারতবর্ষীয় সভার কথা দেশী বিদেশী ইংরেজী বাঙলা বিবিধ সংবাদপত্রে স্থান লাভ করেছিল। যদিও ভারতবর্ষীয় সভায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকেই সভ্য হতে পারতেন তথাপি একটি বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ছিল শ্যেন দৃষ্টি। সভ্য হতে হলে প্রত্যেককে "ভারতীয়" হতে হবে। দেখি, প্রথম থেকেই ভারতবর্ষীয় সভায় ভারতীয় ব্যতিরেকে কোন শ্বেতাঙ্গ বা আর কাউকে গ্রহণ করা হয় নি। এ সত্ত্বেও তখনকার ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সভাকে আন্তরিকভাবেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে 'বেঙ্গল হরকরা' 'ইংলিশম্যান' 'সিটিজেন' প্রভৃতি পত্রিকার কথা আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। তখনকার দিনে কখন কখন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলেও ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষের বিবিধ কল্যাণ-প্রচেষ্টায় সাধারণভাবে সহযোগিতাই করতেন। ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাগুলিতে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করি। এই পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক বিবিধ প্রচেষ্টায় বিদগ্ধ ইউরোপীয়েরা এবং ভারতবাসীগণ এক-যোগে কার্য করতে কসুর করেন নি। বেথুন সোসাইটি, বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ, শিল্প বিদ্যালয় এবং পরবর্তী দশকের বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার কথা নিঃসংশয়ে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। অবশ্য উভয়ের মধ্যে জাতি-বৈরিতা পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধেই বিশেষভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। 'হিন্দু ইনটেলি-জেন্সার' সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ বরাবরই ভারতবর্ষীয় সভার প্রতিপোষকতা করেছেন। বাঙলা সংবাদপত্রগুলি—'সংবাদ প্রভাকর' 'সংবাদ ভাস্কর' প্রভৃতি

নিয়মিতভাবে সভার কার্যকলাপ প্রকাশ করতেন। ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হিন্দু পেট্রিয়টের' আবির্ভাব হয় ১৮৫৩, ৬ই জানুয়ারি। এর অনুষ্ঠান পত্রের মধ্যেও আসন্ন সনন্দ সম্বন্ধে আলোচনা পর্যালোচনা করার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদনা ভার গ্রহণ করার পর থেকে সভার সকল কার্যেরই সপক্ষতা করতে থাকেন, যদিও কাগজখানির স্বাধীন সত্তা নানা বিষয়ের আলোচনায় স্পষ্টরূপেই প্রকটিত হয়েছিল। পরবর্তী দশকে সভার সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল 'পেট্রিয়টে'রও সম্পাদনা শুরু করলে ক্রমে এখানি ভারতবর্ষীয় সভার একান্তভাবে মুখপত্র হয়ে ওঠে। আমি ভারতবর্ষীয় সভার প্রথম দশ বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের বিষয় দেশী বিদেশী সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত এ সভার নানা বিবরণ এবং বিবৃতি থেকেই বিস্তর তথ্য ও মালমশলা পেয়েছি। এর দ্বারা ঐ সময়কার ইতিহাস সঙ্কলন খুবই সহজ হয়েছে।*

* বিস্তৃততর বিবরণের জন্য বিশ্বভারতী পত্রিকায় (শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯; বৈশাখ-আষাঢ়, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭০; শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ এবং শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩) লেখকের 'ভারতবর্ষীয় সভা' রচনা দ্রষ্টব্য।—অনুলেখক।

ভারতবর্ষীয় সভা ঃ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কার্য

ভারতবর্ষীয় সভা ক্রমে যে বিলাতের সরকারী অপোজিশন বা বিরোধীদলের মত স্বকীয় কর্তব্য পালন করছিলেন এই দশকেই আরও কোন কোন জাতীয়তা মূলক আলোচনা পর্যালোচনার মধ্যে আমরা তা বেশ লক্ষ্য করি। এ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলি।

বিখ্যাত আবেদনপত্রে ভারতবর্ষীয় সভা এ দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণকল্পে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কোন ভারতবাসীর পক্ষে বিলাতে গিয়ে সিলেক্ট কমিটির সামনে এ সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হয় নি। এই কার্য করেছিলেন অন্ততঃ তিন জন বেসরকারী ইংরেজ। অবশ্য তাঁরা বহুকালপোষিত নিজ নিজ মতবাদকেই প্রাধান্য প্রদান করেছিলেন। এদের নাম আমাদের বড়ই স্মরণ হয়। 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার' বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্তর্ভুক্ত জন ক্লার্ক মার্সম্যান তখন বিলাতে ফিরে গিয়েছেন। শ্রীরামপুরের পাদ্‌রিরা বরাবর দেশভাষাসমূহকেই—যেমন বাঙলাদেশে বাঙলা—শিক্ষার নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত বাহন করার পক্ষপাতী ছিলেন। এ নিয়ে তাঁরা পুস্তক পুস্তিকাও লেখেন। জন ক্লার্ক মার্সম্যান স্বতঃই বাঙলা ভাষার বড়ই সপক্ষ, তিনিও নিজ গ্রন্থে ও বিবিধ রচনায় এর সার্থকতা প্রতিপাদন করে বিস্তর লিখে গিয়েছেন। তিনি সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে শিক্ষা বিস্তার কল্পে দেশভাষাসমূহকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। দ্বিতীয়, চার্লস ই. ট্রেভিলিয়ন। তিনি ভারতীয় প্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা বিষয়ক সরকারী কমিটিতেও প্রভাবশালী সদস্যরূপে ইংরেজীর সমর্থনে তিনি অনেক কাজ করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল এডুকেশন অব ইণ্ডিয়া বা (ভারতের) জাতীয় শিক্ষা নামে তাঁর একখানি বিখ্যাত বই বের হয়। এতে তিনি তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষাকেই জাতীয় শিক্ষা নাম দেন। এর সপক্ষে তাঁর বিচার বিশ্লেষণ আজিকার দিনেও অনেকের কৌতুহল উদ্রেক করবে। মেকলে থেকে আরম্ভ করে তখনকার

দিনে বহু বিশিষ্ট ইংরেজ এই ধারণাই পোষণ করতেন যে, পাদ্রিদের খ্রীষ্টানী প্রচেষ্টা অপেক্ষা এদেশীয়দের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষা প্রদত্ত হলে জনসাধারণের মানসিকতা সংস্কারমুক্ত হয়ে পাশ্চাত্ত্যের অভিমুখী হবে, আর এর ফলে খ্রীষ্টান না হয়েও ভারতবাসী তাদের সব রকম কৃতিত্বের অনুসরণ করতে পারবে। মেকলের ভগ্নীপতি ট্রেভিলয়নও এই মতের বড়ই পোষকতা করতেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে কমিটিকে নিজ মতামত জানাতে ভোলেন নি। তৃতীয়, ডাঃ অ্যালেকজেণ্ডার ডাফ। খ্রীষ্টান মিশনরীরূপে এদেশে ও বিলেতে তখনই তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার নিয়েই এদেশে তাঁর কাজ শুরু। কাজেই এর গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনিও অনুকূল অভিমত প্রকাশ করবেন তা বলাই বাহুল্য। উচ্চ শিক্ষা তথা ইংরেজী শিক্ষাকে সার্থক করে তুলবার জন্য বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আদর্শে এ দেশেও যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার এ সম্বন্ধেও কেহ কেহ বিশেষভাবে বলেছিলেন।

এত কথা বলা এখানে দরকার এই জন্য যে, এই সব সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক ডেস্‌প্যাচ বা বিধানপত্র রচনা করা হয়। জনশ্রুতি, দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই বিধানপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন। তিনি তখন বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের কর্মী ছিলেন। ডেস্‌প্যাচ, কোম্পানির ডিরেক্টর সভা পাঠান ১৮৫৪, ১৯শে জুলাই তারিখে। এ দেশে এটি পৌঁছালে ভারতবর্ষীয় সভা এর গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনায় অবিলম্বে লিপ্ত হন। সভা বিধানপত্রের কতকগুলি প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন। যেমন, দেশভাষা শিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষা এবং কলকাতা ও বোম্বাইএ প্রথমে এবং পরে মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এই পত্রে ইংরেজী শিক্ষার মত দেশীয় ভাষা সমূহ শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। অবশ্য বাঙলা দেশে এর পূর্বেই আদর্শ বাঙলা পাঠশালা স্থাপনকল্পে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর ভার অর্পিত হয়েছিল। তিনিও অবিলম্বে নিম্ন বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সরকারী অর্থে আদর্শ বাঙলা বিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকও যোগ্য লেখকদের দ্বারা লেখাবার আয়োজন হয়। পূর্ব দশকে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বাঙলা শিক্ষার প্রতি যে বিরূপ মনোভাব আমরা লক্ষ্য করেছি,

নূতন ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণ নিরাকৃত হ'ল। বাঙলা ভাষার মাধ্যমে ইতিহাস ভূগোল জ্যামিতি প্রভৃতিই শুধু রচিত হয়নি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের গ্রন্থাদিও এ সময় রচিত ও সংকলিত হতে শুরু হয়। মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন বাঙলা বিভাগে শরীরতত্ত্ব, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, ভেষজ তত্ত্ব, রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা প্রভৃতিও বাঙলার মাধ্যমে শেখানো হত। এ সব বিষয়ে যে বহুজনে বাঙলা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা আজ অনেকেই জানেন। আইনের বইও বাঙলায় লিখিত হতে থাকে। পরবর্তী কয়েক দশকে বাঙলার ডাক্তার, বাঙলার উকিল ও বাঙলার মোক্তারের যে আবির্ভাব হয় তাও এই ধরনের শিক্ষারই ফল। এর অনেকগুলির সূচনা হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্তিত বাঙলা শিক্ষার আয়োজনের ফলে। ডেস্‌প্যাচে তৎকালে আরব্ধ স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অনুকূল মন্তব্য ছিল। বিদ্যাসাগর সরকারী অনুদানের আশায় বহু স্থলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা বিধানপত্রের কোন কোন মারাত্মক ত্রুটির বিষয়েও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি। এতবড় বিধানপত্রে সংস্কৃত শিক্ষার উল্লেখ মাত্র ছিল না। আমি পূর্বে যে তিনজন মনীষীর শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেছি তার ভেতর এবং অন্যান্যদের উক্তির মধ্যেও সংস্কৃত শিক্ষার কথা নিশ্চয়ই বাদ পড়ে যায়। বিধানপত্র রচয়িতারাও এ দিকে মনঃসংযোগ করেন নি। অথচ একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় বলে সংস্কৃত তখনই পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে সহকারী সম্পাদক চন্দ্রশেখর দেব এই গুরুতর অনুল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন, ইউরোপের জার্মানি ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ইতিমধ্যেই বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি অবশ্য ব্রিটেন বা অক্সফোর্ডের কথা উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন—বিলাতে ভারতীয় সিবিল সার্বিস পরীক্ষায়ও সংস্কৃতকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষ সংস্কৃতের জন্মভূমি, এখানে তা শিক্ষাদানের সরকারী ব্যবস্থা থাকবে না সেটা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তিনি সভার পক্ষে এই মত প্রকাশ করলেন যে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অন্যান্য বিদ্যার মত সংস্কৃতকেও অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় বলে ধার্য করতে হবে। পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধ-জনিত অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু

সরকার সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করলে সভা তখনও তার সার্থক প্রতিবাদ করেছিলেন। এখানে একটি বিষয় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ডেস্‌প্যাচ্‌ পৌছাবার কিছুকাল পূর্ব থেকেই সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার ও প্রসারকল্পে সরকার পক্ষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কাজ শুরু করে দেন। তিনি সংস্কৃত কলেজকে শুধু ভদ্রশ্রেণীর নিকট উন্মুক্ত করেন নি, সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ করে দেবার জন্য সরল সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত সহজ পাঠ্য পুস্তকাদি রচনায় লিপ্ত হন। সভা ডেস্‌প্যাচের ত্রুটির কথাই মাত্র এখানে উল্লেখ করেছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধানপত্রে নির্দেশিত ব্যবস্থা সম্পর্কেও নিঃসংকোচে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করলেন। তাঁরা বললেন, বিভিন্ন প্রদেশে ডিরেক্টর (বর্তমান শিক্ষা অধিকর্তা) ও ইনস্‌পেক্টর নিয়োগে বিস্তর অর্থ ব্যয় হবে। এরূপ বিপুল আয়োজনের আবশ্যকতা নেই। এই সব কমিয়ে যে অর্থ বাঁচবে তার দ্বারা অধিক সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে দেশবাসীর বিস্তর উপকার হবে। বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যদান সম্বন্ধে যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে না বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বাঙলা দেশে একজন সিবিলিয়ান ডিরেক্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন। সভা এই কারণেই বোধ হয় বলেছিলেন যে, শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তাপদে কোন সিবিলিয়ানকে নিযুক্ত করলে ফল ভাল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এ যে কতখানি সত্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বাঙলা দেশের প্রথম সিবিলিয়ান শিক্ষা অধিকর্তা ইয়ং-এর মধ্যে অবাঞ্ছিত বিরোধে তা কিছুকাল পরেই প্রমাণিত হয়েছিল। সভার মতে কোন প্রধান শিক্ষাবিদ্‌ বা অভিজ্ঞ বহুদর্শী শিক্ষাব্রতীকে এই পদে নিযুক্ত করা সরকারের কর্তব্য। দেখি পরবর্তীকালে সভার এই অভিমতই সরকার পুরাপুরি গ্রহণ করেছেন।

ভারতবর্ষীয় সভার এই সময়কার দ্বিতীয় বিশেষ কার্য—ভারতীয় আইন সভা পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণকল্পে বিলাতের উভয় পার্লামেণ্টে একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ (১৮৫৩, ৮ এপ্রিল)। সভা-কর্তৃপক্ষ এই আবেদন প্রেরণের পূর্বেও বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশের নেতৃবর্গকে তাদের সঙ্গে একযোগে

এই আবেদনপত্র পেশ করার প্রস্তাব করেছিলেন। এবারেও তাঁরা নেতৃবৃন্দকে লিখলেন যে, ভারতীয় জাতি হিসাবে তাঁরা যে এক ও অভিন্ন, তাঁদের স্বার্থ ও কল্যাণ যে একই সূত্রে গাঁথা এ কথাটি বিলাতের কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়া কর্তব্য। আর মিলে মিশে কাজ করলে তাঁদের প্রস্তাবের গুরুত্ব শাসকমহলেও খুবই অনুভূত হবে। কিন্তু দেখা যায় এ সময়েও স্বাতন্ত্র্যবোধ ছাপিয়ে জাতীয়বোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া ঐ ঐ অঞ্চলবাসীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। অগত্যা ভারতবর্ষীয় সভা এককভাবেই পার্লামেণ্টে এই অত্যাবশ্যক সময়োপযোগী আবেদনপত্রখানি পাঠালেন। আবেদনপত্রে আইন সভার কতকগুলি মৌলিক ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হ'ল। প্রথমটি ছিল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এটি হ'ল পরিষদে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি নেই, ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ, আশা আকাঙ্ক্ষা, এক কথায় তাদের মনোভাব প্রকাশের বা সরকার পক্ষের তা জানবার উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে সভা আরও লিখলেন, আইন সভা সম্পূর্ণভাবে সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত। হয় তারা ব্রিটিশরাজ কর্তৃক নিযুক্ত অথবা তার প্রতিভূস্বরূপ কোম্পানি তাদের নিয়োগ করে থাকেন। সভা এর প্রতিষেধ ব্যবস্থার কথাও সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করেন। তাঁরা লেখেন, যাদের জন্য আইন প্রণয়ন সেই সকল ভারতীয় শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের আইন-সভায় প্রতিনিধি না থাকা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

সভা একটি বিষয়ের উপরে আবেদনপত্রে খুবই জোর দিলেন। এই পত্রে তাঁরা ভারতবাসীর বিরুদ্ধে পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীগণের কোন কোন উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভারতবাসীরা political freedom বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহী নন, তাদের ভিতর আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা বিদ্যমান—এরূপ উক্তিগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করলেন তাঁরা। আবেদনপত্রের শেষে সভা এই মর্মে লিখলেন যে, শিক্ষিত ভারতবাসীরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনায় বা কোনরূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর না হলেও তাঁরা যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আওতায় থেকে ব্রিটেনের অধিবাসীরা যে সব সুখ সুবিধা ভোগ করছেন তার সঙ্গে তুলনা করে ভারতবাসীরা তাদের দাসত্ব-জনিত হীনতা দূরীকরণে একান্ত উদ্গ্রীব। বাঙালীদের মধ্যে তখনই এই

প্রকার রাজনৈতিক আত্মসম্বিৎ জাগরিত হয়। বক্তৃতা এবং লেখায় তাদের স্বাধীন মনোভাব নানা সূত্রে প্রকটিত হতে থাকে। ইউরোপীয়েরা এ কারণ পরবর্তী দুর্যোগ কালে বাঙালীদের উপরে যে কতখানি রুষ্ট হয়েছিলেন তা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব।

কয়েক মাসের মধ্যেই আর একটি অত্যাবশ্যক বিষয় নিয়ে সভা আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। এর ফলশ্রুতি বিলাতে সিবিল সার্বিস ও সমপর্যায়ের সার্বিসগুলির নিয়ামকদের নিকট ১৮৫৬'র নভেম্বরে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ। নূতন সনন্দ আইন বলে বিলাতে একটি বোর্ড গঠিত হ'ল। এর নাম Board of Commissioners for the Affairs of India। এই বোর্ডের প্রথম সভাপতি ছিলেন টমাস বেবিংটন মেকলে (তখন লর্ড)। সিবিল সার্বিস ও অনুরূপ পদস্থ কর্মপ্রার্থীদের পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্তন, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদিই ছিল বোর্ডের কাজ। সিবিল সার্বিসকে Covenanted বা চুক্তিবদ্ধ সার্বিসও বলা হত। বিলাতে বসেই শাসন সম্পর্কিত সিবিলিয়ান বাদে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, যেমন, চিকিৎসা বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির কর্মচারীও নির্দিষ্ট পরীক্ষান্তে ভারতবর্ষের জন্য নিয়োগের সুপারিশ করতেন কমিশনারগণ।

সভা উক্ত আবেদনপত্রে এই মর্মে লিখলেন যে, সিবিল সার্বিস এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সার্বিস জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তা বলতে গেলে শুধু ব্রিটিশ জনসাধারণেরই জন্য। কেননা কালাপানির পারে এ দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানরা নানা কারণেই যেতে সক্ষম হবেন না। তাদের অভিভাবকগণও সংস্কার বশে তাদের যেতে দিতে নারাজ। উপরন্তু বিদেশ বিভূঁইয়ে অল্পবয়স্ক কিশোর সন্তানদের পাঠাতে অসম্মত হওয়ার নানা কারণই বিদ্যমান। জন্মগত সংস্কার, শিক্ষা, সামাজিক আচার-আচরণ সবই ইংরেজ হতে তাদের আলাদা। হেলিবেরি ও এডিসকম্বের স্কুলে শিক্ষালাভ করে তবে এ সব পরীক্ষা দিতে হয়। ভারতবাসীর পক্ষে সেখানে গিয়ে শিক্ষালাভ করা হয়তো মোটেই সম্ভবপর হবে না। এ সকল কারণ দেখিয়ে সভা বলেন যে, সত্য সত্যই যদি ঐ সব পদ ইংরেজ ও ভারতবাসীর নিকট সমভাবে উন্মুক্ত রাখতে হয় তা হলে এদেশে বসেই ভারত সন্তানদের উক্ত পরীক্ষা নেওয়া দরকার। সভা প্রস্তাব করলেন, কলকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে এরূপ পরীক্ষা

গ্রহণ করা হোক। ভারতবর্ষীয় সভার এইরূপ যুক্তিপূর্ণ আবেদনলিপি কিন্তু কমিশনারগণ মেনে নেন নি। উত্তরে তাঁরা অসম্মতিই জানালেন। ভারতবর্ষীয় সভার এই প্রস্তাব, বহু পরে প্রতিষ্ঠিত, কংগ্রেসও গ্রহণ করেন এবং প্রতি বৎসর এই উদ্দেশ্যে একটি করে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাস করিয়ে নিতেন। সে যুগের নেতৃবৃন্দের এই বিশ্বাস ছিল যে, সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করতে পারলে শাসনযন্ত্রকে ভারতবাসীর কল্যাণমুখী করে তোলা যাবে। এজন্যই তাঁরা এই ব্যাপারটিকে অতখানি গুরুত্ব দেন।

পূর্বেই বলেছি ভারতবর্ষীয় সভা পার্লামেণ্টে অপোজিশন বা বিরোধী দলের মত এ দেশে বে-সরকারীভাবে এইরূপ কাজ করতে থাকেন। স্বদেশের স্বার্থহানিকর বিবিধ বিষয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা যেমন প্রস্তাব গ্রহণ করতেন এবং স্থানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র পাঠাতেন, সেইরূপ যে সব বিষয় জাতির পক্ষে কল্যাণকর বিবেচিত হত সরকারী এবম্বিধ কোন কোন প্রচেষ্টার আন্তরিক সমর্থনও জানাতেন। দেখছি এই দশকের মাঝামাঝি তাঁরা কোন কোন কল্যাণমূলক প্রস্তাবের সপক্ষে আন্দোলনেও লিপ্ত হয়েছেন। জাতির পক্ষে এরূপ একটি একান্ত হিতকর বিষয়ের কথা এখানে উল্লেখ করব।

এ দেশে ব্রিটিশ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিচার সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে স্থানীয় সরকার মধ্যে মধ্যে যে সব আয়োজন করেছিলেন ব্রিটনদের পক্ষে তার ঘোরতর প্রতিবাদ হয় এবং এ পর্যন্ত প্রতিবাদ অসঙ্গত ও অমূলক হলেও কর্তৃপক্ষ এদের আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করেন। এর ফল কি বিষময় হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে বাঙলার সামাজিক ইতিহাস যাঁরা পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের নিকটে তা সম্যক প্রতিভাত হয়ে থাকবে। আমরা দেখেছি কৃষি শিল্প বাণিজ্য—নানা ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গেরা তখনই দেশের দূর দূর অঞ্চলে কর্মব্যপদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মফস্বলের ফৌজদারী আদালতগুলির বিচারের ক্ষমতা না থাকায় সাধারণ মানুষের উপর তাদের অত্যাচার অনাচার উপদ্রব ও নিপীড়নের অবধি ছিল না। গুরুতর অপরাধে অপরাধী ইউরোপীয়রাও আইনের চোখে ধুলো দিয়ে সর্বত্র নির্বিঘ্নে বিচরণ করত। তাদের বাগ মানাবে কে! দেখা গেছে মফস্বলে ইংরেজ পদস্থ কর্মচারী, ম্যাজিস্ট্রেট,

জজ, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়র, মহকুমাস্থ হাকিম প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ ইংরেজগণ এই সব শ্বেতাঙ্গ বেসরকারী ব্রিটিশদেরই প্রায় সকলে সপক্ষতা করতেন। এর ফলে প্রজাকুলের উদ্ধারের আশা হয়েছিল সুদূর পরাহত। অবশ্য ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ খুবই উদার প্রকৃতির ছিলেন এবং স্বজাতীয়দের অন্যায় কার্যের বিরোধিতা করতেও অগ্রসর হতেন। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইডেন (পরে ছোটলাট), হার্সেল (বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হার্সেলের সহোদর) প্রভৃতির নাম স্বতঃই আমাদের মনে আসে। কিন্তু "স্বাধীন" ব্রিটনদের অপকর্ম সরকার আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। এই সব নিরসনকল্পে আইন সভায় বিচার আদালতগুলির সংস্কার সাধনের প্রস্তাব সরকার পক্ষে উপস্থাপিত হ'ল ১৮৫৭ সনের প্রারম্ভে। এই অত্যাবশ্যক প্রস্তাবটি আইনে রূপদানের ভার নিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর বার্ণেস পীকক। তাঁর রচিত খসড়ার মূল কথা ছিল—মফস্বলে ফৌজদারী বিচারালয়কে ভারতবাসীর ন্যায় ইংরেজদেরও সমভাবে বিচারের অধিকার দেওয়া।

এই খসড়া আইনটি পীকক যথারীতি আইন সভায় পেশ করলেন। তখন ইউরোপীয় মহলে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এবারে তারা যেরূপ জোট বাঁধে এমনটি পূর্বে কখন দেখা যায় নি। ইংরেজ নীলকরদের সভা কলকাতায় অবস্থিত। অপরাপর ইউরোপীয় শিল্প ব্যবসায় সংক্রান্ত সংঘও এখানে বিদ্যমান। ঐ সময়ে ইউরোপীয়দের মুখপত্র ইংরেজ সম্পাদিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলির প্রতাপও ঢের বেড়ে গেছে। এরূপ অবস্থায় খসড়া আইনটির বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন যে নিরতিশয় তীব্র হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি! নেটিভ—কালা আদমীদের বিরুদ্ধে যেন সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ১৮৫৭, ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতাস্থ টাউন হলে ইউরোপীয়দের বিরাট সভা হ'ল প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে। বক্তারা বাঙালীদের উপর বিষোদ্গার করলেন। মফস্বলে বিচার আদালতগুলি যে নানা দোষে দুষ্ট এবং ত্রুটিপূর্ণ তা বলতে গিয়ে বাঙালী চরিত্রের উপর অযথা কটাক্ষ করতেও তারা কসুর করলেন না। প্রস্তাবিত আইনের অপেক্ষা নব্য শিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতবাসীরাই ইউরোপীয়দের লক্ষীভূত, সুতরাং এদেরই উপর তারা অধিকতর গালি-গালাজ বর্ষণ করে। এর একটি কারণও ঐ সময় অনুমিত হয়েছিল।

বাঙালীরা নব্য শিক্ষালাভ করে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং শাসন ও বিচারে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ দেশী বিদেশী নির্বিশেষে সমান অধিকার দাবী করতে থাকেন। উপরন্তু প্রশাসনে তাঁরা শ্বেতাঙ্গদের সমপর্যায়েই গৃহীত হবার নানা উপায় বাংলাতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয়দের নিকট এ সব একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে। শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভূত বলে ইংরেজ জাতি নিজেদের বহুকাল পোষিত অন্যায় অধিকারগুলির বিন্দুমাত্র অপহ্নব ঘটবার সম্ভাবনা দেখলে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠত। তাদের জাতিগত ঔদ্ধত্য সম্পর্কে নব্য শিক্ষিত বাঙালীরা সংবাদপত্রে বিশেষ সমালোচনা করতে থাকায় ইংরেজদের আক্রোশ আরও বেড়ে যায়। এবারে যখন শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে বিচার সাম্যের কথা উঠল তখন তারা কিরূপে নিরস্ত থাকবে? আইনটি উপলক্ষ মাত্র, শিক্ষিত বাঙালীরাই হলেন তাদের লক্ষ্য।

আমরা দেখেছি পূর্বে এই অসাম্য দূরীকরণের চেষ্টা সত্ত্বেও ইউরোপীয়দের জোটের সামনে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। সরকার প্রস্তাব উত্থাপন করলেও, পরে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এই রকম প্রচেষ্টার সমর্থনে বাঙালীদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় বটে, কিন্তু তখনই ভারতবাসীরা সংঘবদ্ধ না হওয়ায় সমবেতভাবে এ রকম সুষ্ঠু ব্যবস্থার সপক্ষে দাঁড়ানো সম্ভবপর হয়নি। ভারতবর্ষীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সম্মিলিত ভাবে এরূপ হিতকর প্রস্তাবের পক্ষে আন্দোলন পরিচালনায় নেতৃবর্গ এই প্রথম অগ্রসর হলেন। বাঙলা দেশের মফস্বল আদালতগুলির অধিকার বিস্তার এবং এ সবে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বিচার সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবেই তাঁরা শুধু উৎফুল্ল হন নি, একে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানান।

ভারতবর্ষীয় সভা নব্য শিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতবাসীর একমাত্র জাতীয় সভা; নব জাগ্রত জাতীয়তার প্রতীক। সভার কর্তৃপক্ষ, পূর্বেই বলেছি, কল্যাণমূলক সরকারী প্রস্তাব সমূহকে আন্তরিক ভাবে বরাবর সমর্থন করতেন। এবারেও বহুদিন পোষিত অন্যায়ের প্রতিকার এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন সভায় যে খসড়াটি উপস্থাপিত হয় তাতে তাঁরা নিরতিশয় আশান্বিত না হয়ে পারেন নি। ইউরোপীয়দের অন্যায় প্রতিবাদের বিরুদ্ধে এবং প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে তাঁরাও টাউন হলে ৬ এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখে

একটি জনসভার আয়োজন করলেন। মফস্বলের ফৌজদারী আদালতগুলি ইংরেজ অপরাধীদের বিচারে অসমর্থ থাকায় তাদের অপরাধ প্রবণতা কিরূপ বেড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশাও কত চরমে ওঠে তা শিক্ষিত বাঙালীদের অজানা ছিল না। উক্ত সভায় উত্থাপিত বিবিধ প্রস্তাবের মধ্যে তার উল্লেখ করা হয় এবং বিভিন্ন বক্তা বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা তা প্রমাণ করে দেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি। আয়োজিত জনসভায় অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হতে না পেরে তিনি যে পত্রখানি দেন তাতে মফস্বলের ফৌজদারী আদালতগুলির বিচারে অক্ষমতা হেতু ইউরোপীয়দের উপদ্রব কতখানি বেড়ে যায় তা বিবৃত করে এই আইনটিকে ইউরোপীয়দের কথিত "ব্লাক এক্ট" বা কালো আইনের পরিবর্তে "হোয়াইট্ এক্ট" বা শুভ্র আইন বলে অভিনন্দিত করেন।

এই বিখ্যাত পত্রখানি থেকে বুঝা যায় রাধাকান্তের স্বদেশপ্রেম কত প্রগাঢ় ছিল। অথচ তাঁর মধ্যে জাতিবিদ্বেষ বা জাতিবৈরিতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি লেখেন, ইংরেজরা এ দেশেরই প্রজা, তাদের অপরাধের বিচার ক্ষমতা মফস্বলের আদালতগুলির থাকবে না—বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ত্রুটি লক্ষ্য না করে পারেন না। রাধাকান্ত দফাওয়ারী ভাবে মফস্বল আদালতগুলির পক্ষে ইংরেজদের কার্যকর বিচার ক্ষমতা যে প্রকৃত প্রস্তাবে নেই তাই পরিষ্কার করে বলেছেন। প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে ইংরেজগণ নানা রকম আপত্তি তুলেছেন, রাধাকান্ত এর অযৌক্তিকতা খণ্ডন করতে সভাকে এই পত্রে অনুরোধ জানান। মফস্বলের আদালতগুলির সংশোধন ও সংস্কার যে আবশ্যক তা কেউই অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ইংরেজ ভারতবাসী সকল প্রজারই যে একই রূপ বিচার হওয়া আবশ্যক সে সম্বন্ধেও দ্বিমত থাকা উচিত নয়। কথা উঠেছে সুপ্রীম কোর্ট ও সদর আদালতগুলি মিলিত হলে প্রথমটির অপকর্ষ ও অপরগুলির ক্ষমতাধিক্য ঘটবে—এ কেমন করে বলা যায়? উভয় প্রকার উচ্চ আদালত সম্মিলিত হয়ে শহর মফস্বল সকল শ্রেণীর প্রজার অবস্থা দৃষ্টে সুবিচার হওয়া অবশ্যই সম্ভব হবে।

খ্রীষ্টানীর জন্য এদেশীয়দের নিকট পাদ্রী ডাফের বড়ই অপযশ হয়েছিল। কিন্তু কল্যাণমূলক বিবিধ প্রচেষ্টার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে বিচার বৈষম্য দূরীকরণের নিমিত্ত যে নূতন আইনের প্রস্তাব আইনসভায় করা হয় তার সমর্থনে ডাফ সভাকর্তৃপক্ষকে একখানি পত্রে নিজ দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, মফস্বলস্থ আদালতগুলির আশু সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। পত্রখানির শেষ দিকে তিনি ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে এই ক'টি কথা লিখলেন : এখন এদেশে স্বদেশপ্রেমের কথা আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু তিনিই সত্যিকার স্বদেশপ্রেমিক যিনি নিজের সুখ সুবিধা বিসর্জন দিয়ে ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন এবং অজ্ঞ, সংস্কারাচ্ছন্ন ও দলিত অগণিত মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতিসাধনের নিমিত্ত নিঃস্বার্থভাবে কার্য করে যাবেন।

জাতীয় স্বার্থ ও জাতির মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভা যে বিশেষভাবে চিন্তা করছিলেন, টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহ এবং তার উপর প্রদত্ত সভ্যদের বক্তৃতায় বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সময়ে ভারত হিতৈষী জর্জ টমসন পুনরায় ভারতে আসেন। সভায় তিনিও একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। উত্থাপিত প্রস্তাব তিনটির মূল কথা এই যে,—(১) মফস্বলের ফৌজদারী আদালতকে ইংরেজ ও ভারতবাসীর বিচারের সমান অধিকার অর্পণ সম্পর্কে আইন সভার প্রস্তাব সমর্থন। (২) ভারতীয় সরকারী কর্মচারীরা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে যোগ্যতার সঙ্গে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে চলেছেন। এজন্য তারা সকলেরই আস্থাভাজন যদিও পদমর্যাদায় তারা ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সমান নন। তাদের নিয়োগে বিচার আদালতগুলির যথেষ্ট সংস্কার সাধন হয়েছে। (৩) তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে, এ সত্ত্বেও বিচার আদালতগুলির উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ফৌজদারী বিচার বিধিতে ব্যবহার সাম্য প্রবর্তন, ব্যবহার শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিচারক নিয়োগ ও স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা— এই উদ্দেশ্যে দেশী বিদেশী সকলেরই একযোগে কাজ করা আবশ্যক।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে কিশোরী চাঁদ মিত্র, জর্জ টমসন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁরা নিজ নিজ বক্তৃতায়

তথ্য প্রমাণ সহযোগে প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বিশদভাবে আলোচনা করেন। কিশোরীচাঁদ দীর্ঘকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের বিচার আদালতগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ হন। তাঁদের সুবিচারের সপ্রশংস উল্লেখ ইতিপূর্বে বহু পদস্থ ইংরেজ করে গিয়েছেন। জর্জ টমসন দ্বিতীয় প্রস্তাবের সমর্থনে এই সকল কথার উল্লেখ করে দেশীয় সুযোগ্য বিচারকদের অভিনন্দিত করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৃতীয় প্রস্তাবে বর্ণিত বিবিধ বিষয়ের সমর্থনে আলোচনা করে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার মধ্যে একস্থানে তিনি এই মর্মে বলেন যে, এ দেশে যে সব ইংরেজ আসে তার অধিকাংশই বিলাতি সমাজের নিম্নস্তরের, এমন কি অপাঙ্‌ক্তেয়। তাঁর এই উক্তির ফলে ইউরোপীয়েরা বিশেষ বিরক্ত হন। এবং ইণ্ডিয়ান ফটোগ্রাফিক সোসাইটির কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে ভোটাধিক্যে তাঁকে অপসারিত করেন। সাত বৎসর পূর্বে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষকে নিয়ে এইরূপ আর একটি ব্যাপার ঘটে, একথা আগেই বলেছি।

এই ক' বৎসরে ইউরোপীয় ও উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে জাতিবৈরিতা কিরূপ বেড়ে যায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাবিত আইনের আলাপ-আলোচনাকালে তা বিশেষ প্রতিপন্ন হ'ল। বহুকাল পোষিত বিচার-বৈষম্য বিদূরণের যে আশা উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে পাওয়া গেল তাও কিন্তু অব্যবহিত পরের একটি বিষম ব্যাপারের ফলে লুপ্ত হয়ে যায়। ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে এতাদৃশ বিচার-বৈষম্য হেতু পরবর্তীকালে আমাদের জাতীয় আন্দোলন বিশেষভাবে জোরালো হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষীয় সভা নবজাগ্রত জাতীয়তা-বোধকে সুপথে পরিচালনার নিমিত্তই এইরূপ সমাজহিতকর প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন। স্তর বার্নেস পীকক উত্থাপিত বিচারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি এক ভয়াবহ আকস্মিক কারণে চাপা পড়ে গেল। এ হ'ল সিপাহী বিদ্রোহ বা সিপাহী যুদ্ধ। ভারতবর্ষীয় সভা এই সময় জাতির মুখপাত্র স্বরূপ যে ধরনের আলাপ আলোচনা আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন তার ফলে বাঙালী তথা ভারতবাসী বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। এই বিষয়টিই এখন এখানে একটু বিশদ করে বলছি।

সিপাহী যুদ্ধ ১৮৫৭, ১০ই মে শুরু হয়। সৈন্য বিভাগের সিপাহীরা বিদ্রোহ

আরম্ভ করে এবং দেখতে দেখতে উত্তর ভারতে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি নানা দিক থেকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হচ্ছে। সিপাহী যুদ্ধের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ করে স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন স্থলে অনেকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনায় রত হন। কাহারও কাহারও মতে এটি ব্রিটিশ ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সমর। এদেশ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নকেই যদি স্বাধীনতা সমর আখ্যা দেওয়া যায় তা হলে হয়তো এই উক্তির মধ্যে খানিকটা সত্য পাওয়া যাবে। কিন্তু স্বাধীনতা ও জাতীয়তাকে পরস্পরের পরিপূরকরূপে প্রয়োগ করলে কোন মতে ঐ যুদ্ধকে এইরূপ আখ্যা দেওয়া যাবে না। উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চলের শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিশেষ ব্রিটিশের প্রশাসনিক নীতির দ্বারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত এবং উদব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তারা নামেমাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহকে পুরোভাগে রেখে সরকারে কর্মরত সিপাহীদের বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করাতে সচেষ্ট হয়। ভারতবর্ষ যে এক রাষ্ট্র, এক জাতি (nation) এই বোধ এদের মধ্যে জাগ্রত ছিল বলে একান্তই প্রমাণাভাব। পূর্ব শতকের দুঃখ দুর্দশা সাধারণ মানুষ তখনও ভুলতে পারে নি। আমহদ শাহ্ আবদালি ও নাদির শাহের ভারত আক্রমণ, দিল্লীর বাদশাহের অন্তঃসারশূন্যতা ও নিরতিশয় অকর্মণ্যতা, বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, বিশেষ করে বাঙলায় বর্গীর হাঙ্গামা এবং নবাবী অত্যাচার এ দেশবাসীর মনে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। ব্রিটিশ শাসনে সমগ্র ভারত একীভূত হওয়ার পথে ; অরাজকতা বিদূরিত করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় শাসক জাতি তখন তৎপর। ধর্ম এবং সমাজ-বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম করার পক্ষে এ দেশবাসী ক্রমে যথেষ্ট সুযোগলাভ করতে থাকেন। পশ্চিমের জাতীয়তাবোধের আদর্শও তাদের সম্মুখে।

ভারতবর্ষীয় সভা নব্যশিক্ষিত ভারতবাসীদেরই সভা। তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে প্রথম হতে তৎপর হয়েছিলেন। জাতীয় সংহতির ভিত্তি জাতীয় ঐক্যবোধ। তারা দেখলেন আরব্ধ সিপাহী যুদ্ধ এই নব জাগ্রত জাতীয়তার তরুমূলে ভীষণ আঘাত হানছে। তাই তারা তীব্র ভাষায় এর নিন্দাবাদ করতে পশ্চাৎপদ হন নি।

সম্প্রতি জনৈক ভদ্রলোক 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে তীব্র নিন্দাবাদ ও কটূক্তি উল্লেখ করে সেকালের শিক্ষিত বাঙালীদের উপর বিশেষ কটাক্ষপাত করেছেন। তাঁর উক্তির নির্গলিতার্থ এই যে, বাঙালীরা তখনও স্বাধীনতা সমরের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। অথচ 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই, আমার যতদূর মনে হয়, স্বদেশপ্রেমের প্রথম বাঙালী কবি। তাঁরই কথা—স্বদেশের কুকুর পূজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই দশকের মাঝামাঝি অন্য প্রসঙ্গে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন একটি বিখ্যাত কবিতায়, যার আরম্ভ—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে…ইত্যাদি।

ভারতবর্ষীয় সভার একটি উদ্ধৃতি থেকে আমরা দেখেছি যে, ভারতবাসীরা তখনই ব্রিটিশের স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের হীন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন। তাদের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহাও বেড়ে যাচ্ছে। সভার অন্যতম নেতৃস্থানীয় সদস্য হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মাধ্যমে জাতীয়তার ভিত্তিতে এই স্বাধীনতা স্পৃহার কথা প্রতিনিয়ত ব্যক্ত করছিলেন।

এ সত্ত্বেও ভারতবর্ষীয় সভা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কখনও চাননি। শাসক জাতির সহায়ে ভারতীয়েরা একতাবদ্ধ হয়ে দ্রুত নিজেদের উন্নতি করতে সমর্থ হবে এই বিশ্বাসের বলেই তাঁরা সব রকম কাজ করছিলেন। এ সময়ে এমন একটা বিদ্রোহের দ্বারা দেশের সমূহ ক্ষতি হবে বলে তাঁরা বিদ্রোহীদের গর্হিত কাজের নিন্দাবাদের উদ্দেশ্যে ১৮৫৭, ২৩ মে তারিখে একটি ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

প্রস্তাবে এই মর্মে বলা হয় যে, এই বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যেই নিবদ্ধ রয়েছে। উত্তর ভারতের যে সব অঞ্চলে এ দেখা দিয়েছে সেখানকার জনসাধারণের সহানুভূতি তারা পায় নি বলেই সভার বিশ্বাস। কুচক্রীদের প্ররোচনায় সিপাহীরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়েছে। ভারতবাসীরা ব্রিটিশের সদিচ্ছা ও শাসননীতিতে আস্থাশীল একথাও ঐ প্রস্তাবে বলা হয়। বাঙালীরা কেন যে শ্রেণী সংগ্রামকে স্বাধীনতা তথা জাতীয় সংগ্রাম বলে তখন গ্রহণ করতে পারেন নি তা এই সময়কার ভারতবর্ষীয় সভার কার্যকলাপ থেকে সবিশেষ বুঝা যায়।

ভারতবর্ষীয় সভা বিদ্রোহ দমনে সরকারী নীতি সমর্থন করলেন বটে, কিন্তু বেসরকারী ইউরোপীয়েরা এই সুযোগে বাঙালীদের উপর প্রতিহিংসা নিতে অতিমাত্রায় সচেষ্ট হয়ে উঠল। এই সভা নিখিল ভারতীয় সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য স্থাপিত হলেও এর কর্ণধারগণ নব্যশিক্ষিত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী। এই শ্রেণীর বাঙালীরা যে প্রজাকুলের উপর ইউরোপীয়দের অনাচার উৎপীড়নের সম্পর্কে সচেতন তা পূর্বেই তারা বুঝে নিয়েছেন। বিদ্রোহ কালের জরুরী অবস্থায় বড়লাট ক্যানিং সাময়িকভাবে মুদ্রাযন্ত্র আইন এবং অস্ত্র আইন জারি করেন। বিদ্রোহের শুরুতেই ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদী বাঙালীদের নিগৃহীত করবার জন্য অগ্নিবর্ষণ করছিল। মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হলে আশ্চর্যের বিষয় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রথমেই এর কবলে পড়ে। আর এই 'ভারত বন্ধুর' ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারই তার কারণ। ইউরোপীয়েরা জিদ ধরল কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠস্থ এ-দেশবাসীদের অস্ত্র আইন বলে নিরস্ত্র করতে হবে। এই হেতু তারা সরকারে আবেদনপত্র প্রেরণের নিমিত্ত ইউরোপীয় সাধারণের নিকট তা স্বাক্ষর করিয়ে নিতে আরম্ভ করল। ভারতবর্ষীয় সভা ইউরোপীয়দের মতিগতি সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। সভা কর্তৃপক্ষ তাদের মতলব জেনে ২৫শে জুলাই (১৮৫৭) তারিখে সাধারণ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ইউরোপীয়দের মতলব অনুযায়ী কাজ হয়নি। তাদের আর একটি প্রস্তাব ছিল সমগ্র ভারতে ও দেশীয়দের উপর সামরিক আইন জারি। উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন প্রবর্তিত হ'ল বটে, কিন্তু অন্য কোথায়ও তা চালু হ'ল না। ক্যানিংয়ের কার্যে ইউরোপীয় সমাজ খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাঁর উপর 'ক্লেমেন্সি' ক্যানিং এই ব্যঙ্গাত্মক উপাধি বর্ষণ করে। জনশ্রুতি এই যে, হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' প্রতি সপ্তাহে বের হওয়া মাত্রই বড়লাট ক্যানিং ভারতবাসীর মতামত বুঝে নেওয়ার জন্য তা পাঠ করতেন এবং অনেকের বিশ্বাস তাঁর ঐ সময়কার শাসন নীতি এর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। এদেশে বড়লাট ক্যানিংয়ের উপর ইউরোপীয় সমাজ যেমন অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে, বিলাতেও তাঁর বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা নানারূপ প্রচার চলতে থাকে। বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি ভারতবর্ষের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড এলেনবরা একটি বক্তৃতায় বলেন যে,

খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিবিধ উদ্যোগে বড়লাট ক্যানিং অর্থ সাহায্যদান করার দরুনই প্রজাদের অসন্তোষ দেখা দেয় ; এবং উহাই এই বিদ্রোহের একটি প্রধান কারণ। ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর ক্যানিংয়ের উদার শাসননীতির সমর্থন করছিলেন। এরূপ একটি অর্থহীন উক্তি সম্পর্কে তারা নীরব থাকতে পারলেন না। ২৫শে জুলাইয়ের (১৮৫৭) উক্ত সাধারণ সভায় লর্ড এলেনবরার ভ্রমাত্মক উক্তির প্রতিবাদ এবং বড়লাট ক্যানিংয়ের উদার শাসন-নীতির সমর্থনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সময় তিনি এর উপরে আবেগময় সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। এতে তিনি লর্ড এলেনবরা যে ভারত হিতৈষী তা স্বীকার করেও এই মর্মে বলেন যে, উক্ত কারণে বিদ্রোহ ঘটে নি। এর মূল অন্যত্র খুঁজতে হবে। একশ্রেণীর লোক সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষ করে সমগ্র ভারতীয় জাতিকেই দোষারোপ করছেন। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা একটি পুরাতন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, তারা নির্বিচারে আপাত-লাভের নিমিত্ত কোন গর্হিত কার্যে লিপ্ত হতে পারেন না। ভারতবর্ষীয়দের জাতীয়তাবোধ এই সুপ্রাচীন সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু শতাব্দীর পরাধীনতা সত্ত্বেও তাদের বিচারবুদ্ধি এখনও সক্রিয় আছে।

দক্ষিণারঞ্জন, লর্ড এলেনবরার উক্তির প্রতিবাদে এবং বড়লাট ক্যানিংয়ের অনুসৃত নীতির সমর্থনে এর পর বলেন যে, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এদেশে সমাজ-কল্যাণমূলক বিবিধ কাজে লিপ্ত রয়েছেন। এ সবের দ্বারা দেশ ও জাতি আজ বিশেষ উপকৃত। তিনি সৈন্য বিভাগের পুনর্বিন্যাসকল্পে কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ গঠনমূলক প্রস্তাবও করলেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন—মাতৃভাষায় নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত শিক্ষালাভের পর সিপাহীদের সৈন্য বিভাগে ভর্তি করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে তাদের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। সৈন্যদের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এর একটি প্রকৃষ্ট উপায়। যারা জ্ঞানার্জনে উৎকর্ষ দেখাবে তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। যুদ্ধের সময় ব্যতিরেকে অন্য সময় আলস্যে ও গাল গল্পে না কাটিয়ে তাদের মধ্যে মানবিকতাবোধ উন্মেষ এরূপে সম্ভব হবে। অপরের প্ররোচনায় কর্ণপাত না করে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও তারা উদ্বুদ্ধ হবে। ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন

যে, সিপাহী বিদ্রোহের মূল খুঁজতে হবে আরও গভীরে। অপদস্থ ও রাজ্যচ্যুত ব্যক্তিদের পক্ষে কতকগুলি লোক সিপাহীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবার সুযোগ পাওয়ায় বিদ্রোহ এরূপ ব্যাপ্তিলাভ করেছে বলে সাধারণের বিশ্বাস, তবে ইহা একটি শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ রয়েছে। কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, ভূস্বামী—জনসাধারণ এই বিদ্রোহ থেকে দূরে রয়েছেন। একশ্রেণীর অপরাধের জন্য সমগ্র ভারতবাসীকে সায়েস্তা করবার প্রবৃত্তি আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে।

বিদ্রোহের মধ্যে ১৮৫৭, ১লা আগস্ট বঙ্গের ছোটলাট মফস্বলে নীলকরদের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করেন। নীলকরদের অত্যাচার অনাচার অজানা নয়। ব্যবস্থা সাময়িক হলেও এর দ্বারা যে কত অনর্থ হতে পারে তা দেখিয়ে ভারতবর্ষীয় সভা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রতিবাদ স্বরূপ একখানি স্মারকলিপি পেশ করেন। এতে তাঁরা একটি সরকারী বিধির উপর জোর দেন। তাঁরা লেখেন যে, লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোন ব্যক্তিকেই সরকারী বিচারক পদে নিয়োগ করা হবে না এবম্বিধ সরকারী নিয়ম এবং চিরাচরিত রীতি কর্তৃপক্ষ এর দ্বারা ভঙ্গ করছেন। এই সময়ে সভার অন্যতম প্রধান জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ওই ব্যবস্থার সম্ভাব্য কুফল-সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করে সংবাদপত্রে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। ভারতবর্ষীয় সভা বৎসরখানেক পরে আবার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হন। তাঁরা নীলকর লারমুর ও ডিরেটের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সরকারে লিখলেন যে, তারা নিজ নিজ এলাকায় পেয়াদা হতে উপরিতন কর্মচারীগণকে নির্লজ্জভাবে নীল চাষীদের উৎপীড়নে নিযুক্ত করেছে। বিদ্রোহান্তে স্থানীয় সরকার এই ব্যবস্থার কতকটা সংস্কার করলেও নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে তিক্ততা অতি দ্রুত বেড়ে যায়। ফলে প্রজাদের মধ্যে একটি ব্যাপক নীলকর বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভব হ'ল। এখন ঘোরতর সিপাহীযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের একটু বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে।

সিপাহী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

সিপাহী যুদ্ধের প্রাক্কালে শিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনে এর কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, ভারতবর্ষীয় সভা প্রসঙ্গে এই মাত্র তা জানতে পেরেছি। সিপাহী বিদ্রোহ বা যুদ্ধ নিয়ে একটা বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে। হবারও কথা। কেন না পলাশী লড়াইয়ের পর কোম্পানি যে সকল খণ্ড বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়েছিল এটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ও ব্যাপকতর। সমসাময়িক সভা সমিতিতে দেশী বিদেশী সংবাদপত্রে এবং এদেশ থেকে বিলাতে প্রেরিত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক ডেস্‌প্যাচে সিপাহীযুদ্ধের তীব্রতা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জন উইলিয়ম কে সিপাহী যুদ্ধের উপরে তিন খণ্ডে এক সুবৃহৎ পুস্তক লিখেছেন। আমাদের দেশে রজনীকান্ত গুপ্ত মূলতঃ এরই উপর নির্ভর করে পাঁচ খণ্ডে 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' রচনা করেন। বলা বাহুল্য ইংরেজের লেখা ইতিবৃত্তে সকল স্থলে যে পক্ষ প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের উপর সুবিচার হয়েছে তা বলা চলে না। তথাপি সময়ের ব্যবধান যতই বাড়তে থাকে ততই যুদ্ধের বাস্তব কাহিনী, কার্যকারণ সম্বলিত হয়ে আমাদের নিকট ধরা দিয়েছে। পূর্ব অধ্যায়ে সিপাহী যুদ্ধের প্রতি সমকালীন শিক্ষিত ভারতবাসীদের মনোভাবের কথা কথঞ্চিৎ উল্লেখ করেছি। পরবর্তীকালেও কিন্তু ঐতিহাসিকগণ একে নিছক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিদ্রোহ বলেই আখ্যাত করেছেন। এরই ভিত্তিতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু 'ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া' পুস্তকে একে একটি সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ বলেও আখ্যাত করতে ছাড়েন নি। সাম্প্রতিককালে কিন্তু দেখি এ নিয়ে একটি ভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। আশ্চর্যের বিষয় পণ্ডিত নেহেরুর সময়েই এই মতবাদ একটি স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এর মূল কোথায় তা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করব।

পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর পূর্বে বিনায়ক দামোদর সাভারকার (বীর সাভারকার) সিপাহী যুদ্ধ সম্পর্কে ইংরেজীতে একখানা বই লেখেন, নাম দেন —'ন্যাশনাল ওয়ার অব ইনডিপেনডেনস্' বা স্বাধীনতার জাতীয় সংগ্রাম। সাভারকার একে প্রথম স্বাধীনতা সমর বলে উল্লেখ করেছেন। ত্রিশের দশকে

এর একটি বৃহত্তর দ্বিতীয় সংস্করণ বার হয়। কিন্তু পুস্তকে লিপিবদ্ধ তাঁর মতবাদ তখন পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে তেমন প্রচারিত হয় নি বলেই জানি। আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর দশেকের মধ্যে এ নিয়ে তেমন কিছু আলোচনা বিশেষভাবে শুরু হয়নি। এর পর এলো সিপাহী যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপনের পালা। এই সময়ে আবার নূতন করে সাভারকারের মতবাদের ভিত্তিতে আলাপ আলোচনা শুরু হ'ল। একদল লেখক—তাদের মধ্যে পেশাদার ঐতিহাসিকও আছেন, বলতে আরম্ভ করলেন সিপাহী যুদ্ধই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সমর। নূতন নূতন বই পুঁথিও রচিত হয়। ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে ঐতিহাসিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সিপাহী যুদ্ধের উপরে একখানি বই লিখলেন। তিনি কিন্তু সাভারকারের মতবাদ পুরা-পুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু প্রধান মন্ত্রী থাকা কালেই এই শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর পূর্বেকার গ্রন্থের উক্তি-গুলির সঙ্গে এই সময় সাভারকারের মতবাদের কিরূপে সামঞ্জস্য করা হয় তা অনেকেরই কৌতুহল উদ্রেক করবে। ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও এখানে আর একটি কথা বলি। আমাদের জাতীয় আন্দোলন তথা কংগ্রেসের আনুপূর্বিক ইতিহাসও লেখার ব্যবস্থা হ'ল নেহেরুর সময়েই। ডক্টর তারাচাঁদ এ নিয়ে সরকারী উদ্যোগে বই লিখলেন। এতে কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার পঞ্চাশ ষাট বৎসরের কৃতবিদ্য বাঙালীদের জাতীয়তা ভিত্তিক কার্যকলাপের উপর উপেক্ষাই প্রদর্শিত হয়েছে। অথচ এই সকল বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলেই ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব।

এ কথা থাক। এখন, এতদিন সিপাহী যুদ্ধকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখে এসেছি এবং আচার্য যদুনাথ সরকারের সহিত আলাপেও যা বাস্তবানুগ বলে মনে হয়েছে তা সাম্প্রতিক প্রচারণার মাধ্যমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বলে প্রতীতি হয়। তথাপি তথ্যভিত্তিক আলোচনা হওয়া একান্ত দরকার। কেননা ভবিষ্যতে যারা এ বিষয়ের আলোচনায় লিপ্ত হবেন তাদের পক্ষে কল্পনার পরিবর্তে বাস্তবকে গ্রহণ করার পথ সুগম করে দেওয়া প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই ধর্ম হওয়া উচিত। এই ক'টি কথা বলে আমরা আসল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হব।

পূর্বেই বলেছি ১৮৫৭, ১০ই মে সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কোম্পানির সর্বশক্তি নিয়োজিত হয় বিদ্রোহ দমনের জন্য। এ সময় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ভূখণ্ডের রাজ্যচ্যুত, লাঞ্ছিত ব্যক্তিরা বিশিষ্ট শ্রেণীর সহযোগে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের একটি স্পষ্টরূপ তখন তাদের চোখে ধরা দেয়নি, যদিও আপদধর্ম হিসাবে অকর্মণ্য কুক্রিয়াসক্ত নামেমাত্র বাদশাহ বাহাদুর শাহকে তারা নিজেদের প্রধান বলে ঘোষণা করেছিলেন। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের হিত সাধন তাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন কোন প্রমাণের একান্তই অভাব। এই সব রাজ্যচ্যুত, লাঞ্ছিত লোকেরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাহত হয়ে অন্যের আশ্রয়ে তা সিদ্ধিরই চেষ্টায় ছিলেন। সুতরাং একে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গেও তুলনা করা চলে না। সামান্য চা নিয়ে বিবাদ শুরু হলেও আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র আমেরিকান উপনিবেশের স্বাধীনতা অর্জন। একটি বিষয়ে কিন্তু তাদের মধ্যে মিল লক্ষ্য করি। বিষয়টি হ'ল আমেরিকাবাসীর মত এদেরও ব্রিটিশ কর্তৃত্ব একেবারে অস্বীকার।

বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর আমল (১৮৪৮—১৮৫৬) দুইটি কারণে বিশেষ স্মরণীয়। আমরা পূর্বে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডব্লু. বি. ও'সাগনেসির টেলিগ্রাফ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা জেনেছি। এদেশে তিনি এ বিষয়ে ছিলেন হাতে নাতে কাজ করার বিশেষজ্ঞ। ডালহৌসী ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ও'সাগনেসির উপর ভার দিলেন টেলিগ্রাফ বা তার বিভাগ সংগঠনের। পাঁচ ছ' বৎসরের মধ্যে দূর দূরাঞ্চলে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল। জানা যায় রেঙ্গুন যুদ্ধে ইংরেজের যে জয়লাভ ঘটে তা সম্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ টেলিগ্রাফ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার জন্যই। আবার ডালহৌসীর সময়েই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে বাষ্পীয় রেলপথ প্রবর্তিত হ'ল। রেলপথে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অতি দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়ে উঠল এ কারণে। সিপাহী যুদ্ধকালে বিদ্রোহ দমনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার ও রেল বিভাগের সম্পূর্ণ সুযোগ পেলেন। এই দুটি ভারতবাসীদের মধ্যেও দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন ও একাত্ম-বোধ উন্মেষেও বিশেষ সহায় হয়েছিল, অবশ্য এ হ'ল কিছু পরের কথা।

বড়লাট ডালহৌসী ছিলেন জবরদস্ত শাসক। ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তার

ও শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ জন্য তিনি দুটি প্রধান পথ বেছে নিলেন। প্রথমতঃ তিনি এই নীতি প্রচার করলেন যে, অপুত্রক রাজাদের রাজ্য তাদের মৃত্যুর পর সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। এই নীতির বলে চার বছরের মধ্যে সাঁতারা, ঝাঁসী ও নাগপুর ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হয়ে গেল। ১৮৫৬ সালে কু-শাসনের অজুহাতে ডালহৌসী অযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করে সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশ দখল করেন। একদিকে যেমন এই কার্য চলল, অন্যদিকে তেমনই যাদের সাহায্যে ইংরেজ প্রভুত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই দেশীয় সৈন্যদল পুনর্গঠনে তিনি মন দিলেন। কোম্পানির সৈন্যদল তখন তিনটি পল্টনে বিভক্ত—বাঙালী পল্টন, বোম্বাই পল্টন ও মাদ্রাজী পল্টন। এর মধ্যে বাঙালী পল্টনই ছিল সুশিক্ষিত ও সকলের সেরা। কারো কারো ধারণা যে, বাঙালী সিপাহী নিয়েই বাঙালী পল্টন গঠিত। এ কিন্তু ঠিক নয়। আগ্রা অযোধ্যা ও বিহারের উচ্চশ্রেণীর, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নিয়েই বাঙালী পল্টন গঠিত হয়েছিল। 'বেঙ্গল আর্মি' বা বাঙালী পল্টন নামটিই আজও হয়তো ভ্রান্তির উদ্রেক করে। তখনকার দেশীয় সৈন্যদের নাম সাধারণ ভাবে দেওয়া হতো সিপাহী।

বাঙালী পল্টনের সিপাহীরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও খুবই ধর্মপ্রবণ। তাদের ভিতরে ঐকমত্য ও একপ্রাণতা যথেষ্ট। এজন্য তাদের দাবি কোম্পানিকে বহুবার অবনত মস্তকে মেনে নিতে হয়েছে। সিন্ধু যুদ্ধে, ব্রহ্ম যুদ্ধে এবং সমুদ্রপারের কোন কোন যুদ্ধে যেতে বাঙালী পল্টন অস্বীকার করে। কর্তৃপক্ষও তাদের উপর জোর জুলুম বা জিদ না করে তাদের অস্বীকৃতি মেনে নেন। গুর্খা ও শিখ যুদ্ধে—উভয়কেই ইংরেজরা হারিয়ে দেয় প্রধানতঃ এই বাঙালী পল্টনের দ্বারাই। এ যুদ্ধগুলিতে বাঙালী পল্টনের সিপাহীরা বিশেষ বিক্রম ও শৌর্য দেখায়। উপরে কর্তৃপদে ইংরেজ থাকলেও বিভিন্ন গুর্খা ও শিখ যুদ্ধে এই সিপাহীদের দ্বারাই তারা গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত ও নাজেহাল হয় আর এই কারণেই অদৃশ্য ইংরেজের চেয়ে বাঙালী পল্টনকেই তারা সাক্ষাৎ শত্রু বলে ভাবতে সুরু করল।

ডালহৌসী এতাদৃশ বাঙালী পল্টনের মর্যাদা স্বীকারে যেমন অরাজী ছিলেন, এর উপর একান্ত নির্ভর করে থাকতেও তাঁর মন তেমনি সায়

দিল না। তিনি ১৮৫৬ সালে নিয়ম করলেন—যারা বিনা আপত্তিতে কোম্পানির আদেশ পালন করবে এমন লোককেই বাঙালী পল্টনে নেওয়া হবে, আর শিখ ও গুর্খাদেরও ইতিমধ্যে সৈন্যদলে নেওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। বাঙালী পল্টনের সিপাহীরা এতে প্রমাদ গণলেন। দেশ ও সমাজের সঙ্গে তাদের যোগ ঘনিষ্ঠ। কাজেই একথা আগ্রা অযোধ্যা ও বিহারেও রাষ্ট্র হতে বিলম্ব হ'ল না। রাজ্যচ্যুত অযোধ্যার নবাব ও ঝাঁসীর রাণীর দেশ বহু সিপাহীর জন্মভূমি ছিল। পেশোয়ার পোষ্যপুত্র নানা সাহেবও বিঠোরের বাসিন্দা হয়েছেন। ডালহৌসী তাঁর ভাতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই নানা সাহেব সিপাহী যুদ্ধের একজন প্রধান নেতা, প্রধানতম বললেও অত্যুক্তি হয় না। যুদ্ধের মধ্যেই তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁকে ধরবার জন্য ব্রিটিশেরা কত রকম চেষ্টাই না করেছিল! এই বীর সেনাপতির আসল নাম নানা ফাড়নীশ বা ফাড়নবীশ। দেখি সিপাহীযুদ্ধের সতের বৎসর পরেও ইংরেজরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদপত্রে পড়েছি নানা সাহেব সন্দেহে অন্ততঃ সতের জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ইংরেজ জেলে পুরেছে! ইংরেজের নিকট নানা সাহেব ছিলেন তখন 'জুজু'!

সিপাহী যুদ্ধে যে সব নেতা অপূর্ব বিক্রম ও শৌর্য দেখিয়েছিলেন নানা সাহেবের মত বিহারের কুঁয়ার সিং, উত্তর প্রদেশের তাঁতিয়া তোপী এবং ঝাঁসীর রাণীর কথা সকলের আগে আমাদের মনে আসে। এই ঝাঁসীর রাণীর একজন যোদ্ধা আত্মীয়া ছিলেন গঙ্গাবাঈ—যিনি পরে মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী নামে পরিচিতি লাভ করেন। নেপাল থেকে ফিরে এসে গঙ্গাবাঈ কলকাতায় এই শতকের গোড়ার দিকে বিখ্যাত মহাকালী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনশ্রুতি, নানা সাহেবও নেপালে গিয়েই ইংরেজের বজ্রমুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। এখানে এ সব কথা একটু বলে রাখাই ভাল।

বড়লাট ডালহৌসীর রাজ্য-গ্রাস নীতির ফলে রাজ্যচ্যুত নৃপতিদের উষ্মা এবং ক্ষোভের অন্ত-অবধি ছিল না। চিরাচরিত হিন্দু রীতি অনুসারে অপুত্রক ব্যক্তিদের পোষ্যপুত্র গ্রহণের যে বিধি ছিল দেশের রাজন্যবর্গকে তা থেকেও বঞ্চিত করা হয়। প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশের কর্তৃত্ব প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা এদের তখন ব্যক্তিগত ভাবে কারো ছিল না। তাঁরা জোট বাঁধার

অপেক্ষায় ছিলেন। ওদিকে ডালহৌসী বাঙালী পল্টন সংস্কারকল্পে যে সব নীতি অনুসরণে লিপ্ত হন তাতে করে উত্তরাঞ্চল হতে সংগৃহীত সাধারণ সেনা বাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ বাড়তে লাগল। সিপাহীদের অন্ন মারা যাবার উপক্রম হওয়ায় তাদের অসন্তোষ ক্রমে রোষবহ্নিতে পরিণত হ'ল। রাজ্যচ্যুত অপদস্থ রাজন্যদের সঙ্গে এই সব সাধারণ সেনানীর সহজেই সংযোগ সাধিত হয়। তাই বলা যায়, ক্ষেত্র আগেই প্রস্তুত ছিল, টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি-সংযোগের কাহিনী—সে উপলক্ষ মাত্র।

ডালহৌসীর ভারত-ত্যাগের বৎসর খানেকের পরেই বিদ্রোহ শুরু হয়। তাঁর শাসন-নীতিই যে প্রত্যক্ষভাবে এর জন্য দায়ী, এ কথা বললেও অযৌক্তিক হয় না। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। আমরা পূর্বে দেখেছি এই দশকের প্রথম দিকে পাদ্রি লঙ্ দিল্লীতে উর্দু গ্রন্থ ও গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির খোঁজ করতে গিয়ে মুসলমানদের ভিতরে ভয়ানক ব্রিটিশ বিদ্বেষ লক্ষ্য করেছিলেন। এর নানা কারণও ছিল। মুসলমানদের হাত থেকে ব্রিটিশের প্রভুত্ব গ্রহণ ও বিস্তার মোটামুটি ভাবে তারা সহ্য করতে পারেনি। এর সঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ কারণ জুটলো বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের প্রতি কোম্পানির দুর্ব্যবহার। বাদশাহ্ যতই অকর্মণ্য এবং কুক্রিয়াসক্ত হোন না কেন তিনি তাদের বাদশাহ্ তো বটেন! সিপাহী যুদ্ধের হিন্দু নায়কগণও তাঁকেই তাদের প্রধান বলে ঘোষণা করেছিলেন। মুসলমানেরা দলে দলে সিপাহীদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। ব্রিটিশেরা একারণ মুসলমানদেরই তাদের প্রধান শত্রু বলে গণ্য করে। এই মুসলমানদের ব্রিটিশ বিদ্বেষ উগ্রপন্থী ওহাবীদের কাজে খুবই মদত জোগায়।

এ সময়কার সিপাহী ও ব্রিটিশ পক্ষের অনাচার অত্যাচার আজ ইতিহাসের বস্তু। কিন্তু এর পরে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট যে-সব নীতি অনুসরণ করলেন তা একদিকে যেমনি হ'ল সুদূর প্রসারী, অন্যদিকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ-বৈষম্য স্পষ্ট রূপ নিল। কর্মে ও লক্ষ্যে এরা ক্রমে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ল। এর সূচনা আমরা কয়েক বছর পূর্বে বেথুন সাহেবের বিচার-বৈষম্য নিবারণ আইনগুলির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সমাজের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আন্দোলন চরমে ওঠে। বাঙলায় ব্যাপক জঙ্গী আইন

প্রবর্তন ও বাঙালীকে নিরস্ত্রীকরণের জন্য জিদ, বিদ্রোহীদের উপর ব্রিটিশ সেনানী যে সব অত্যাচার করে ও যে ভাবে তাদের গ্রাম ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিতে শুরু করে তার সমর্থন—এ সব কারণে ইউরোপীয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। তাদের ভারতীয় বিদ্বেষ এত বেড়ে গেল যে, নূতন বিধিবদ্ধ প্রেস আইন অনুযায়ী 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াকেও' গভর্ণমেণ্ট জাতি বিদ্বেষ প্রচারের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন ও সম্পাদককে এই প্রথম অপরাধের জন্য দণ্ডদান না করে সতর্ক করে দিলেন, একথা পূর্বেই বলেছি।

সিপাহী বিদ্রোহের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বড়লাট ক্যানিং এক বছরের জন্য প্রেস আইন ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেন। তিনি ইউরোপীয়দের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, এ জন্য তারা তাঁর উপরে অগ্নিশর্মা হ'ল ও সভা করে তাঁকে বিলাতে ফিরিয়ে নেবার জন্য পার্লামেণ্টে দরখাস্ত করতেও কসুর করল না। একদিকে ইউরোপীয় সমাজ যখন তাঁর উপর খড়্গ হস্ত, এবং ভারতীয়েরা ভয়বিহ্বল, তখন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে' সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ক্যানিং-এর উদার নীতির সমর্থন করেন ও যারা জিঘাংসাবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমগ্র ভারতীয়দের উপর কঠোর আইন প্রয়োগের দাবি জানাচ্ছিল তাদের ঘোর প্রতিবাদ করতে থাকেন।

প্রথম প্রথম ক্যানিং অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে কেহ কেহ দ্বিধাগ্রস্ত হলেও—যেমন প্রাক্তন বড়লাট লর্ড এলেনবরার বেলায় দেখেছি—বিলাতের মন্ত্রীসভা একে পুরাপুরি সমর্থন জানালেন। তাঁরা সিপাহী-বিদ্রোহের ভিতরেই পার্লামেণ্টে আইন পাস করিয়ে (১৮৫৮, ২ আগস্ট) নিয়ে নিজেরা ভারত শাসনভার গ্রহণ করলেন। পরবর্তী ১ নভেম্বর রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘোষণায় জানিয়ে দিলেন যে, ভারতবাসীদের ধর্মের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং রাজসরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োজিত করা হবে। এ ঘোষণার দ্বারা একদিকে যেমন নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা-পূরণের চেষ্টা হ'ল অন্যদিকে তেমনি অগণিত জনসাধারণের ধর্মপ্রবণতাও মেনে নেওয়া হ'ল।

মহারাণীর ঘোষণায় আর একটি বিষয় স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হ'ল। আগেই

আভাস দিয়েছি সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম প্রত্যক্ষ কারণ—কারণে অকারণে লর্ড ডালহৌসী প্রবর্তিত নীতি অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলির ব্রিটিশ-এলাকাভুক্তি। এরপর এই নীতি একেবারে বর্জন করাই সাব্যস্ত হ'ল। দেশীয় রাজন্যবর্গও সুতরাং এই ঘোষণায় খুবই আশ্বস্ত হলেন। সিপাহী যুদ্ধের পর আর কোন দেশীয় রাজ্যকেই একেবারে ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত করা হয় নি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কুশাসন ও ষড়যন্ত্রের দরুন বহু রাজন্যকে গদিচ্যুত করেছেন, কিন্তু রাজ্য গ্রাস না করে তাঁদের বংশধর বা কোন নিকট আত্মীয়কে গদিতে বসিয়েছেন। এই নীতির ফলে যে একটি বিসদৃশ ব্যাপারের উদ্ভব হয়েছে তার কথাও এখানে একটু বলি।

ভারতবর্ষে ছোটবড় বহুশত দেশীয় রাজ্য ছিল। কাশ্মীর মহীশূর হায়দ্রাবাদের মত বড় রাজ্য, আর পাঁচ শ' হাজার একর পরিমিত পল্লী নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্যও এখানে ছিল। এসব রাজ্যের অধিকাংশেরই গঠনতন্ত্র, শাসনপ্রণালী, শিক্ষাপদ্ধতি সেকেলে ধরনের। ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীরা যখন জ্ঞানবিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হয়ে বর্তমানের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলছিলেন তখন পার্শ্ববর্তী অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের লোকেরা মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার মধ্যেই বর্ধিত হয়। এর ফলে এক ভারতবর্ষের ভিতরেই দু'রকম—একটি অত্যগ্রসর আর একটি অনগ্রসর—ভারতের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের ঐক্যবদ্ধ শাসনের পক্ষে এ এক ভীষণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষীয় সভা বোর্ড অব কন্ট্রোল তুলে দেওয়ার কথা পূর্বেই বলেছিলেন। নূতন বিধিবদ্ধ আইনে বোর্ড অব কন্ট্রোল একেবারে তুলে নেওয়া হয়। এ সময় সেক্রেটারি অব স্টেট বা ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি হ'ল। স্থির হ'ল তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভারও একজন মন্ত্রী হবেন এবং পনের জন অতিরিক্ত সদস্য নিয়ে গঠিত ইণ্ডিয়া কৌন্সিল নামক পরামর্শদাতৃ সভারও কর্তা থাকবেন। আর ভারতবর্ষের বড়লাট ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসন-কার্য পরিচালনা করবেন। এরপর ভারত সচিব ও বড়লাটের ক্ষমতা খুবই বেড়ে গেল।

সিপাহীযুদ্ধ কিন্তু শাসনযন্ত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন সাধন করল। একটি কোম্পানির হাত থেকে ভারত-শাসন ও সংরক্ষণ কার্য ইংলণ্ডেশ্বরের নামে

সমগ্র ব্রিটিশ জাতির হাতে গিয়ে পুরাপুরি পড়ল। গ্লাডস্টোনের আমল পর্যন্ত বিলাতে এ একটি দলীয় প্রশ্ন রইলেও ক্রমে ক্রমে ভারত শাসন সমগ্র জাতিরই দায়িত্ব হয়ে ওঠে। দশজনের কাজ বলে ভারত সচিব ও ভাইসরয়ের উপর ভারত শাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে পার্লামেণ্ট নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন। অর্থাৎ অবস্থা হ'ল—না ঘরকা না ঘাটকা। এই জন্যই ভারতবর্ষ সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বাৎসরিক আলোচনার দিনে কোরাম বা সিদ্ধ সংখ্যার অভাবে অধিবেশন বন্ধ করে দেবার উপক্রম হত।

প্রবাসী ও বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ আগে কোম্পানির আমলে ভারত সরকারকে যেমন আলাদা করে ভাবত, এর পর থেকে তার আর প্রয়োজন রইল না। ভারতবর্ষ সমগ্র ইংরেজ জাতির সম্পত্তি, সুতরাং তাদেরও সম্পত্তি বলে তারা বিবেচনা করতেন। ভারত-শাসনের সঙ্গে তারা নিজেদের বিশেষভাবে জড়িয়ে ফেল্‌ল। গভর্ণমেণ্টও এতদিন তাদের কতকটা ভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখতেন এবং ভারতীয় ও ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে ব্যবহার-সাম্য-স্থাপনে মধ্যে মধ্যে প্রয়াস পেতেন। অতঃপর শাসকগোষ্ঠী ও বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের দায়িত্ব একই স্তরে উন্নীত বা অবনমিত হ'ল। তাদের উভয়েরই চক্ষে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী একটি স্বতন্ত্র বস্তু বলে প্রতিভাত হতে লাগল। শুধু নীতির জন্যই ইংরেজ শাসকবর্গ একেবারে বে-সরকারী ইউরোপীয়দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল বললে ভুল হবে, আত্মরক্ষার প্রাথমিক তাগিদেও তারা এরূপ হতে হয়তো উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

ইংরেজ ব্যবসায় স্বার্থ দেশে ইতিপূর্বে প্রবল হয়ে উঠেছে। শহরে মফস্বলে প্রচুর ইংরেজ বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। তাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্তৃপক্ষ দেশরক্ষা ও দেশ শাসনে তাঁদের সহযোগিতা পূর্ণভাবে আদায় করলেন। ইউরোপীয় স্বার্থ বজায় রাখতে তাঁরা যতখানি আগ্রহ প্রকাশ করল ঠিক ততখানি মনে হয় তাঁরা ভারতীয়দের দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দুই একটি বিষয় উল্লেখ করলে বক্তব্য আরো পরিষ্কার হবে। নীলকরদের কথা বিভিন্ন স্থলে ইতিপূর্বে আমরা জানতে পেয়েছি। মফস্বলে তাদের আধিপত্য ও উপদ্রব প্রশাসনিক কারণে অনেকটা বেড়ে যায়।

সিপাহী যুদ্ধ শেষে কর্তৃপক্ষ ক্রমে এমন সব বিধি চালু করলেন যাতে তাদের ক্ষমতাও অত্যধিক বেড়ে গেল। এর ঘাত প্রতিঘাত কি ইউরোপীয় কি স্বদেশীয় উভয় সমাজের উপর কিরূপ ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা আমরা পরে দেখতে পাব। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনারও আবশ্যকতা রয়েছে। এই দশকে যেমন নীল ব্যবসায় সম্পর্কে ইউরোপীয়দের সুযোগ সুবিধাদানের ব্যবস্থা করলেন কর্তৃপক্ষ, সেই রকম পরবর্তী দুই তিন দশকের মধ্যে চা শিল্প, পাট শিল্প ও অন্যবিধ শিল্পাদির ক্ষেত্রেও ইউরোপীয়েরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভ করে। আর এর দরুন ভারতবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বেশ আলোড়ন উপস্থিত হয়। এই আলোড়ন আমাদের জাতীয়তামূলক রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ সব কথাও পরে আলোচ্য।

ইংরেজ ভারত শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে নিলে, কোন একটি বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর হাতে এ আর রইল না। ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশের সামরিক নীতিও দ্রুত বদলাতে শুরু হ'ল। ডালহৌসীর অনুসৃত নীতি বিদ্রোহকালে বেশ কাজে এসেছিল। তার আমলে নবগঠিত শিখ ও গুর্খা বাহিনী সিপাহী যুদ্ধকালে সরকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আগেই বলেছি, শিখ ও গুর্খারা ইংরেজের পরিবর্তে স্বদেশবাসী হিন্দুস্থানী সিপাহীদের শত্রু বলে বেশী গণ্য করত। লর্ড ডালহৌসী বিলাতে বসেই বিদ্রোহের প্রাক্কালে লিখেছিলেন, "হিন্দুস্থানী সিপাহীদের বিরুদ্ধে শিখ ও গুর্খারা বিশ্বস্তভাবে 'শয়তানের' (devils) মতই লড়বে।" সেনাপতি ম্যানস্‌ফিল্ড বলেন, "শিখরা যে সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না করে আমাদের পক্ষ নিয়ে লড়েছে তার কারণ এ নয় যে, তারা আমাদের খুব প্রীতির চক্ষে দেখে; তার কারণ এই যে, তারা বাঙালী পল্টনকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে"। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সার জন লরেন্স ছিলেন পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার। নিজ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেছেন, "নিঃসংশয়ে বলতে পারি, বাঙালী পল্টনের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐকমত্য আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর হয়েছে। এই ত্রুটির (?) সংশোধন করতে হলে পল্টন প্রথমতঃ ইউরোপীয় সৈন্য ও দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন জাত থেকে সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা ভর্তি করতে হবে।"

লরেন্স এখানে বাঙালী পল্টনের যে ত্রুটি দু'টির কথা উল্লেখ করেছিলেন,

তাই জোগাতো বস্তুতপক্ষে এর প্রাণশক্তি। ঐকমত্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে সত্য-সত্যই বাঙালী পল্টন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ডালহৌসীর মত কূটবুদ্ধি কর্ণধার এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাই এর চেহারা পাল্টে দেওয়ার জন্য তাঁর ছিল অত আকৃতি। সিপাহী যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার যে সামরিক নীতি অনুসরণ করলেন তাতে বাঙালী পল্টনের অস্তিত্বই এক রকম রইল না। যুদ্ধের প্রারম্ভে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষীয় সভার সাধারণ অধিবেশনে বাঙালী পল্টন তথা দেশীয় সামরিক বাহিনীর সংস্কার ও সংশোধন কল্পে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতার কথা অত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, পল্টন ভেঙ্গে দিয়ে সামরিক বাহিনীর আমূল পরিবর্তন করার ফলে দক্ষিণারঞ্জনের অমন কার্যকরী প্রস্তাব আর গ্রহণের অবকাশ রইল না। কর্তৃপক্ষ এরপর থেকে শিখ, গুর্খা, মুসলমান, পাহাড়ী, জাঠ, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দিয়ে সৈন্য-দল পূর্ণ করলেন। ব্রিটিশ সৈন্যও অধিক সংখ্যায় ভারতে স্থিত হ'ল এর পর থেকে।

কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী থেকে সৈন্য সংগ্রহ করায় একদিকে সামগ্রিকভাবে ভারতবাসী যেমন যুদ্ধ বিদ্যায় অজ্ঞ থেকে গেল, অন্য দিকে বিভিন্ন সময় আইন বলে তাদের নিরস্ত্র করে রাখারও ব্যবস্থা হ'ল। ১৮৭৯ সনে সার রিচার্ড টেম্পল বোম্বাই-এর গভর্ণর ছিলেন। তিনি তখন বলেন "ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীদের পূর্বেকার যুদ্ধ করার ক্ষমতা হ্রাস পেতে পেতে এখন একেবারে শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে। আর এ ব্যাপারটি আমাদের শাসনের একটি প্রধান রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত। সরকার এ বিষয়ে এতই সচেতন রয়েছেন যে, পঁচিশ বৎসরের অনুসৃত নীতির ফলেই ভারতবাসীরা সাধারণভাবে নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে।" ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন অধিবেশনে বহু নেতা ভারতবাসীদের এই সামরিক শক্তি লোপের কথা উল্লেখ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই সকল নেতাদের মধ্যে এমন অনেককে দেখি যাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন যোদ্ধ শ্রেণীভুক্ত।

বিদ্রোহ বা যুদ্ধ উত্তর ও মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়লেও আগ্রা-অযোধ্যাই ছিল এর প্রধান লীলাক্ষেত্র। বিদ্রোহী সিপাহীদের ও ব্রিটিশ বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের ফলে ও-অঞ্চল একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বিদ্রোহ

প্রশমিত হ'ল বটে, কিন্তু অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। এ সময়ে একজন বাঙালী তাঁদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করলেন। ডিরোজিও-শিষ্যদলের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে আমরা একজন উগ্র রাজনীতিক বলেই জানি। কিন্তু সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালীর রাজনৈতিক উগ্রতাও একটা গণ্ডীর মধ্যেই প্রকাশ পেত। ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কের ছেদ হোক, এ তারা চাইত না। দক্ষিণারঞ্জনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মতবাদের উগ্রতাও কেটে গেছে। পাদ্রি আলেকজেণ্ডার ডাফের পরামর্শে লর্ড ক্যানিং দক্ষিণারঞ্জনকে রায়বেরিলির অন্তর্গত বাজেয়াপ্ত তালুক শঙ্করপুরের স্বত্ব দিয়ে আগ্রা অযোধ্যায় প্রেরণ করলেন। ঐ প্রদেশের বাজেয়াপ্ত তালুকগুলি বুঝে বুঝে 'রাজভক্ত' লোকদের স্থায়ীভাবে দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণারঞ্জন তালুকদারদের সংঘবদ্ধ করে ১৮৬১ সনের নভেম্বরে লখ্‌নৌ শহরে, আউধ বা অযোধ্যা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। এসোসিয়েশনের মুখপত্র স্বরূপ 'সমাচার হিন্দুস্থান' নামে ইংরেজী ও 'ভারত পত্রিকা' নামে হিন্দুস্থানী সংবাদপত্রও প্রকাশিত হ'ল। বিধ্বস্ত অযোধ্যার পুনর্গঠনে দক্ষিণারঞ্জনের কৃতিত্ব সামান্য নয়। তিনি পনের বছরের অধিককাল সেখানে বাস করেন এবং নানা জনহিতকর কার্যে ব্রতী হন। ও-অঞ্চলের রাজনীতি চর্চারও মূলাধার ছিলেন তিনি। তাঁর কর্মশক্তি নিয়োজিত না হলে এই দেশের দৈন্যদশা ঘুচতে আরও বহুকাল হয়তো চলে যেত।

পূর্বেই বলেছি সিপাহী যুদ্ধকালে সিপাহীরা যে রকম নৃশংস হয়ে উঠেছিল, তাদের দমনে সরকার পক্ষও তার শতগুণ বেশী নৃশংস হয়ে ওঠে। বারাণসী থেকে আগ্রা পর্যন্ত দু'ধারের মানুষ, ঘরবাড়ি, খেতখামার অত্যাচারের ফলে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াতে পঞ্চাশ ষাট বৎসর কেটে গিয়েছিল। তারা যেন পুনরায় নবজীবন লাভ করল। নবোদ্ভূত এবং নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এর পর থেকে। পরবর্তীকালে আমরা যে উপাধ্যায়, চতুর্বেদী, তেওয়ারী, ত্রিপাঠী, দুবে, পন্থ, প্যাণ্ডে, শুকুল, সিংহ প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই তারা এই নূতন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে উত্তর ভারতে প্রভাবশালী

আর এক শ্রেণীর মানুষের আবির্ভাব ঘটে যারা এই সময়ে উত্তর প্রদেশে নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন। এদের মধ্যে কুঞ্জরু, নেহরু, সাপ্রু, মালবীয়া প্রভৃতির কথা আমাদের স্বতঃই স্মরণ হয়। বিধ্বস্ত উত্তর ও মধ্য ভারত যে পরে ভারতবর্ষে নেতৃপদ লাভ করে তার মূলে গত সাত আট দশকে নবজন্মপ্রাপ্ত এই মনুষ্য গোষ্ঠী।

সমগ্র উত্তর ভারতে ১৮৬০-৬১ সালে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এর নানা কারণই অনুমিত হয়েছে। কিন্তু বলবত্তর কারণ দু'তিন বৎসর পূর্ববর্তী সিপাহী যুদ্ধ। দেশের প্রজাকুল তখন ভীতি-বিহ্বল, সন্ত্রস্ত। এর এক বৃহৎ অংশ যারা এতদিন ছিল চাষ আবাদ খেত খামারের কাজে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত তাদেরও অনেকে তখন কর্তৃপক্ষের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। কাজেই উক্ত মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের জন্য অনেকেই সিপাহী যুদ্ধের পরবর্তী ইংরেজের নৃশংসতম কার্য-কলাপকেই দায়ী করেছেন। এই দুর্ভিক্ষ শাপে বর হ'ল। কেমন করে তা একটু পরে বলছি।

ব্রিটিশের আমলে ভারতবাসী কতকগুলি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখে পড়ে। প্রথমেই মনে আসে কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা। তারপর আরও কতকগুলি দুর্ভিক্ষ পর পর ঘটে। তাদের মধ্যে প্রধান হ'ল ১৮০৩ সালে বোম্বাইয়ের এবং ১৮৩৭ সনে মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ। তখনও ভারতবাসীর পক্ষে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হয় নি। এইটি আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করি উক্ত ১৮৬০-৬১ সালের দুর্ভিক্ষকালে। শিক্ষিত ভারতবাসীর জাতীয়তা-বোধ এতদিন কর্মে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায় নি। এবারে তা যেন দুকূল উপচে পড়ল। দুর্ভিক্ষজনিত দুঃখ ক্লেশ ভারতবাসীদের একভ্রাতৃত্ব ও একজাতীয়ত্ব-বোধে অনুপ্রাণিত করতে লাগল। সিপাহী যুদ্ধের পর সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ এমনি একান্তভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হ'ল যে, এর প্রতিক্রিয়া ভারতীয় মনে উপস্থিত হতে অধিক বিলম্ব হ'ল না। সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী বাঙলাদেশের নীল বিদ্রোহের মধ্যে এই বিষয়টি বিশেষভাবে ধরা পড়ল। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ কথা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে চাই।

ভারতবর্ষীয় সভার গঠনমূলক কার্যকলাপের কথা ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি। এই সভা এ সময়ে নব্য শিক্ষিত ভারতবাসীর মুখপাত্র স্বরূপ একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য করতে থাকে। এর কর্মপদ্ধতি পূর্ববৎই রয়ে গেল। বিবিধ সমস্যা, আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রস্তাবিত আইন কানুন প্রভৃতি সম্বন্ধে সভার দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট মতামত ক্রমশঃ ব্যক্ত হতে লাগল। এই সভা কোন একটি বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মুখপাত্র না হয়ে বরাবর সমগ্র জাতির পক্ষেই আলাপ-আলোচনা-আন্দোলন করতে রত হয়। ১৮৬১ সন পর্যন্ত সভার প্রধান মুখপত্ররূপে আমরা পাই 'হিন্দু পেট্রিয়টকে'। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সংবাদপত্রখানিকে তখন জাতির সর্ববিধ কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার মুখপত্র করে তোলেন। ১৮৬০ সনের পূর্ব থেকেই এবং বিশেষ করে এই বৎসর নীল আন্দোলন কালে এ পত্রিকাখানি যে সাধারণ প্রজাকুলের পক্ষে বিশেষভাবে দাঁড়িয়েছিল তা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব।

ভারতবর্ষীয় সভা সমস্ত দশক ব্যাপী যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন শুরু করে দেন পরবর্তী দশকের গোড়াতেই তার কতকগুলি অন্তত কার্যকর হতে দেখি। সভার অনেকগুলি গঠনমূলক প্রস্তাব ছিল। তার মধ্যে মূল প্রস্তাব—ভারতীয় আইন সভায় ভারতবাসী গ্রহণ। পরবর্তী দশকে যে শাসন সংস্কার বিধি প্রবর্তিত হ'ল তাতে এই মৌল দাবি স্বীকৃত হয়। পরে আমরা এ সম্বন্ধে বেশী করে জানতে পারব। কলকাতার সুপ্রিম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত এ দশকের প্রথমেই সম্মিলিত হয়ে হাইকোর্টে রূপান্তরিত হ'ল। পূর্বেই বলেছি, প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ ভারতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন সংস্কারান্তর বিধিবদ্ধ করার পক্ষে চেষ্টা চলছিল। এ জন্য ল' কমিশনও এ দেশে গঠিত হয়। বিলাতে বসে এ দুইটি অত্যাবশ্যক বিধির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হ'ল। আর ঐ দশকের প্রথমেই দেখি এখানে এই দুইটি বিধি বলবৎ হয়ে যায়। বিবিধ অত্যাবশ্যক বিষয়ে সভার উদ্যোগ এইরূপে সাফল্যমণ্ডিত হতে দেখি। দেশের গুণী মানী সুধী সজ্জন অনেকেই এর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হতে থাকেন। এমন কি এর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালের মুসলমান নেতা স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খানও আগ্রায় ঐ দশকের মাঝামাঝি একটি শাখা সভা স্থাপন করেছিলেন। তবে এ কিঞ্চিৎ পরের কথা।

'হিন্দু পেট্রিয়টে' হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভারতবাসীর কল্যাণমূলক যাবতীয় প্রযত্নের আন্তরিকভাবে সপক্ষতা করেন। কাজেই শুধু একজন প্রধান সদস্য হিসেবেই নয়, পেট্রিয়টের সম্পাদক রূপেও ভারতবর্ষীয় সভার সপক্ষে অবিরত লেখনী পরিচালনা করতেন। এই সভায় সহকারী সম্পাদক রূপে কৃষ্ণদাস পাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যোগদান করেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর (১৮৬২) পর কৃষ্ণদাস ক্রমে পেট্রিয়টের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। সম্পাদকরূপে তিনি পেট্রিয়টকে ভারতবর্ষীয় সভার মুখপত্র করে তোলেন। তিনি অল্পকাল পরেই সভার সম্পাদকও হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাসের রাজনীতি জ্ঞান ছিল অনন্যসাধারণ। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে কৃষ্ণদাস পালকে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন। সিপাহী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশের অনুসৃত নব নব প্রশাসন নীতি অহরহ বিশ্লেষণ করে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' কৃষ্ণদাস পাল এবং 'সোমপ্রকাশে' দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে স্বদেশবাসীকে সজাগ করে দেন।

সিপাহী যুদ্ধের নায়কেরা ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শক্তি উচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। এ কিন্তু তখনকার দিনের নব্য শিক্ষিত ভারতবাসী সমর্থন করতে পারেন নি, বরং দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যত বিরোধিতাই করেছিলেন। তথাপি এই যুদ্ধে লিপ্ত সেনানী এবং সেনানায়কদের বীরত্বে ও সাহসিকতায় ভারতীয়েরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। হয়তো নির্জনে একে কেহ কেহ স্বাগতও করেছিলেন। কিন্তু এ শুধু অনুমান মাত্র। তবে এই ধরনের বীরত্ব ও সাহসিকতাকে ভিন্নভাবে প্রশস্তি করতে দেখি এ সময়কার একখানি কাব্যে, যাকে আমরা মহাকাব্যও বলতে পারি।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর অমর কাব্য মেঘনাদ বধ ১৮৬০ সালের মধ্যেই লিখে শেষ করেন। মেঘনাদ বধ কাব্য বাঙালীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করেছিল। শিক্ষিত-মন তখন হয়তো এত অসাড় হয়ে পড়েনি, তাই সিপাহী যুদ্ধের মধ্যে ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের বীরত্বও উপলব্ধি করতে পারত। রাবণ সন্তান রাক্ষস-বীর ইন্দ্রজিৎকেই মধুসূদন করলেন কাব্যের নায়ক। সিপাহীযুদ্ধের দ্বারা মধুসূদন কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন সেটা আজ অনুমানের বিষয়।

জন-অভ্যুত্থান ঃ নীল বিদ্রোহের কথা

সিপাহী যুদ্ধ শেষ হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যেই আর একটি ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাঙলা দেশই ছিল এই আন্দোলনের পীঠস্থান। বাঙলা দেশ বলছি,—ঐ সময়ে কিন্তু বাঙলা দেশ ইংরেজীতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী নামে অভিহিত হত। এর কিছু কারণও ছিল। এ যুগে বাঙলা সমেত বিহার উড়িষ্যা এবং আসাম বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বা বঙ্গ প্রদেশ নামে আখ্যাত হত। এর বাঙলা অংশটুকুকে বলা হত নিম্ন বঙ্গ বা ইংরেজীতে লোয়ার প্রভিন্সেস্ অব বেঙ্গল। আমি এখানে যে বিষয়ের কথা বলছি তা বিশেষ করে এই নিম্ন বঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আজকাল সংগ্রাম কথাটির বড় চল। সংগ্রাম বলতে আমরা সেকালে বুঝতাম যুদ্ধ। যুদ্ধ কখনও অহিংস হয় না, সবটাই সহিংস যুদ্ধ। কেন কথায় কথায় এখন আন্দোলন মাত্রকেই সংগ্রাম বলে আখ্যাত করা হয়, জানি না। হয়তো যুগ পাল্টে গেছে। এখন অহিংসার পরিবর্তে হিংসাই শ্রেণী বিশেষের, শ্রেণী বিশেষই বা বলি কেন, এদের কর্তাব্যক্তিদের মনকে ষোল আনা জুড়ে বসেছে। রাজনীতি বলুন, অর্থনীতি বলুন, শ্রমিক সমস্যাই বলুন, শিক্ষা ব্যাপারই বলুন—সকল ক্ষেত্রেই সংগ্রাম বা হিংসাশ্রয়ী সংগ্রামী মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যারা কথায় কথায় সংগ্রাম শব্দটি ব্যবহার করেন তারা এর ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে একবার ভেবে দেখেছেন কি? আগের কালে আমরা অহিংস সহিংস সকল রকম বিরোধকেই "আন্দোলন" নামে অভিহিত করতাম। যেমন, বিপ্লবী আন্দোলন ইত্যাদি। অবশ্য যারা অহরহ সংগ্রাম কথাটি প্রয়োগ করেন তারা হয়তো এই রকম অবস্থাই বোঝাতে চান। যাক সে কথা, এখন আসল বিষয়ে আসি।

সিপাহী যুদ্ধ শেষে বঙ্গদেশে অর্থাৎ নিম্নবঙ্গে নীল চাষীদের মধ্যে ঘোরতর আলোড়ন উপস্থিত হয়। এখানকার কয়েকটি জেলায়, যেমন, বারাসাত, যশোহর (খুলনা তখন এর অন্তর্ভুক্ত), ফরিদপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, রংপুর, মালদহ প্রভৃতি স্থলে প্রচুর নীল চাষ হত। নীল চাষ এখানে

প্রবর্তিত হয় বহু পূর্বে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে। বিখ্যাত পাদ্রী উইলিয়ম কেরী বাঙলা দেশে মালদহের মদনাবতী নীল কুঠিতে সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট-এর চাকরি নিয়ে যান এই শতাব্দীরই শেষ দশকে। নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে সম্পর্ক যে ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে উঠছিল তা ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের বড়লাট মিণ্টোর একটি আদেশলিপি থেকে জানা যায়। তখন এদেশে বেসরকারী ইউরোপীয়দের লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র নিয়ে আসতে হত। তারা ইচ্ছামত কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারত সন্দেহ নেই, কিন্তু গর্হিত কিছু করে বসলে লাইসেন্স বাতিল হওয়ারও বিধি ছিল। উপরোক্ত ১৮১০ সনে দেখি নীল চাষীদের উপর অত্যাচারের প্রমাণ বলে অন্তত চার জন নীলকরের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৮২০-এর দশকেও নিরীহ নীলচাষীদের উপর লাইসেন্স প্রাপ্ত ইউরোপীয় নীলকরদের নানারকম অত্যাচারের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন জারি করে তখনকার সরকার নীলের চুক্তিভঙ্গকে ফৌজদারীতে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করলেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, নীল চাষ ও ব্যবসায়ের দরুন স্থানীয় লোকেদেরও আর্থিক দিক থেকে প্রথম প্রথম কতকটা উন্নতি দৃষ্ট হয়। রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের উক্তিই এর সাক্ষ্য, পূর্বে এ কথা বলেছি।

দিনকাল শীঘ্রই বদলে গেল। ১৮৩৩ সনের সনন্দে ইউরোপীয়েরা এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার পেল। ভূমি ক্রয় বিক্রয় নূতন নূতন কাজ কারবার স্থাপন নীল চাষের প্রসার প্রভৃতির দিকে শ্বেতাঙ্গেরা সত্বর নজর দিল। এতে দেশবাসী জনগণের বিশেষ কোন অসুবিধা হত না যদি ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের জন্য একই রকম বিচার আদালত মফস্বলে স্থাপিত হত। কিছু পরে দেওয়ানী আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার অধিকার সাব্যস্ত হলেও ফৌজদারীতে দণ্ডনীয় অপরাধের বিচার করার জন্য মফস্বলের বিচারালয়গুলিকে অধিকার দেওয়া হয়নি। এর জন্য কতই না অনাচারের উদ্ভব হয় তা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে কতকটা বিবৃত হয়েছে। আমরা এখানে নীল-কর ও নীলচাষীর মধ্যকার সম্পর্কের কথাই বিশেষ করে বলছি। নীলকরেরা নিরীহ দেশবাসীদের নীল চাষে প্রলুব্ধ, প্ররোচিত এবং বাধ্য করার জন্য কতই না ফন্দি ফিকির আঁটতো। এই প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ,

১৭৭২ শক) নীলকর-নীলচাষী সম্পর্কিত লেখার কিয়দংশ উদ্ধৃত করব। পত্রিকা লেখেন :

"নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ করিতে হইলে প্রজা পীড়নেরই বিবরণ লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাঁহাদের নীল ক্রয় করেন, এবং আপনার ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন। সরল স্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশাভঙ্গ. কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে এই উভয়ের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয়ই প্রজা-নাশের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে; নীলকর তাহাদিগকে বল দ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও নীল বীজ বপনার্থে তাহাদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন! দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প মূল্য ধার্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি স্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া দাদন স্বরূপে যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও হিসাবানাদি উপলক্ষে তাহারও কোন্ না অর্ধাংশ কর্তন যায়? এ কারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে অনায়াসে সম্বৎসরের পরিবার প্রতিপালন করিয়া কাল যাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে লাভ তার দূরে থাকুক, তাহাদিগকে দুশ্ছেদ্য ঋণজালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোনক্রমেই স্বেচ্ছানুসারে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ কৃষিকার্যই তাহাদের উপজীব্য; ভূমিই তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি এবং তাহারই উপর তাহাদের সমুদয় আশা ভরসা নির্ভর করে। কোন্ ব্যক্তি এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে? প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য? তাহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সভয়ে মনের বেদনা নিবেদন করুক বা অতীব কাতর হইয়া আর্তনাদ নিঃসরণ পুরঃসর তাহাদের পদানত হউক, কিছুতেই তাহাদের চিত্ত-ভূমি কারুণ্য রসে আর্দ্র হয় না। তাহারা এইরূপ ব্যবহার করিয়াও

আপনারদিগের নির্দয় জ্ঞান করেন না ;...দীন দুঃখী প্রজারা এ প্রকার পরুষ বাক্য শ্রবণ করিলে আর কি করিতে পারে ? তাহারদিগের স্বীয় ভূমিতেই অবশ্যই নীল বপন করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দেখিয়াও স্বহস্তে গরল পান করিতে হয়। এই ভূমির নাম খাতাই জমি—খাতাই জমির প্রসঙ্গ মাত্রে প্রজাদের শোকসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।”

এ হ'ল ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এর দশ বৎসরের মধ্যে নীলকে কেন্দ্র করেই নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে ভীষণ গোলযোগ শুরু হয়। একথা এখন বলব। তবে এই উপলক্ষে নিম্নবঙ্গে যে জন-অভ্যুত্থান ঘটে তাকে আমরা কি আমাদের জাতীয় তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে পারি ? এই প্রসঙ্গে অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পরে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত বিহারের চম্পারণ সত্যাগ্রহের কথা স্বতঃই আমাদের মনে আসে। একেও কি আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের অঙ্গ বলে ধরব ? আসল বক্তব্যে আসার পূর্বে এ বিষয়ে দু-চার কথা বলে নি।

স্বাধীনতা বলতে যদি আমরা জনগণের মুক্তিকেই বুঝি তা হলে, কি চম্পারণের সত্যাগ্রহ আন্দোলন, কি প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বেকার নীল-বিদ্রোহ—প্রভৃতির দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। জনগণের মুক্তি বুঝতে শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেও এ বিষয়টির কথা বিবেচ্য। বরং অর্থ নৈতিক ব্যাপারটির কথাই আমাদের বেশী করে মনে আসে। সাধারণ মানুষের প্রথম প্রয়োজন ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা। এর তাগিদেই অত পূর্বেকার নীল বিদ্রোহের উদ্ভব। আর তখন এ শুধু কোন শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মনুষ্য সাধারণের ভেতরই তা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দিক থেকে বলা যায় নীল বিদ্রোহের সঙ্গে পূর্বেকার সিপাহী যুদ্ধের মৌল প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। নীল বিদ্রোহ দমন কল্পে প্রশাসন বিভাগ এগিয়ে আসেন। তখন আর এ শুধু অর্থনীতি ঘটিত ব্যাপারই রইল না, ব্যাপকতর রাষ্ট্রীয় আকারও ধারণ করল। নীল বিদ্রোহ নিম্নবঙ্গের মত সমগ্র ভারতের তুলনায় একটি সামান্য অঞ্চলে ঘটলেও এর শক্তির উৎস ছিল গ্রাম এবং গ্রামের মানুষ। আর একটি কারণেও পূর্বেকার ঘটনা থেকে এর পার্থক্য লক্ষ্য করি এবং সেই কারণেই এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকবে। সিপাহীরা হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল। প্রবল

প্রতাপ ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখে তারা অল্প পরেই হীনবীর্য হয়ে পড়ে। কিন্তু নিম্ন-বঙ্গের সাধারণ মানুষ, এখানে সেখানে সামান্য রকমের দু চারটা ঘটনা ঘটলেও, মুখ্যত হিংসা বর্জন করেই চলেছিল। তাদের কার্যকলাপ দেখে বুঝতে পারি, বহু বৎসর পরে প্রবর্তিত নিরূপদ্রব প্রতিরোধ বা পরবর্তী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল ধারাই সেখানে অনুসৃত হয়। এ কারণ জন অভ্যুত্থানকে সামাল দেওয়া, শত চেষ্টা সত্ত্বেও, নীলকর বা শাসক শ্রেণীর পক্ষে অত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। নীল বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা কালে এই কথা কটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত নীলকরদের ছলা কলার প্রয়োগ সুন্দর ভাবে পরিব্যক্ত। ১৮৫০-৬০ এই দশ বৎসরের মধ্যে নীলকর নিপীড়নের কথা নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সরকারী ও বেসরকারী স্তরে বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকায় এর নানা রকম উল্লেখ দেখি। এই নিপীড়ন যে কতখানি কঠোর আকার ধারণ করে সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রদত্ত বিবরণ থেকে আমরা তা জানতে পারি। ওই দশকের মধ্যভাগ নাগাদ নীলকুঠি বিচার আদালতে পরিণত আর নীল গুদাম জেলখানায় রূপান্তরিত হয়েছে। নীলকরগণ প্রজাদের যথেচ্ছ বিচার করতে লাগল। কৃষ্ণনগর থেকে ছ' মাইল ব্যবধানে মাথাভাঙ্গা নদীতীরস্থ নীলকুঠিতে কয়েকজন প্রজার নিম্নলিখিত বেত্র দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার সংবাদ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বের করেছিলেন :

নিদিরপোতা নিবাসী গোলাব বিশ্বাস		… …	৩০ ঘা বেত্রদণ্ড	
চিত্তশাল	,,	রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় …	৩০	,,
বেতুয়া	,,	মাধব রাজবংশী … …	৩০	,,
মুচি ফুলবেড়িয়া	,,	ধন্যা শেখ … …	৩০	,,
ফুলবেড়িয়া	,,	মাধব মণ্ডলের ভ্রাতা …	৩০	,,
গোবরপোতা	,,	ক্ষুদিরাম ঘোষ … …	৫২	,,

নীল চাষে অসম্মত প্রজাদের গৃহদাহ, রাহাজানি, লুঠতরাজ, শস্য ধ্বংস, নীলগুদামে কয়েদবাস, রকমারি প্রকারের দণ্ডদান নীলকরদের অত্যাচারের বিভিন্ন অঙ্গমাত্র। তাদের নির্যাতন থেকে নারীরাও বাদ পড়েন নি।

নীল চাষীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের আভাস মাত্র দেওয়া হ'ল।

তাদের জীবন এর ফলে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। উৎকৃষ্ট উঁচু উর্বর জমি ক্রমে নীল চাষের জন্য কৃষকরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাদের চুক্তি জালে এমন করে আবদ্ধ করা হ'ল যে, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে নীল চাষে তারা বাধ্য থাকে। জীবন ধারনের জন্য যে সব খাদ্য শস্য একান্ত প্রয়োজন তা উৎপাদনের উপায় একরূপ রইলই না। ধান, কলাই, সরিষা এবং এইরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাষ থেকে তারা বঞ্চিত হ'ল। মুর্শিদাবাদ মালদহ যেমন আমের জন্য বিখ্যাত যশোহরও ঐ সময় ছিল গুড় শিল্পের জন্য একটি নাম করা অঞ্চল। খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরি হয়। কিন্তু এ খেজুরের বাগান কেটে উজাড় করে দিল নীলকরেরা। নীল চাষিরাই নিজহাতে এই আত্মঘাতী কার্য করতে বাধ্য হ'ল। গুড় থেকে চিনি উৎপাদন ছিল সে যুগের একটি মস্ত বড় শিল্প। আমি শৈশবে এই গুড়ের চিনি তৈরি দেখেছি। খেজুরের পাতা দিয়ে প্রস্তুত পাটির চার কোনা মুড়ে খেজুরে চিনি ঢালা হতো। তখন এই শিল্পে খুবই প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু নীলের আমলে কৃষকেরা তাদের এই অর্থকরী শিল্প উৎপাদন থেকেও বঞ্চিত হয়। এইরূপে মুর্শিদাবাদ মালদহ প্রভৃতি জেলায় নীল চাষের জন্য আমের বাগানও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলে অনুমান। সর্বত্র কৃষক-কুলের দুঃখ দৈন্যের অন্তঅবধি রইল না। নীলকুঠি থেকে আগাম টাকা দাদন নিয়ে নিয়ে তারা নীলকরদের 'ক্রীতদাসে' পরিণত হতে থাকে। নীলচাষীর উপর নীলকরদের অত্যাচার উৎপীড়ন সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ ও ছড়া বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত হয়। প্রবল প্রতাপ নীলকরেরা নীলচাষী ব্যতিরেকে অন্যান্যদের নিয়ে বেগার খাটানোতেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এখনো লোকমুখে অঞ্চল বিশেষে এ সব ছড়া শোনা যায়। খুলনা অঞ্চলের একটি ছড়া এই ঃ

কপালের এমনি ফের
যাচ্ছিলাম শ্বশুর বাড়ি
··· কাটতি বসলাম রেনী সাহেবের খেড়।

এই দুঃসহ অবস্থার কথা যে সরকারের গোচরে এতদিন আসে নি তা আদৌ বিশ্বাস্য নয়। তবে, সরকারী নথীপত্র থেকে জানা যায় যে, বারাসাতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী আবদুল লতিফ প্রথমে ঐ অঞ্চলে নীলচাষীদের দুর্দশার কথা ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাশলি ইডেনের (পরে বঙ্গের ছোটলাট) গোচরে

আনেন। তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এই গুরুতর বিষয়ে অবগত করান। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ইডেন এই মর্মে এক পরোয়ানা জারি করলেন যে, কৃষকেরা নীলচাষ করতে বাধ্য নয়। তাদের নীলচাষে বাধ্য করানো হলে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধেরই সামিল। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে! জেলাগুলিতে নীলের কুঠিয়াল তথা স্বাধীন ব্রিটনেরা স্বেচ্ছা মত কাজ করেই চলে। স্থানীয় আইন আদালত তাদের অনাচার উৎপীড়ন থেকে নিরস্ত করতে অক্ষম। যদি বা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিচার-আদালতগুলিকে ইউরোপীয়দের বিচারের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব হ'ল, কিন্তু অকস্মাৎ সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাও চাপা পড়ে গেল।

তখন শাসক শ্বেতাঙ্গেরা খুবই বিপন্ন। তারা মফস্বলে প্রবল প্রতাপ নীলকরদেরও প্রশাসনের অঙ্গীভূত করে নিলেন। পূর্বেই বলেছি ১৮৫৭, ১লা আগস্ট থেকে বৎসর খানেকের মেয়াদে নীলকরদের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করা সুরু হ'ল। এতে যে কত অনর্থের সম্ভাবনা, ভারতবর্ষীয় সভা তা আঁচ্ করে সরকারের কাছে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছিলেন। বাস্তবিকই উক্ত ব্যবস্থায় কিরূপ অনর্থের সৃষ্টি হয়েছিল, কিছুকাল পরে দৃষ্টান্ত দিয়ে সভা কর্তৃপক্ষকে স্পষ্টত জানিয়ে দেন। এ কথাও আগে খানিকটা বলেছি। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরেরা নিজ নিজ পেয়াদা থেকে উচ্চতন সরকারী কর্মচারীদের পর্যন্ত নীলচাষীদের সায়েস্তা করার কাজে লাগিয়েছিল। কৃষকেরা তো বিপন্ন হলোই, ইতর ভদ্র কত পরিবার যে নীলকরের অত্যাচারে উৎসন্ন গেল তার সীমা সংখ্যা করা সম্ভব নয়। এইরূপ—নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতালির মিত্র পরিবারের উৎসন্ন হবার কাহিনী নিয়ে প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুবিখ্যাত নীল দর্পণ নাটক লিখেছিলেন। নীল চাষীদের অভ্যুত্থানের প্রায় সমসময়ে দীনবন্ধুর এই নাটকখানি ঢাকা শহর থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু ছিলেন ডাক বিভাগের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। কর্মব্যপদেশে নদীয়া যশোহর প্রভৃতি জেলায় বারবার তাঁকে যেতে হত। তিনি নিজে চাষীদের উপর কুঠিয়ালদের অত্যাচার প্রত্যক্ষও করেছিলেন।

নীল চাষীরা নিরূপায়। আজিকার ধরনে তাদের কোন নেতা ছিল না। নিজেরাই একরকম নিজেদের ব্যবস্থা করে নিল। কুঠিয়াল লোকজন নিয়ে

গ্রামে গ্রামে অনিচ্ছুক বা দোমনা নীল চাষীদের উপর অকস্মাৎ চড়াও হত এবং তাদের খাদ্য শস্য, ঘরবাড়ি, গরুবাছুর সবই হয় নষ্ট বা লোকজন দিয়ে স্থানান্তরে চালান করে দিত। নীলকুঠিতে আবার এই সব চাষীকে ধরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। তাদের উপর যে নানা রকম শাস্তি দেওয়া হত তার কিছু উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। নীল গুদাম জেলখানায় পরিণত হয়। সেখানে চাষীদের মাসের পর মাস আটক রাখা হত। নেতৃস্থানীয় চাষীদের গায়েব করে এক কুঠি থেকে আর এক কুঠিতে চালান করে দিত এরা। কিছুকাল পরে খুঁজে না পাওয়া গেলে আত্মীয়-স্বজনেরা ধরে নিত যে সে মারা গেছে। এইরূপ দুর্বিষহ অনাচার অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কি?

একটু আগেই বলেছি, গ্রাম্য কৃষকদের বাইরের আমদানী করা লেখাপড়া জানা কোন নেতা ছিল না। নিজেরাই করণীয় সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা করতে লেগে যায়। তারা ক্রমে গ্রামে গ্রামে জোট বাঁধে। নীল চাষীরা নীলকরের অকস্মাৎ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নানা উপায় অবলম্বন করল। কৌতুককর মনে হলেও একটি ব্যাপারের এখানে উল্লেখ করি।

যদি কোন গ্রামে কুঠিয়ালের আক্রমণ শুরু হত বা সম্ভাবনা দেখা যেত তবে গ্রামবাসীরা জোটবদ্ধ হয়ে তার বাধা দেবার জন্য ব্যবস্থা নিতেন। প্রতি গ্রামে একটি করে ঢাক বা নাগরা রাখা ছিল। আক্রমণের সম্ভাবনা মাত্রই ঢাকে বাড়ি পড়ত। পার্শ্ববর্তী গ্রামে এই আওয়াজ শুনে অমনি ঢাক বাজানো হত। এইরূপে চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিশ পঁচিশটি গ্রামে কুঠিয়ালের আক্রমণের কথা জানাজানি হত এবং চাষীরা ও জনসাধারণ এর প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হতেন। কিন্তু তাঁরা তো নিরস্ত্র, কুঠিয়াল অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত। তার সিপাই বরকন্দাজ লাঠিয়াল ঢের। এদের বিরুদ্ধে এককভাবে লড়া সামান্য গ্রামবাসীদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব! এই জন্যই এক রকম স্বাভাবিকভাবেই কৃষকেরা এবং ইতর ভদ্র গ্রামবাসীরা জোট বাঁধতে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু চাষীদের দুরবস্থা ক্রমে চরমে উঠল। সিপাহী যুদ্ধের পর দেশের আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। কোন কোন সূত্র থেকে জানা যায়, নীল চাষ এ সময় আর তেমন লাভজনক ছিল না।

নীলকরদের আর্থিক টানাটানির মধ্যে নীলচাষীদের দুর্গতিরও অন্ত রইল না। তারা এখন কি করে!

ইতিমধ্যে পুনরায় চুক্তিভঙ্গের আইন সাময়িকভাবে বিধিবদ্ধ হ'ল ১৮৬০ সনের মার্চ মাসে। এই আইন বলে নীলচাষীদের চুক্তিভঙ্গকে ফৌজদারীতে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়। এ যেন বোঝার উপরে শাকের আঁটি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে আর একবার এই রকম আইন নীলকরের সুবিধার্থে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তখন লাইসেন্স বা অনুমতি পত্রের ব্যবস্থা ছিল। অত্যাচারী হঠকারী শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের লাইসেন্স বাতিল করে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হত তাও আমরা জেনেছি। তখন লাইসেন্স বাতিল হওয়ার ভয় ছিল। যদিও সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় ঐ সময়ে তারা অত্যাচার নিপীড়নে খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এখন আর সে দিন নাই। শ্বেতাঙ্গরা স্বাধীন ব্রিটন বলেই শুধু নিজেদের জাহির করত না, আচারে আচরণেও তাদের এ ভাব অহরহ প্রকট হয়ে পড়ত। তারা দেশীয়দের মত ভারতেরই বাসিন্দা। তাদের মতই ভূমিস্বত্বে সব রকম সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার পেয়েছে। উপরন্তু দেশীয়দের উপর প্রযুক্ত আইনের বাইরে ছিল তারা। এ সব কারণে উক্ত নূতন বিধি শ্বেতাঙ্গদের একেবারে স্বৈরাচারী করে তুলল। এর উপর প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ছিল শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের সপক্ষে। সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে তাদের এই সপক্ষতা বিশেষ করে প্রকাশ পায়। চুক্তিভঙ্গ আইন বলে প্রজাদের দলে দলে ধরে এনে আটক রাখা হত, নীলচাষে সম্মত না হলে নীলচাষীদের বিচারের পর জেলে পোরা হত।—দুই একজন নয়, দলে দলে। এ সব কথা অবিলম্বে ফাঁস হয়ে পড়ল। নীল চাষীদের প্রতিজ্ঞা—মরণ পণ,—তবু তারা নীল বুনবে না। নীলকর এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষের উৎপীড়ন যত বাড়তে লাগল তত প্রতিজ্ঞায়ও তারা অটল হয়ে উঠল।

এ বিষয়ের অনেক কথা আমরা শিশিরকুমারের লেখা চিঠি থেকে জানতে পারি। বহু বৎসর পরে তিনি 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় (১৮৭৬, ২৬শে অক্টোবর) লিখেছিলেন: "যশোহর জেলে প্রায় একশত প্রজাকে ম্যাজিষ্ট্রেট আবদ্ধ করেন। তিনি কুঠিয়ালের পক্ষে ছিলেন। প্রজাদিগকে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রজাদিগকে নীল

আবাদ করিতে বলেন, প্রজারা ইহাতে অসম্মত হয়। তিনি সঙ্কল্প করেন যে যতদিন প্রজারা ইহাতে সম্মত না হয় ততদিন তাহাদিগকে পানীয় কি আহার দিবেন না। প্রজারা সঙ্কল্প করিল যে প্রাণ যায় সেও শ্রেয়, তথাচ তাহারা নীলের দাদন করিবে না। প্রজারা যে সঙ্কল্প করে কার্যেও তাহাই করে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পরাস্ত হইলেন।"

নিম্নবঙ্গের এই প্রজা অভ্যুত্থানের কথা অবিদিত রইল না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বরাবর প্রজার সপক্ষতাই করে এসেছেন। নীলচাষীদের উপর অনাচারের ফিরিস্তিও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হত। এর কিছু কিছু নমুনা আমরা পূর্বেই পেয়েছি। পেট্রিয়ট প্রজাদের এই বিপদের মুখে কি নীরব থাকতে পারেন! সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র পেট্রিয়টের পাতায় বিভিন্ন জেলা থেকে নীলচাষীদের উপর নূতন করে আরব্ধ উৎপীড়ন নিপীড়নের কথা সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৮৬০, ২৮শে এপ্রিল থেকে একটি অধ্যায় খুললেন—'ইণ্ডিগো ডিষ্ট্রিক্টস্' বা 'নীল জেলা' শীর্ষক। পূর্বেও এ সম্বন্ধে পত্রিকা স্তম্ভে চিঠিপত্র বের হত। এখন থেকে নিম্ন অঞ্চলের নীল সম্পর্কীয় খবরাখবর বার হতে লাগল। নীলচাষীদের ঐক্যবদ্ধতা এবং তারা যে কি বিপদের সম্মুখীন তাও অবিলম্বে সর্বত্র জানাজানি হ'ল। যশোহর থেকে শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগর থেকে মনোমোহন ঘোষ এবং দীনবন্ধু মিত্র, গিরীশচন্দ্র বসু, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ অন্যান্য অঞ্চল থেকেও এ সম্বন্ধে পেট্রিয়টে পত্রাদি লিখতে লাগলেন। যশোহরের শিশিরকুমার ঘোষের কথা এ প্রসঙ্গে একটু বিশেষ করে বলি।

তাঁর রাশ নাম ছিল মন্মথলাল ঘোষ। রাশ নামের আদ্যক্ষর সংযুক্ত হয়ে চিঠিগুলি বার হত। এম. এল. জি স্থলে ভ্রমক্রমে এম. এল. এল. বলে ছাপা হত। পেট্রিয়টে অন্তত ছ'খানি চিঠিতে এই ভুল দেখতে পাই। এ ছাড়া আরো বহু চিঠি ছাপা হয় যাতে উক্ত আদ্যক্ষর ছিল না। অথচ বিষয়বস্তু পরিবেশনের আভ্যন্তরীণ কায়দা কানুন থেকে বুঝা কঠিন নয় যে, এগুলিও শিশিরকুমারেরই লেখা। শিশিরকুমার তখন মাত্র বিংশতি বৎসরের যুবক এবং যশোহরে শিক্ষকতা কর্মে ব্রতী। তিনি যশোহরের ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরবর্তী

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কখন পায়ে হেঁটে কখন নৌকা যোগে নীলকরদের অবস্থা সরেজমিনে জানবার জন্য পরিভ্রমণ করে কোন কোন চিঠিতে শ্বেতকায় ম্যাজিস্ট্রেট ও মহকুমা হাকিমের নীলচাষীদের উপর জোর জুলুমের কথাও প্রচার করে দেন। তারা প্রায় সবক্ষেত্রেই ছিল নীলকরদের একান্ত সহায়ক। শিশির-কুমার নীল কুঠিয়াল এবং জেলা ও মহকুমা হাকিম, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রমুখ নীলকর বন্ধু শ্বেতাঙ্গদের সপক্ষতার খুঁটিনাটি বিবরণও ঐ সব চিঠিতে লিখে পাঠাতেন। কর্তৃস্থানীয়েরা এই সকল পত্র লেখকের খোঁজ করতে লেগে যান। কারো কারো সন্দেহও ছিল যে এগুলির লেখক শিশিরকুমার ঘোষ। কিন্তু এত খোঁজাখুজি করেও পত্র লেখকের হদিশ্ পাওয়া যায়নি। যেমন যশোহরে তেমনি নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর বঙ্গের নানা জেলায় নূতন আইন বলে নীলচাষীদের অযথা আটক কয়েদ ও হয়রানি হতে লাগল। সরকার আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। নীল আন্দোলনের ব্যাপকতা গুরুত্ব ও গভীরতা কর্তৃপক্ষকে ভাবিত করে তুলল। বড়লাট ক্যানিং বলেছেন সিপাহীযুদ্ধের সময় দিল্লী অবরোধ কালে তিনি যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এই নীল নীলচাষীদের এইরূপ ঐক্যবদ্ধতা এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপার সমূহে তিনি তার চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সরকার এ সময়ে কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার কথা একটু পরে বলছি। ইতিমধ্যে নীলচাষীরা মরণপণ করে নীলচাষ করার বিরুদ্ধে জোট বেধেছিল এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল কতখানি সে সম্বন্ধে একটু বলি।

শিশিরকুমার নীল বিদ্রোহের কথা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে নিজ 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'য় লিখে গেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত উক্তিগুলি আজিকার দিনেও আমাদের নিকট বিশেষ অর্থবহ হয়ে আছে। সরকারের নিকট নীলচাষীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের একটি দৃষ্টান্তের কথা তিনি পত্রিকা স্তম্ভে (১৮৭৬, ২৯শে অক্টোবর) এইরূপ লিখেছিলেন:

"নীল বিদ্রোহের সময় মুসলমান প্রজারা কি সাহস ধৈর্য ও অধ্যবসায়ই দেখায়! সে বার অবিচলিত চিত্তে তাহারা কি না সহ্য করে। গোড়ই নদীর এখন অত্যন্ত দুর্দশা। যখন নীলের গোলমাল হয় গোড়ই পদ্মার ন্যায় বেগবতী ছিল। লেঃ গবর্ণর এই গোড়ই নদীর মধ্য দিয়া ষ্টিমার যোগে গমন-

করিতেছেন, নদীর দুই ধারে সহস্র সহস্র প্রজারা হাতে দরখাস্ত লইয়া দাঁড়াইয়া কাপ্তেনকে জাহাজ লাগাইতে বলিতে লাগিল। লেঃ কোন মতে জাহাজ নদীতীরে লাগাইলেন না। শত শত প্রজা নদীতে ঝম্প প্রদান করিল। গোড়ইর মহাবেগ লক্ষ্য করিল না। তখন তাহারা নীলের অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে তাহার নিমিত্ত প্রাণ সঙ্কল্প। প্রজাদিগকে নদীতে ঝম্প প্রদান করিতে দেখিয়া লেঃ গবর্ণর জাহাজ লাগাইতে বাধ্য হইলেন। প্রজারা জাহাজ ঘিরিয়া ফেলিল; এবং গ্রাণ্ট সাহেবকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

শিশিরকুমার নীল আন্দোলনের বহু বৎসর পরে পত্রিকায় এ সব কথা লেখেন। কাজেই সংক্ষিপ্তভাবে স্মৃতি থেকে তিনি এরূপ বলেছেন। স্বয়ং ছোটলাট এ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। প্রস্তাবিত নীল কমিশনের উপসংহারে প্রদত্ত মন্তব্য-লিপিতে তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা জুড়ে দিলেন। শিশিরকুমার গোড়ই নদীর কথা লিখেছেন। দেখি, ছোটলাট স্যর জন পীটার গ্রাণ্ট তাঁর মন্তব্য-লিপিতে কুমার ও কালীগঙ্গা নদী দুটির কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রাণ্ট এই মর্মে লিখলেন যে, তিনি এক নাগাড়ে ষ্টীমার যোগে ষাট সত্তর মাইল পথ কুমার ও কালীগঙ্গার ভিতর দিয়ে গেছেন। এতে তাঁর ১৪ ঘণ্টা সময় লাগে। এই দীর্ঘ পথে নদী দুটির দুধারে কাতারে কাতারে নীলচাষীরা জড় হয়ে তাঁর নিকট আবেদন জানায় যে তারা নীল বুনবে না, গভর্ণমেণ্ট তাদের এই প্রার্থনার সপক্ষে আদেশ করেন। দূর দূর গ্রাম থেকে নারী ও পুরুষেরা এসে দুধারে এই দীর্ঘ পথে জড় হয়েছিল। তারা ছিল বরাবর শান্ত ও সুশৃঙ্খল। অথচ তাদের সঙ্কল্পে যে তারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এ বিষয়টি ছোটলাট তাদের ভাবগতিক ও কথাবার্তা থেকে ভাল করে বুঝতে পারেন। জীবনে তাঁর এ অভিজ্ঞতা খুবই অভিনব। দীর্ঘ পথ ব্যাপী সহস্র সহস্র লোকের একই প্রার্থনা। তিনি তাদের প্রার্থনার সারবত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। এরূপ সমবেত ঐক্যবদ্ধ আবেদন সম্পর্কে সুবিবেচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়টের' কথা একটু আগেই বলেছি। মফস্বলের কৃষককুল হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে তাদের এক দরদী বান্ধব

পেল। বিভিন্ন জেলা থেকে তারা তাঁর কলকাতা—ভবানীপুরস্থ বাসগৃহে এসে দুঃখ ও দুর্দশার কথা সাক্ষাৎভাবে বলতে লাগলেন। হরিশ্চন্দ্রের বাস ভবনটি হয়ে উঠল অসহায় কৃষককুলের আশ্রয় স্থল—পান্থশালা। বিভিন্ন জেলা থেকে পত্রাদি মারফত তাদের অবস্থা তিনি যেমন জেনে নিতেন তেমনি ঐ সব প্রজাকুলের মুখ থেকেও তাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিষয় সাক্ষাৎ-ভাবে অবগত হতেন। তখন চারদিকে নীলকরদের উৎপীড়ন নিপীড়নের এবং প্রজাকুলের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা জানাজানি হয়ে পড়ে। হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ভারতবর্ষীয় সভার একজন প্রভাবশালী সদস্য। সভা কর্তৃপক্ষ ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন যেন তারা অবিলম্বে নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যেকার তিক্ত সম্পর্ক আর বেশীদূর গড়াতে না দিয়ে এ বিষয়ে একটি কমিশন বসান এবং যথাযথ তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে উদ্যোগী হন। গভর্ণমেণ্ট আর এ বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারলেন না। তারা ১৮৬০ সনের মে মাসেই নীল সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি কমিশন গঠন করলেন। এই সময় কাল বিলম্ব না করে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নিম্নবঙ্গের এই জন-অভ্যুত্থানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে উল্লেখ করে হরিশ্চন্দ্র একটি প্রস্তাব লিখলেন। এই প্রস্তাবে তিনি প্রজাকুলের নেতৃত্বহীন স্বতঃস্ফূর্ত জন-অভ্যুত্থানকে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করে স্বাগত জানালেন। তিনি বল্লেন জগতে এমন দুটি অহিংস অভ্যুত্থানের তুলনা মেলা ভার! জনগণ নিরক্ষর দুর্গত অত্যাচারিত উৎপীড়িত; প্রতিপক্ষ নিরতিশয় প্রবল; এ সময়ে তারা যে অমন করে বিদ্রোহী হতে সক্ষম হয়েছেন তা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। আরব্ধ নীল কমিশনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় তিনি পুরাতন নীলকরদের উৎপীড়ন নিপীড়নের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি লিখলেন—নীলকরেরা বহু গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে, প্রজাদের অপহরণ করেছে, নারীর উপরে অত্যাচার খুব হামেশাই ঘটেছে, শস্য গোলা ছারখার করে দেওয়া হয়েছে। এক কথায় নির্যাতনের কোন রকম উপায়ই নীলকরেরা বাদ দেয় নি। এত নির্যাতন সত্ত্বেও প্রজাকুল অবনমিত হয়নি, তারা স্বাধিকার রক্ষায় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রের উক্তির মধ্যে লোক অপহরণের বা গায়েব করার কথাটা বিশেষ

লক্ষণীয়। পূর্বে অবশ্য এ বিষয়টি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছি। নীল কমিশনের সম্মুখে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তথ্যাদির উপর নির্ভর করে উদ্ঘাটিত করলেন অ্যাশলি ইডেন। তিনি সদর দেওয়ানী আদালত এবং সুপ্রিম কোর্টের নথিপত্র ঘেটে দেখালেন যে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে নীলকর কর্তৃক উনপঞ্চাশটি লোক অপহরণ ও গায়েব করার ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ের প্রথম বৎসরে একটিমাত্র ঘটনা ঘটেছিল। দশ বৎসরের মধ্যে এই রকম ঘটনা। ঘটেছে একচল্লিশটি। লোক অপহরণ ও গায়েব করার বিষয় এই সব বিচার-আদালতের সম্মুখে কতটাই বা এসেছে। এই সময়ের মধ্যে কত অগণিত ক্ষেত্রে যে এরূপ ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কৃষককুল শুধু নয়, তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যেও এরূপ অনেক ঘটেছিল। শেষোক্তদের ভিতরে যারাই নীলকরের বিপক্ষতা করেছে তারাই তাদের কোপে পড়ে নানাভাবে নাজেহাল হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কত ছোট ছোট জমিদার, তালুকদার, সম্পন্ন গৃহস্থ—যারাই ওদের বিপক্ষতা করতে উদ্যত হয়েছে তাদের কেউই রেহাই পায় নি। এই প্রসঙ্গে একজন প্রথম শ্রেণীর জমিদারের কথা উল্লেখ করি। তিনি হলেন নড়ালের রামরতন রায়। তাঁর হাতে ও অঞ্চলের নীলকরেরা কিরূপ জব্দ হয়েছিল সরকারী নথি পত্রে এর উল্লেখ আছে। বরাহনগরে রতনবাবু রোড় ও রতনবাবু ঘাট তাঁর স্মৃতিমাত্র বহন করছে।

নীল কমিশন গঠিত হ'ল পাঁচজন মাত্র সদস্য নিয়ে। ডব্লু. এস. সীটনকার সভাপতি এবং অন্য চারজন বিভিন্ন পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। রীচার্ড টেম্পল (পরে বঙ্গের ছোটলাট) সরকার পক্ষ, পাদ্রী জে. সেল প্রজাপক্ষ, ডব্লু. এফ. ফার্গুসন নীলকর পক্ষে এবং চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষীয় সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন। এখানে একটি বিষয়ের দিকে আমাদের স্বতঃই দৃষ্টি পড়ে। প্রজাপক্ষে দাঁড়ালেন পাদ্রী সেল মহোদয়। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আমাদের দেশে ধর্মান্তরীকরণ ব্যাপারে পূর্বে বিস্তর নিন্দাভাজন হয়েছেন। কিন্তু গ্রাম পল্লীর সাধারণ মানুষের জন্য তাদের কার্যকলাপ আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন এবং নীলকরের অত্যাচারে নীল চাষীরা কিরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হত তা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। যাবতীয় খ্রীষ্টান সমাজ এক সময় যে প্রজাকুলের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিল তার বিশেষ প্রমাণ পাই কিছু

পরে। পাদ্রী লঙের কারাবাস কালে পাদ্রীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের মধ্যে তা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই। এ কথাটি পরে আর একটু বিশদভাবে বলা যাবে।

নীল কমিশন বসল ১৮ই মে ১৮০৭ থেকে। পরবর্তী ১৪ই আগস্ট এর কার্য সমাপ্ত হয়। কলকাতায় বসেই নীলকর ও নীলচাষীদের সাক্ষ্য প্রমাণ প্রধানত গ্রহণ করা হ'ল। মাঝে একবার মাত্র কমিশন কৃষ্ণনগরে এই উদ্দেশ্যে যান। মফস্বলের দূর দূর অঞ্চল থেকে নীল চাষীদের কলকাতায় এসে সাক্ষ্য দেওয়া কতখানি কঠিন ছিল আজিকার দিনে তা হয়তো কল্পনারও অসাধ্য। তথাপি ৭৭ জন নীল চাষী কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়ে তাদের মনের কথা নিঃসংকোচে ব্যক্ত করল। এ থেকে প্রজাকুলের নীলচাষের বিরুদ্ধে দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা প্রকটিত হয়ে পড়ে। কয়েকজনের সাক্ষ্য ছিল এই প্রকার ঃ

দিনু মণ্ডল ঃ আমার গলা কেটে ফেল্‌লেও আমি নীল বুনব না।...বরং মৃত্যু স্বীকার, তথাপি নীল চাষ করব না।

জামির মণ্ডল ঃ আমি এমন দেশে চলে যাব যেখানকার লোকে নীল চোখে দেখে না বা নীল বোনে না।

হাজি মোল্লা ঃ নীল না বুনে অন্য দেশে চলে যাব।

কবি মণ্ডল ঃ কারো জন্যই আমি নীল বুনব না, এমন কি মা বাবার জন্যও না।

পাঞ্জু মোল্লা ঃ আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন, তবু নীল বুনতে পারব না।

মানব দরদী প্রজাবন্ধু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি। তিনিও সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক আহূত হলেন। নীলচাষীদের সপক্ষে তিনি কি কি করেছেন সাক্ষীদান কালে তার একটি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দেন। তিনি এই মর্মে বলেন যে—জমিদার, প্রজা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য তাঁর উপদেশ নিতে আসতেন। ১৮৬০ সালের ১১ আইন পাস হবার পূর্বে প্রজারা কিসে নীল না বুনতে হয় তার উপদেশ চাইত। এর পরে নীলকর ও কর্তৃপক্ষের জবরদস্তি এবং

অত্যাচার এড়াবার পথ সম্বন্ধেও তারা পরামর্শ গ্রহণ করে। এ সব বিষয়ে পরামর্শ দান ও দরখাস্ত প্রভৃতি লিখে দিয়ে তিনি প্রজাদের সাহায্য করতেন। তাঁর অনুরোধে মফস্বলে অনেকে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সংবাদদাতা হন। উক্ত আইনের অছিলা করে রাজকর্মচারী ও নীলকরগণ ঘোর অত্যাচার উৎপীড়ন করতে থাকে। স্যাঁতসেঁতে ছোট ও সঙ্কীর্ণ গুদামে অনেক লোক কয়েদ রাখা, বলপূর্বক সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নীলকরের প্ররোচনায় পুলিশ কর্তৃক প্রজাদিগের স্ত্রীলোকের উপর অনেক রকমের অত্যাচার উৎপীড়ন হত। হরিশ্চন্দ্র শেষে এই মর্মে বলেন, "আমি নীল হাঙ্গামার বিষয় বিশেষ যত্নসহকারে পর্যালোচনা করেছি। এর ফলে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, বর্তমান নীলচাষ রায়তের পক্ষে সর্বপ্রকারেই অহিতকারী। আমি এ সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশের সুযোগ পাওয়ামাত্রই ব্যক্ত করেছি। একটি বিষয়ে আমার এখনও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নি, তা হ'ল এই যে, ভবিষ্যতে নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াবে?"

নীল কমিশন যথা সময়ে কার্য সমাপনান্তে সরকারে রিপোর্ট পেশ করলেন। এর সঙ্গে ভারত সরকারের বিবেচনার্থে ছোটলাট গ্রাণ্টও একটি বিস্তারিত মন্তব্যলিপি জুড়ে দিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে নীলকরদের নির্মম পীড়নের কাহিনী প্রকাশ হ'ল। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তারা তো ক্ষেপেই আগুন। গ্রাণ্টের উপরে তাদের আক্রোশ চরমে উঠল। যা হোক নীল কমিশন যে সব সুপারিশ করলেন তার উপরে ভিত্তি করে প্রশাসন ক্ষেত্রে কতকটা সংস্কার সাধিত হল। বিভিন্ন জেলা মহকুমা ও থানার পুনর্বিন্যাস ঘটল। প্রত্যেকটি থানায় সশস্ত্র পুলিশও মোতায়েন হ'ল। যাতে দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় তারা গিয়ে সত্বর দমন করতে পারে এই জন্য। এবম্বিধ পরিবর্তনের ফলে নীলকরদের অত্যাচার উৎপীড়নের সংবাদ পৌঁছোবার সুবিধা হ'ল। তবে ও-রূপ ব্যবস্থার অন্য একটা ব্যাঞ্জনাও সহজে পরিলক্ষিত হয়। কর্তৃপক্ষ হয়তো এই ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, প্রজাকুল স্বভাবতঃই দাঙ্গাপ্রবণ এবং তাদেরও দমন করা চাই। অথচ দেখা গেছে সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী নীল চাষীদের জোট দেখা গেলেও দাঙ্গা হাঙ্গামা খুব কম জায়গায়ই হয়েছিল। যদিও বা কোথাও হয়ে থাকে, তা হলে, তা ছিল নীলকর পুঙ্গবদের প্ররোচনায় ফল।

কমিশনের সাক্ষ্যে এবং রিপোর্টে যে সব কথা প্রকাশিত হ'ল তাতে নীলকর সমাজের মর্যাদার হানি ঘটল খুবই। তবে একটি কথা আমাদের এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। পূর্বেই বলেছি সিপাহী যুদ্ধের পর কোম্পানির অধিকার থেকে ভারতবর্ষের শাসনভার যখন ব্রিটিশরাজ গ্রহণ করেন তদবধি এ দেশ আর কোন বিশেষ শ্বেতাঙ্গ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি রইল না। এটি হ'ল সমগ্র ব্রিটিশ জাতির সম্পত্তি। কি সরকারী কি বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ মাত্রেই কতকটা আত্মরক্ষা এবং বেশী করে স্বার্থরক্ষার খাতিরেই ক্রমে একাত্ম হয়ে উঠল। তাই দেখি প্রশাসন ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার ভাগিদার বেশী করে হয় বেসরকারী নীলকর তথা শিল্প ব্যবসায়ী সমাজ। ইডেন, হার্সেল, গ্রাণ্টের মত উদারচেতা ন্যায়পরায়ণ মানবদরদী ইংরেজের অপ্রতুলতা বেশী করে আমাদের এ সময়ের থেকে নজরে পড়ে। নীলকরদের মর্যাদাহানি ঘটল বটে, কিন্তু তাতে তাদের কি আসে যায়; স্বার্থ পুরোপুরি বজায় রইলেই হল। এই স্বার্থ রক্ষায় যাঁরা বাদ সাধলেন তারাই তাদের শত্রু বলে বিবেচিত হলেন। সে ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে কোন ভেদই তারা করল না। এ বিষয়টি পরে আমরা বিশদ করে বলতে চেষ্টা করব।

নীল বিদ্রোহকালে অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রজাকুলের জোট বাধা এবং ঐক্যবদ্ধ কাজের ফলে উদ্ভূত আত্মশক্তিকে রুখবার মত ক্ষমতা কারো বিশেষ রইল না। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর মধ্যে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা দেখতে পেয়েছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষ নীল বিদ্রোহকালে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু বলেছেন ও লিখেছেন। তিনি ১৮৬০ সালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রায় পনের বৎসর পরে তৎকালীন দ্বি-ভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকার' ইংরেজী স্তম্ভে (১৮৭৪, ২২মে) যা লেখেন তা হরিশ্চন্দ্রের উক্তিরই সমর্থন করে। শিশিরকুমার এই মর্মে লিখলেন : "নীল হাঙ্গামাই সর্বপ্রথম এদেশীয়-দিগকে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে শিক্ষা দেয়। বস্তুতঃ ইংরেজদের আগমনের পরে বাঙলাদেশে এই প্রথম বিপ্লব। দ্বিতীয়বার যখন বিপ্লব দেখা দেবে তখন পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণের অত্যাচার থেকে আমরা রেহাই পেতে পারব। অত্যাচারের মত কিছুই নয়! অত্যাচারের ফলে ইংলণ্ডে সেই গৌরবময় বিপ্লব এসেছিল; বাঙলা দেশেও নীলকরদের অর্ধশতাব্দী

ব্যাপী অত্যাচারের দরুন অর্ধমৃত বাঙালীজাতি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে এবং তার অসাড় দেহে আবার চেতনার সঞ্চার হয়।"*

* মূল ইংরেজী এই : It was the Indigo disturbance which first taught the natives the value of combination and political agitation. Indeed it was the first revolution in Bengal after the advent of the English. If there be a second revolution it will be to free the nation from the death grips of the all powerful police and district Magistrates. Nothing like oppression! It was the oppression which brought about the glorious revolution in England and it was the oppression of half a century by the indigo planters which at least roused the half dead Bengalee and infused spark in his cold frame.

নবজাতীয়তাবোধ ঃ আত্মশক্তির উন্মেষ

নীল বিদ্রোহের কথা এই মাত্র বললাম। নীল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রশাসন ব্যাপারে কতকগুলি পরিবর্তন সাধিত হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু নীলকরদের কোপ প্রশমিত হ'ল না। তারা এবার অন্যভাবে নীল চাষী সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার ফন্দি-ফিকির আঁটতে থাকে। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাদের নিকট পহেলা নম্বর দুষমন। তাঁকে জব্দ করার জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়টের' বিরুদ্ধে নীলকর পক্ষে মানহানির মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু এ বেশী দূর অগ্রসর হতে না হতেই হরিশ্চন্দ্র ১৮৬১, ১৪ই জুন ইহধাম ত্যাগ করলেন। নীলকরেরা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। তারা তাঁর বিধবাকে বিবাদী করে মামলা চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এরূপ প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে অপারক হয়ে তিনি আপোষ রফা করতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি নিয়ে তুমুল সোরগোল শুরু হল। দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকের কথা ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নীলকরদের উৎপাত উৎপীড়নের একটি প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট ধরা দিল এই নাটকের মধ্যে। ভারতবন্ধু মানব দরদী পাদ্রি জেমস্ লঙ এই নাটকখানির ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে প্রকাশিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, কবিবর মধুসূদন দত্ত নাটকখানির ইংরেজী অনুবাদ করে দেন। আর এজন্য তিনি সরকারের নিকট ধিকৃকৃতও হয়েছিলেন। অনুবাদ বইখানি বাঙলা সরকারের সীলমোহর যুক্ত হয়ে বার হয়। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন নীল কমিশনের সভাপতি এবং বাঙলা গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন সেক্রেটারি ডব্লু. এস. সীটনকার। বইখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপত্তি তুলে নীলকরদের প্ররোচনায় দুই রকমের মামলা রুজু হয়। এক, নীলকর সমাজের পক্ষে, এবং, দুই, 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরার' সম্পাদকের পক্ষে। কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে লঙের বিচার হ'ল। তিনি যে অনুবাদ প্রকাশের সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এই মর্মে আদালতে বিবৃতি পেশ করলেন। এর পূর্বে ১৮৬১, ২০ শে জুন তিনি সাধারণভাবে এ ধরনের পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি

দেন। ভারতবাসীর, শুধু ভারতবাসীই বা বলি কেন—ইউরোপীয় ও ভারতবাসীর মধ্যে একটি সুস্থ সম্পর্ক ও সুষ্ঠু পরিবেশ স্থাপনের জন্য যে এটি কত প্রয়োজন তা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যাত করেন তিনি। ব্রিটিশ আমলে লঙের ব্যাখ্যার সারবত্তা আমরা বারবার উপলব্ধি করেছি।

এই বিখ্যাত বিবৃতিটিকে স্বাগত জানিয়ে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ ৪৭ জন বাঙালী-প্রধান লঙকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। পূর্বেই বলেছি সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরেজরা ভারতবাসীদের উপর খাপ্পা হয়ে ওঠে এবং তাদের আচারে আচরণে এর বহু প্রমাণ মেলে। এমন কি বিচারপতিদের কথাবার্তার মধ্যেও এই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর বার্ণেস পীকক্ এবং স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েলসের এজলাসে লঙের শেষ বিচার হয় ২৪শে জুলাই, ১৮৬১ তারিখে। বিচারে লঙের হ'ল এক হাজার টাকা জরিমানা এবং এক মাসের কারাবাস। ভারতবর্ষীয় সভার সহকারী সভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ লঙের মোকদ্দমার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। সভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা রায় বার হওয়া মাত্র আদালতে জমা দিলেন।

লঙের আদালতে প্রদত্ত বিবৃতির শেষের কিয়দংশ প্রধান বিচারপতি পীকক্ পাঠ করতে দেন নি। পূর্বে সপক্ষতা করলেও এই সময়ে তিনিও ভারতবাসীর উপর বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। আর বিচারপতি মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ রায়দান কালে আমাদের জাতীয় চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ করতেও ছাড়লেন না। ভারতবাসীদের মধ্যে তখন কতখানি একাত্মতা জন্মেছিল তার একটি প্রমাণ আমরা ওয়েলসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ব্যাপারে বুঝতে পারি। রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে তাঁরই বাসভবনে ওয়েলসের উক্তির প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা হয়। এই সভার পক্ষে প্রথম ভারত সচিব স্যর চার্লস উডকে একখানি জোরালো প্রতিবাদ লিপি পাঠান হ'ল। এ সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' (১৪ এপ্রিল, ১৮৬২) এইরূপ লিখেছিলেন—

"লঙ সাহেবের বিচারকালে স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েলস যাবতীয় বাঙালীকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রধান লোক একত্র হইয়া শোভাবাজারে

রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটিতে এক সভা করিয়া মর্ডাণ্ট ওয়েলসের দুঃস্বভাবের বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক ঐ আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই, আবেদন-পত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় একমাস চতুর্দিকে প্রেরিত হয়, 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা' সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ একতা হইয়াছিল যে, তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই। স্যর চার্লস উড আবেদনের উত্তরদানকালে মর্ডাণ্ট ওয়েলসকে সাবধান করিয়া দিলেন।"

বিচারপতি ওয়েলসের অযথার্থ উক্তির প্রতিবাদে বিশ সহস্র লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক প্রতিবাদ লিপি প্রেরিত হয়। এতে তখন খানিকটা কাজও হয়েছিল। ভারতসচিব উড, আমরা দেখলাম, এই ধরনের উক্তির জন্য বিচারপতি ওয়েলসকে তিরস্কার করেছিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে এই যে একাত্মতা দৃষ্ট হয় তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

নীলকরদের রোষবহ্নি আরও দুজনের উপর বিশেষভাবে পড়েছিল। এ দুজনই ছিলেন উদারচেতা পদস্থ সরকারী কর্মচারী। একটু আগেই আমরা নীল কমিশনের সভাপতি সীটনকারের কথা জেনেছি। সরকারের সীলমোহর যুক্ত হয়ে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ নিয়ে নীলকর সমাজের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তারা ভারত সরকারকে পর্যন্ত সীটনকারের বিরুদ্ধে এই মর্মে লিখল যে, সীটনকার অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন এবং এ জন্য তার প্রতি সরকারের কঠোর পন্থা অবলম্বন করা দরকার। নীলকরদের কথা পুরোপুরি মেনে না নিলেও সরকার এর যৌক্তিকতা একেবারে অস্বীকার করতে পারলেন না। বাঙলা গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন সচিব ভারত সরকারকে দুঃখ প্রকাশ করে একখানি পত্র লিখেছিলেন। সীটনকার এ সময়ে ভারতীয় আইনসভার সদস্যরূপে কাজ করছেন বাঙলা সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিরূপে। তিনি এ পদ ছেড়ে দেওয়া সমীচীন বোধ করলেন। এই দশকের শেষে কিন্তু দেখি সীটনকার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে সমাসীন। এই সীটনকারই সিলেকসানস্ ফ্রম ক্যালকাটা গেজেটস্ নামক চারিখণ্ডে এক বিরাট সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সে যুগের দেশী বিদেশী, বিশেষতঃ স্থানীয় ইউরোপীয়

সমাজের হালচাল ও সুকৃতির উপর এই সঙ্কলন গ্রন্থ বিশেষ আলোকপাত করে।

দ্বিতীয় জন হলেন বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট স্যর জন পীটার গ্রাণ্ট। নীলকরকুল গ্রাণ্টের উপরে বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভারত সরকার তার সপক্ষে থাকায় এরা বেশী কিছু করে উঠতে পারে নি। 'বেঙ্গল হরকরা' তখন নীলকরদের একেবারে মুখপত্র হয়ে ওঠে। নীলকরদের আক্রোশ 'হরকরা' একটি ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করে। গ্রাণ্ট তখন তাদের চোখে চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লঙ্গ, নাদির শাহ্ প্রভৃতি কুখ্যাত নরঘাতকদের এক সংমিশ্রণ রূপেই প্রতিভাত। অযথার্থ প্রচার যে সত্যকে চাপা দিয়ে কতদূর গড়াতে পারে তা এ থেকেই বুঝা যায়। নীলকরেরা একখানি সরকারী পুস্তকের কোন কোন অংশ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গ্রাণ্টের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করে দেয়। বিচারপতিগণ ১৮৬২, মে মাসে এই মামলা খারিজ করে দেন। তবে মামলার খরচা বাবদে গ্রাণ্টের মাত্র এক টাকা জরিমানা ধার্য করলেন তারা। গ্রাণ্ট কিন্তু এর পূর্বেই এপ্রিল মাসে ছোটলাটের পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ভারত বিদ্বেষ স্থানীয় ইউরোপীয় সমাজকে কতখানি বিভ্রান্ত করে তোলে এ তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এখন আমরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকার অবলম্বিত বিধি ব্যবস্থার কথা কিছু বলব। এর ভিতর দিয়ে আমাদের জাতীয়তাবোধ পরিপুষ্টিলাভ করে এবং এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন ভারতবর্ষীয় সভা। ভারতবর্ষীয় সভার কথা ইতিপূর্বে বহুবার পেয়েছি। সভার প্রস্তাবিত বিবিধ হিতকর প্রচেষ্টার কতকগুলি ষাটের দশকের প্রথমেই কার্যে রূপায়িত হয়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তিন শ্রেণীর আইন পাস করেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ভারতবর্ষ ও তার প্রদেশ সমূহের নিমিত্ত আইন পরিষদ বা আইন সভা, আজকাল যা বিধান সভা নামে সমধিক পরিচিত। ১৮৫৩ সনের সনন্দের পর ভারতীয় শাসন পরিষদ থেকে আলাদা করে ভারতীয় আইন পরিষদ বা সভা গঠিত হয়। এতে কিন্তু তখন একজনও ভারতবাসী নেওয়া হয় নি। এর ফলে কি অনর্থের সৃষ্টি হয়েছিল তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। এবারে পার্লামেণ্টের আইন বলে ভারতবর্ষীয় আইন সভা বা পরিষদ

সম্প্রসারিত করা হ'ল, আর এতে স্থান পেলেন তিনজন ভারতীয়—পাতিয়ালার মহারাজা, কাশী-নরেশ এবং গোয়ালিয়রের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী স্যর দিনকর রাও। তখনকার দিনে ভারতীয় স্বার্থরক্ষা কল্পে যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন এতে কিন্তু তাঁদের কারও স্থান হয় নি। প্রথম শ্রেণীর আইন বলে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে নূতন করে আইন সভা গঠিত হ'ল। ১৮৩৩ সনের সনন্দে এই দুটি আইন সভা তুলে দেওয়া হয়েছিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন সভা বড়লাটের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় প্রয়োজন মাফিক আইন প্রণয়নের এই সময় অধিকার পায়। বাঙলা দেশের জন্য আইন সভা গঠনের ভার বড়লাটের উপরে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ১৮৬২, ১৮ই জানুয়ারি বাঙলায় এই সর্বপ্রথম আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমবারে যে চারজন বাঙালী এর সদস্য মনোনীত হন তাঁরা হলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, মৌলবী আবদুল লতিফ এবং রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। প্রায় দশ বৎসর ধরে ভারতবর্ষীয় সভা এ দেশে আইন সভা প্রবর্তন কল্পে যে প্রচেষ্টা করে এসেছিলেন এর মধ্যে তার খানিকটা পরিপূর্তি ঘটল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন হ'ল ভারতবর্ষের হাইকোর্ট গঠন সম্পর্কে। তিনটি প্রধান শহরে—কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে আইনবলে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ভারতবর্ষীয় সভা এ জন্যও আন্দোলন পরিচালনা করেন বহু বৎসর ধরে। কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালত সদর নিজামত আদালত এবং সুপ্রিম কোর্ট একীভূত হয়ে হাইকোর্টে পরিণত হয়। বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও ঐ একইরূপ ব্যবস্থা হ'ল। বাঙলা দেশের কথা আমরা এখানে একটু বেশী করে বলছি, যদিও ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর কি স্থানীয় কি সর্বভারতীয় নানা সমস্যার সমাধান কল্পেই চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙালী বিচারপতি নিযুক্ত হন রমাপ্রসাদ রায়। তিনি কিন্তু বিচারপতির আসনে বসবার পূর্বেই ১৮৬২, ১ আগস্ট তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবি শম্ভুনাথ পণ্ডিত। প্রকৃতপক্ষে শম্ভুনাথই এখানকার হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি। এখন যেখানে হাইকোর্ট অবস্থিত তার কিয়দংশে পূর্বকালে সুপ্রিম কোর্টের বাড়ি ছিল। এই চত্বরে

বিরাট গৃহ নির্মাণকল্পে বেশ কয়েক বৎসর কেটে যায়। পরবর্তী দশকের প্রথম দিকে হাইকোর্টের নূতন ভবনের দ্বার উন্মোচিত হয়। সদর দেওয়ানী আদালত-সমূহ এবং সুপ্রিম কোর্টকে সম্মিলিত করার উদ্দেশ্যে পঞ্চাশের দশকেই আলাপ আলোচনা শুরু হয়। ভারতবর্ষীয় সভা এ সম্পর্কে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই দুই রকমের আদালতের মধ্যে বড় ঈর্ষার ভাব বিদ্যমান ছিল। আর, এ জন্য বিচারে নানারূপ গলদণ্ড ঘটত। এ দুটি সম্মিলিত হওয়ায় তার মূল কারণ বিদূরিত হ'ল। অন্য দুইটি প্রদেশের বেলায়ও ঐ একই কথা। আজকাল আমরা হাইকোর্টের দুটি অংশ দেখি—একটি ওরিজিনাল, অপরটি অ্যাপেলেট। এই দুইটি অংশ সুপ্রিম কোর্ট ও সদর আদালত সমূহের স্মৃতি বহন করছে।

তৃতীয় শ্রেণীর আইন হ'ল পার্লামেণ্ট কর্তৃক সিবিল সার্বিস সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন। সে যুগের নেতৃবর্গের এই বিশ্বাস ছিল যে, প্রশাসন ক্ষেত্রে শাসক জাতির সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হলে স্বদেশের হিত সাধন বেশী করে সম্ভব হবে। আর এই জন্য সভা সমিতি মারফত তারা দীর্ঘকাল আন্দোলন পরিচালনা করে এসেছেন। ভারতবর্ষীয় সভার প্রস্তাব সম্বন্ধে এখানে পুনরায় কিছু বলি। ১৮৫৩ সনের সনন্দে সিবিল সার্বিস এবং সমগোত্রীয় পরীক্ষাসমূহকে সাধারণের নিকট উন্মুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ অধিবাসী বা প্রজা নির্বিশেষে সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হতেন। কোন একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা আর নিবদ্ধ থাকে নি। ভারতবর্ষীয় সভা কিন্তু পূর্ব থেকেই এই যুক্তি দেখান যে, বিলাতে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হেতু বিলাতবাসীদেরই সুবিধা হ'ল। যদিও সর্বসাধারণের নিকট এর দ্বার উন্মুক্ত তথাপি কালাপানির পারে ভারতীয় যুবকদের যাতায়াতের অসুবিধা হেতু তাদের নিকট কার্যত এর দ্বার রুদ্ধই রয়ে গেল। সভা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বারে বারে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যেন তারা লণ্ডনের মত কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ শহরেও একই কালে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। উক্ত আইন বলে স্থির হ'ল লণ্ডনেই সিবিল সার্বিস ও অনুরূপ পরীক্ষাদি গ্রহণ করা হবে, ভারতবর্ষের কোন শহরে নয়। এর ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। এই প্রশ্নটিকে ভিত্তি করে আমাদের জাতীয় আন্দোলনও বেশ দানা বেঁধে ওঠে।

ভারতবর্ষীয় সভা বসে রইলেন না। তারা এজন্য বিলাত পর্যন্ত আন্দোলন

উপস্থিত করলেন। তখন এর পক্ষে অনেকটা সুবিধাও ছিল। ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষাকল্পে বিলাতেও সংঘবদ্ধভাবে প্রযত্ন আরম্ভ হয়। পূর্বে ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটি নামে একটি সভা বিদ্যমান ছিল। এক সময়ে ভারতবর্ষীয় সভার এজেণ্টরূপে এই সোসাইটি লণ্ডনে কার্য করেন। ১৮৬৫ সনে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাতে উপস্থিত ছিলেন। দাদাভাই নৌরজীও কর্মব্যপদেশে লণ্ডনে উপস্থিত। প্রধানত এই দুইজনের উদ্যোগে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ১৮৬৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাদাভাই হলেন এর সভাপতি, উমেশচন্দ্র সম্পাদক। এই সভার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সভার সত্বর সংযোগ স্থাপিত হ'ল। দেখি সোসাইটির সম্পাদক উমেশচন্দ্রের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে সহ-সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে পত্র ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে।

সিবিল সার্বিস আইনের কথা এই মাত্র বললাম। বিলাতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দেন (১৮৬৩ খ্রী.) এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তাঁর সঙ্গী মনোমোহন ঘোষ প্রথমবারে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। পরীক্ষক-মণ্ডলী নিয়ম কানুন এমনভাবে রদ বদল করলেন যার দরুন মনোমোহন দ্বিতীয় বারেও উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। তৃতীয় বারেও তিনি পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এবারে আর এক বাধা দেখা দিল। কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স তেইশ বৎসর থেকে কমিয়ে একুশ বৎসর করে দিলেন! বিলাতস্থ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ওখানে বসেই কর্তৃপক্ষের নিকট এরূপ রদবদলের ঘোর প্রতিবাদ জানালেন এবং এর প্রতিকার যাজ্ঞা করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। এ দেশে ভারতবর্ষীয় সভাও সোসাইটির স্বপক্ষে এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কারসাজির বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করলেন। আশু ফল ফল্‌লো না বটে, কিন্তু তখন শিক্ষিত ভারতবাসীরা বুঝতে পারলেন ব্রিটিশের মতিগতি কোন দিকে প্রধাবিত হচ্ছে।

বস্তুতঃ এই সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীর প্রতি খুবই বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। ক্যানিংএর পর বড়লাট এলগিন এই ভেবে ফাঁপরে পড়লেন যে, একদিকে ভিক্টোরিয়ার উদার ঘোষণা এবং অন্যদিকে ব্রিটিশের ঘোরতর

রক্ষণশীল নীতি এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা এক দুরূহ ব্যাপার। এলগিন ভারত সচিব চার্লস উডকে (ইনিই প্রথম ভারত সচিব বা সেক্রেটারি অব স্টেটস্) লিখলেন যে, গণ্যমান্য ও সুশিক্ষিত ভারতবাসীদের যদি শাসন কার্যের অংশী না করা হয় তা হলে তারা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সরকারের ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন। আর যদি শাসন ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা গ্রাহ্য হয় তা হলে ব্রিটিশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটবে। তখন কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যতটা সম্ভব প্রভুত্ব নিজেদের হাতে রেখে কোন কোন অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বশীল পদে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা চলবে। কাজেও হ'ল তাই। কয়েক বৎসর পূর্বে কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বহু মেধাবী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যথাযোগ্য কর্মের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু তাদের খুব কম দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হ'ল। এলগিনের কথায় সরকার এইরূপই চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত সুশিক্ষিত মেধাবী যুবককে মাত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি ও কলেক্টরি নিয়েই নিরস্ত হতে হয়েছিল। বহু শিক্ষিত যুবক, যেমন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত স্বাধীন আইন ব্যবসায়কেই বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এদের অনেকেই কিন্তু শেষে জনসাধারণের নেতৃত্বও গ্রহণ করলেন। এ দিক দিয়ে এলগিনের কথা খুবই ঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়। এ সময়কার সরকারী নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করলে আমাদের ধারণা অধিকতর পরিষ্কার হবে। পাদ্রি টমসন ও গ্যারেট বলেন, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধ্বংসাবশেষের উপর যে শাসন কাঠামো খাড়া করা হ'ল তাতে শিক্ষিত ভারতবাসীর স্থান ছিল না বললেই চলে। মেজর ইভান্স বেলও লিখেছেন, ১৮৬২ সালে যখন হাইকোর্ট ও ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন এদেশীয়দের দায়িত্বপূর্ণ পদ-দান সম্বন্ধে খুবই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু পরে অতি সামান্যই কার্যে পরিণত করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষীয় সভা আমাদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তখনকার দিনে কর্তৃপক্ষের মতিগতি সম্যক জেনেও সরকারী বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ও আন্দোলনে সভা রত হয়েছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত থেকে

অর্থনীতি বিশারদ জেম্‌স উইলসন্‌কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ দেশে পাঠালেন সরকারী আয় ব্যয়ের সমতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। তিনি অবিলম্বে আয়কর ও লাইসেন্স কর প্রবর্তনের সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। আয়করের প্রস্তাব ছিল বড় আশ্চর্য রকমের। বার্ষিক দুইশত টাকা আয়ের উপর আয়কর বসাবার প্রস্তাব করলেন উইলসন্। ভারতবর্ষীয় সভা তখন এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন ও তীব্র প্রতিবাদ করে তথ্য প্রমাণ সহযোগে এর অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে দিলেন। বৎসরখানেক অবিরাম আন্দোলনের পর দুইশত টাকা হতে বাড়িয়ে পাঁচশত টাকার উপরে আয়কর ধার্য করাতে সমর্থ হলেন। পাঁচ বৎসরের জন্য ছিল এই প্রস্তাব। পূর্বেই বলেছি, পার্লামেণ্টারী অপোজিশন বা বিরোধী দলের মত ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর কার্য করেছেন। জাতীয় স্বার্থহানিকর প্রস্তাবগুলির বিপক্ষে যেমন তারা লড়েছেন, তেমনি সমাজের ও দেশের কল্যাণকর যাবতীয় সরকারী প্রচেষ্টারই তারা ছিলেন প্রধান সমর্থক। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সরকারী উদ্যোগে এক বিরাট কৃষি প্রদর্শনী হয়। এখানে কৃষি সংক্রান্ত স্বদেশীয় যন্ত্রপাতি, কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য এবং কৃষির সহায়ক বিবিধ বিষয়ের নমুনা প্রদর্শিত হয়েছিল। কৃষি প্রদর্শনীর সাফল্যকল্পে ভারতবর্ষীয় সভার ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তারা বাঙলায় ইস্তাহার প্রকাশ করে প্রতিটি জেলায় জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং বিবিধ উপায়ে প্রদর্শনী ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার ব্যাপারে সরকারের সহায়তা করেন। সভার এই কার্য সম্পর্কে সরকার পরে সপ্রশংস স্বীকৃতি দেন। প্রদর্শনীটি এত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যে, এ সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তর আলোচনাও লক্ষ্য করেছি। ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতম প্রধান মনীষী-প্রবর কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রদর্শনী সম্বন্ধে বেথুন সোসাইটিতে ১৮৬৪, ১০ই মার্চ একটি সারগর্ভ প্রবন্ধও পাঠ করেছিলেন। সভার আর একজন বিশিষ্ট সদস্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃপক্ষের নিকট এর সাফল্য দেখে প্রস্তাব করেছিলেন তারা যেন উচ্চতর বিদ্যালয়-সমূহে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সরকার কিন্তু এ প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাত করেন নি।

এ সময়ে ভারতবর্ষীয় সভার আর একটি প্রধান কার্য তৎকালীন ম্যালেরিয়া জ্বর মহামারীর কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকার সম্বন্ধে সরকার যে কমিটি স্থাপন করেন তাতে সক্রিয় সহায়তা প্রদান। সভার পক্ষে দিগম্বর মিত্র

(পরে রাজা) এই কমিটির সম্মুখে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-প্রসূত অভিমত প্রকাশ করেন। এটি এখনও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তখন দিকে দিকে রেলপথ বিস্তৃতিলাভ করছে, বড় বড় সড়ক নির্মিত হচ্ছে। জল চলাচলের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালীসমূহ এ দুইয়ের দরুন রুদ্ধ হয়ে যায়। স্থানে স্থানে বিস্তৃত জমির উপরে জল জমে। এই জল মাটিতে মজিয়া মজিয়া 'মায়াজমা'র সৃষ্টি করে। মায়াজমা হ'ল মজা স্থল থেকে উত্থিত এক প্রকার দূষিত বাষ্প। এ থেকে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জন্ম। মশক এই জীবাণুর বাহক মাত্র। অবশ্য মজা ডোবা, পুকুর বা জলায় সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মশকেরও উদ্ভব হয়। দিগম্বর মিত্র প্রদর্শিত এই কারণ সম্বন্ধে কমিটি অবহিত হন। কিন্তু সরকারী নীতি যে ভিন্নরূপ। সাধারণ মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের কথা কে ভাবে!

এই দশকের প্রথমাবধি ইউরোপীয়েরা আসামের শ্রীহট্ট কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলে চা বাগিচা স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এ জন্য বিস্তর শ্রমিক (তখনকার পরিভাষায় 'কুলি') প্রয়োজন হত। সরকার পরপর ১৮৬৩ ও ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য দু'টি আইন পাশ করান। দ্বিতীয় আইনটি ছিল খুবই মারাত্মক। চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে বাগিচা পরিত্যাগেচ্ছু যে কোন শ্রমিককে চা-কর এবং তাদের কর্মচারীরা পুলিশের সাহায্য ব্যতিরেকেই গ্রেফতার করার অধিকার পায়। এতে যে কত অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে ভারতবর্ষীয় সভা সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভা বল্‌লেন—একশ্রেণীর লোককে অপর এক শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতা হরণের অধিকার দেওয়ায় শাসনের মূল নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। এরূপে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা আইন বিগর্হিত কাজ। কিন্তু সভার প্রতিবাদে তখন কোন কাজ হয় নি। চা-বাগিচার শ্রমিকদের উপর উৎপীড়ন নিপীড়নের সীমা রইল না। তারা ক্রমে ক্রীতদাসে পরিণত হবার উপক্রম হ'ল। এ ব্যাপারটি আমাদের অন্যতম জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ রসদ যোগায়।

ভারতবর্ষীয় সভার কল্যাণকর কার্যকলাপ শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাদের নেতৃস্থানীয়েরা একে একে এর সদস্য শ্রেণীভুক্ত হলেন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি একে একে সভার সঙ্গে যুক্ত হন। সভার শাখা সমিতিও নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই প্রসঙ্গে আলিগড়ে প্রতিষ্ঠিত সভাটির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সুবিখ্যাত সৈয়দ আহ্‌মেদ খাঁ (পরে স্যর)। ভারতবর্ষীয় সভার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জন্য তথাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আলিগড়ে এই সভা স্থাপন করলেন। ভারতবর্ষীয় সভার তৎকালীন সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং উক্ত সভার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা সৈয়দ আহ্‌মেদের মধ্যে এ সম্পর্কে ১৮৬৬ সনের মাঝামাঝি যে চিঠি পত্রের আদান প্রদান হয় তা থেকে আমরা সৈয়দ আহ্‌মেদের আগ্রহাতিশয্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভা ছিল মুখ্যত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদিও বিবিধ কল্যাণকর্মের দিকেও এর কর্তৃস্থানীয়দের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মনীষী রাজনারায়ণ বসু সত্য সত্যই বলেছেন রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে ভারতবর্ষীয় সভা সে যুগে এত তৎপর হয়েছিলেন যে, সাধারণের নিকট এ একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলেই প্রতিভাত হয়। তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কঠোর মনোভাবের বিরুদ্ধে জাতিকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করার পক্ষে আরও অনেক প্রচেষ্টার আবশ্যক। রাজনীতির দিক থেকে আমাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আমরা স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পারি। আর এর মধ্যেই আমরা আমাদের শক্তির সন্ধান পাই। আত্মশক্তি উন্মেষের পক্ষে তখন দুই ধরনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। আমরা একে আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি এবং আত্ম সংগঠন আখ্যা দিতে পারি।

প্রথমটি অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায় স্বরূপ সুরাপান তথা মাদকদ্রব্য নিবারণ সম্পর্কীয় আন্দোলনের কথা উল্লেখ করতে হয়। গত শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ইতর ভদ্র সমাজের বিভিন্ন স্তরে সুরাপান ব্যাপক আকার ধারণ করে। আর এ মহামারীর মত সমাজ দেহকে জীর্ণ ও ক্ষয় করতে থাকে। দেশী বিদেশী মানব দরদী ব্যক্তিগণ সুরাপানের প্রাদুর্ভাব দেখে খুবই বিচলিত হন। আমেরিকান পাদরি সি. এইচ. এ. ড্যাল পঞ্চাশের দশকে সুরাপান নিবারণ উদ্দেশ্যে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন এবং দেশীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর

লোকেদের দ্বারা তাতে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। রাজা রাধাকান্তদেব সুরাপানের কুফল সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি ড্যাল সাহেবের উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র বাঙলায় অনুবাদ করিয়ে পঞ্চাশ খণ্ড তাঁকে পাঠান। সুরাপান নিবারণকল্পে ষাটের দশকে প্রথমাবধিই কলকাতা ও মফস্বলে নানা রকম হিতকর প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে বলার পূর্বে ড্যাল সাহেবকে লেখা রাধাকান্ত দেবের একখানি পত্র (২৩শে নভেম্বর ১৮৬৩) এখানে প্রদান করা আবশ্যক। এতে তখনকার সুরাপানের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে জানা যাবে। পত্রখানি এই :

"প্রিয় সুহৃদ ! আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমার মনোবৃত্তিসকল অদ্যাপি যুবার ন্যায় সবল আছে। বিশপ হিবর সাহেব এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় অবধি বঙ্গদেশের যে আচার ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি মহৎ বিষয়ের পরিবর্তন হইয়াছে, সেই সমুদয় আমি সচক্ষে দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কতকগুলির নিমিত্ত পরমারাধ্য পরমেশ্বরকে অহরহ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। আর কতকগুলি বিষয় এইরূপ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, যাহাতে দুঃখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। ঐ সকলের মধ্যে মদ্যপান স্পৃহা বহু বিস্তৃত হইয়াছে ; এবং দিন দিন অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে। সুরাপান যে কত দোষাবহ তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন , এতদ্দেশীয় কি অন্য দেশীয় শাস্ত্রকারেরা তাহা নিন্দনীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। পান দোষ বৃদ্ধির প্রথম কারণ এই যে, মদ্যশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে যেমন মক্ষিকাগণ মাকড়সার জালে বদ্ধ হয়, সেইরূপ অবিমৃষ্যকারী যুবকগণ উহাতে প্রলোভিত হইতেছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নির্বোধ ব্যক্তিগণ আপনার দোষে এই নিন্দনীয় দোষে দূষিত হইতেছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, লোকে যাহাতে মাদকদ্রব্য হইতে পরাঙ্মুখ হয়, সেই বিষয়ে যত্নসহকারে চেষ্টা করুন এবং এতদ্দেশীয় যুবকগণকে মদ্যপানরূপ বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সতর্ক হইয়া পরিশ্রম স্বীকার করুন। সাধ্যানুসারে যতদূর পারেন, মাদক নিবারণরূপ পবিত্র যুদ্ধে লোকদিগকে সৈন্যরূপে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করুন। আমি অবগত আছি যে, শত শত হিন্দু যুবকগণ উপদেশ ও পরমার্থ প্রাপ্তির আশায় আপনার নিকট গমন করিয়া থাকেন এবং আপনি ভ্রমণকালীন কিংবা কোন সাধারণ সমাজে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে চিত্তোন্মাদক মাদকদ্রব্য

হইতে বিরত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রিয়তম ড্যাল, আমার এই সকল অভিমত বাক্যের যত অনুসরণ করিতে পারেন, তত চেষ্টা করিবেন।—রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর (১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৩ তারিখে 'সোম প্রকাশে' প্রকাশিত ইংরেজীর অনুবাদ)।

পত্র লেখার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব থেকেই ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে সুরাপানের শুরু। অনেকে বেচারা ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যবর্গকে সুরাপানের প্রাদুর্ভাবের জন্য দোষী করেন। আসলে কিন্তু এ জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তা হলে তিনি হলেন যুগমানব রাজা রামমোহন রায়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—রাজার পক্ষে যা পরিমিত সুরাপান ছিল সাধারণের পক্ষে তা হয়েছিল বিষবৎ। এই অনুকৃতি ক্রমে ভদ্র তথা শিক্ষিত সমাজ থেকে ইতর অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ষাটের দশক নাগাদ এই ব্যাধি মহামারীরূপে, একটু আগেই যা বলেছি, সমাজ দেহকে ক্ষয় করতে থাকে। চিন্তানায়কগণের দৃষ্টি যে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি এদিকে পড়ে তার কথা একটু আগেই বলেছি। পরবর্তী দশক আরম্ভ হতেই বঙ্গ মনীষীরা এই ব্যাপক মহামারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দেন। এ বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই মনীষী রাজনারায়ণ বসুর প্রযত্নের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্যকালে বহুহিতকর প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেন। তার মধ্যে প্রধান একটি হল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ সুরাপান নিবারণ আন্দোলন। রাজনারায়ণ লিখেছেন—"২২ ফাল্গুন [১৮০১ শক] পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে পান দোষের প্রাবল্য ও মদ্য পান জন্য সভ্যতাভিমান ও ইংরাজী ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে আমা কর্তৃক সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন ও তজ্জন্য তথাকার মাতালদিগের দ্বারা আমার বিলক্ষণ পীড়ন এই সকল বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক গল্প হইল। এই সভা বঙ্গ দেশে স্থাপিত প্রথম সুরাপান নিবারণী সভা।...ঐ সভার অনুষ্ঠান পত্রে লিখিত ছিল যে, পরিমিত মদ্যপান করা কেমন, না বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা। ঐ ছিদ্র ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া সর্বনাশ সাধন করে। মেদিনীপুরে এই সুরাপান নিবারণী সভার জন্য আমার যত পীড়ন হয়, ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার জন্য তত হয় নাই।...ঐ সময়ে কলিকাতাবাসী পরলোকগত তখনকার হিন্দু সমাজ

চূড়ামণি বঙ্গদেশের প্রথম কে. সি. এস. আই [রাজা রাধাকান্ত দেব]-এর পৌত্র মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাকে আমার দলে আনাতে মাতালেরা আমার উপর বিশেষ চটিয়াছিল, যেহেতু তাঁহার বাসা তাহাদিগের বিশেষ আড্ডা ছিল। তিনি যখন মদ্যপান পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করিয়া আপনার সহধর্মিণীকে তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমাকে লক্ষ টাকা দিলেও যত না সুখী হইতাম, এই ক্ষুদ্র কাগজটি দেওয়াতে আমি তদপেক্ষা সুখী হইলাম।"—'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' শ্রাবণ, ১৮০৫ শক।

রাজনারায়ণ ১৮৬১ সনে মেদিনীপুরে এই সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেন। এর দুই বৎসর পরে ১৮৬৩, ১৫ই নভেম্বর কেন্দ্রস্থল কলকাতায় ব্যাপকতর উদ্দেশ্য নিয়ে বেঙ্গল টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন বা সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং সমাজ-হিত-কর্মী প্যারীচরণ সরকার। প্যারীচরণ ইতিপূর্বে যখন বারাসাত গভর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন সেখানে বালিকা বিদ্যালয় এবং কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনে বিশেষ অগ্রণী হন। কলকাতাস্থ কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের (পরে হেয়ার স্কুল) প্রধান শিক্ষকরূপে যোগ দেন ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি এই আত্মঘাতী সুরাপান ব্যাধির কুফল সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হতে থাকেন। পরে উক্ত সনে সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপনে তৎপর হন। তাঁর এই কার্যে প্রধান সহায়করূপে পান পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাদরি সি. এইচ. এ. ড্যাল এবং কেশবচন্দ্র সেনকে। সুরাপান নিবারণকল্পে কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টা পরবর্তী দশকে এক সার্থকরূপ গ্রহণ করে, একথা পরে আলোচ্য। প্যারীচরণ সভার উদ্দেশ্য প্রচারকল্পে এবং সুরাপানের অপকারিতা সাধারণের গোচরে আনবার জন্য দুইখানি পত্রিকা বার করলেন। —ইংরাজী 'ওয়েল উইশার' এবং বাংলায় 'হিতসাধক'। ঐ সময়ে আলালের ঘরের দুলাল প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচাঁদ মিত্রও সুরাপানের অপকারিতা প্রতিপাদন করে পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। একখানি পুস্তকের নাম—মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়। তখন এই যে আন্দোলন শুরু হয় তা পরবর্তী দশকে, যেমন একটু আগেই বলেছি, কেশবচন্দ্রের চেষ্টা ও উদ্যোগে এবং তার

পরেও ভারত সভার নেতৃবর্গের আন্দোলনের ফলে কতকটা প্রশমিত হয়। কিন্তু এ ব্যাধি সমাজের সর্বস্তরে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে একে দুর্বল করে তোলে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে মহাত্মা গান্ধী স্বরাজলাভার্থ যে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করেন তারও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এই সুরাপান নিবারণ তথা মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন।

জাতির আত্মশক্তি ফিরিয়ে আনতে হলে একদিকে যেমন আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনি আত্মসংগঠনের প্রতিও অবহিত হওয়া দরকার। তখন ইংরেজের জাতি বৈরিতা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। বেথুন সোসাইটিতে বিদগ্ধ ইউরোপীয় ও ভারতীয়গণ মিলিত হয়ে রাজনীতি ব্যতিরিক্ত বিবিধ বিষয়, যেমন, শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপৃত হতেন। বাঙালীর শারীর চর্চা সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ লিখিত একটি প্রবন্ধের উপর আলোচনাকালে (১২ মার্চ, ১৮৬৮) সোসাইটির সদস্য বারাসাত নিবাসী তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন ইংরেজ এদেশ ছেড়ে না গেলে কারো কল্যাণ নেই—না ইংরেজের, না ভারতবাসীর। ইংরেজ যতশীঘ্র ভারত ত্যাগ করেন ততই উভয়ের মঙ্গল। পঁচাত্তর বৎসর পূর্বেকার এই উক্তির মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের (১৯৪২) বীজ আমরা লক্ষ্য করি না কি? এই সময়ে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' নূতন কথা ও সুর নিয়ে বঙ্গভূমে আবির্ভূত হ'ল (১৮৬৮, ২০ ফেব্রুয়ারি)। অধীনতার জ্বালা তখনকার দিনে শিক্ষিত ভারতবাসীরা কত গভীর ভাবে অনুভব করছিলেন তার প্রতিফলন এই পত্রিকার শিরো-ভূষণের মধ্যে আমরা কতকটা প্রাপ্ত হই।

অধীনতা কালকূটে মরি হায় হায়
করেছে কি আর্য সুতে চেনা নাহি যায়॥

কিন্তু এই যে নবভাবনাকে আমরা নবজাতীয়তাবোধ আখ্যা দিয়েছি, একে বস্তুগত করার পক্ষে বিশেষ আয়োজন দরকার। এ ক্ষেত্রেও দেখি মনস্বী রাজনারায়ণ বসু জাতির নবভাবনাকে একটি স্পষ্টরূপ দিতে এগিয়ে এসেছেন। মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি এই দশকের প্রথমে জাতীয়

গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা (অথবা জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা) প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বৎসর চলবার পর সভার কার্যক্রমের ভিত্তিতে রাজনারায়ণ একখানি অনুষ্ঠান পত্র রচনা করেন। এখানি প্রথম প্রকাশিত হতে দেখি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। আমাদের জাতীয়তা সূক্ষ্ম-স্বাতন্ত্র্য-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই তবে সার্থক হবে এর মধ্যে তা পরিব্যক্ত হয়েছে। অনুষ্ঠানপত্র-খানিতে রাজানারায়ণ যে সব বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে বলেছেন সেগুলি হ'ল এই : স্বদেশীয় ব্যায়াম, সঙ্গীত, চিকিৎসা বিদ্যা, ইংরাজী শিক্ষারম্ভের পূর্বেই বালক-বালিকাদের যথোপযুক্তরূপে মাতৃভাষা শিক্ষা দান, সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার অনুশীলন, বাঙলা শব্দ ব্যবহার দ্বারা কথোপকথন, ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাঙলা ভাষায় পরস্পরকে পত্র লেখা, বাঙালীর সভাতে বাঙলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান, সুরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা এ দেশে যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন, হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন করে সমাজ সংস্কার কার্য সম্পাদন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রমুখ স্বদেশীয় সুপ্রথা সকল রক্ষা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন, ১লা জানুয়ারির পরিবর্তে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উদ্‌যাপন, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার সম্পূর্ণ বর্জন, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় প্রভৃতি।

রাজনারায়ণ, লিখেছেন নবগোপাল মিত্র জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করার পরে হিন্দু মেলার ভাব তাঁর মনে প্রথম উদিত হয়। আমাদের আত্মসংগঠনী শক্তি প্রথম রূপ পরিগ্রহ করে এই হিন্দু মেলার মধ্যে। আর এর প্রধান উদ্গাতা ছিলেন নবগোপাল মিত্র।

কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকজন যুবকের উপর বিবিধ উদ্যোগের ভার দিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন নবগোপাল মিত্র। তিনি পাঠদ্দশায়ই ঠাকুর বাড়ির সংস্পর্শে আসেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণনা লাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা তাঁর মধ্যে যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। তিনি মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দু মেলা স্থাপন করেন। এই মেলা সম্বন্ধে একটু পরেই বিস্তারিত ভাবে বলব। নবগোপাল জাতীয়তা মন্ত্রে কতখানি উদ্বুদ্ধ

হয়েছিলেন তাঁর বিশেষ পরিচয় নানা কার্যের ভিতর দিয়ে আমরা পেয়ে থাকি। দেবেন্দ্রনাথের অর্থ ও সাহায্যে তিনি 'ন্যাশনাল পেপার' বার করেন। নবগোপাল ছিলেন 'ন্যাশনাল' কথাটির বড় ভক্ত। তাঁর কুস্তির আখড়ার নাম ন্যাশনাল জিমনাসিয়াম, সভার নাম ন্যাশনাল সোসাইটি, স্কুলের নাম ন্যাশনাল স্কুল, হিন্দুমেলার ইংরেজী নাম ন্যাশনাল গ্যাদারিং। স্বদেশবাসীরা আদর করে তাঁর নাম দিয়েছিলেন ন্যাশনাল নবগোপাল বা ন্যাশনাল মিত্র। তিনি হিন্দু-জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজকে জাতীয়তার পতাকা-তলে সমবেত করে এক নবজাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

জাতি-গঠনে কেশবচন্দ্র সেন

১

হিন্দু মেলার কথা এইমাত্র সংক্ষেপে কিছু বল্‌লাম। হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আত্মনির্ভর শক্তির বিকাশ যাতে হয় হিন্দু মেলার এটি ছিল প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ভারতীয় মহাজাতির একটি অংশ অথবা প্রধান অংশ ছিল এই হিন্দু সমাজ। হিন্দুগণ প্রথমাবধি ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে উন্নতি-চিন্তায় অগ্রসর হন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বারবার বাধা পেয়ে নব্য শিক্ষা প্রাপ্ত যুব সমাজের মনে হীনমন্যতার উদ্রেক হওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল। আবার অধিকতর প্রতিপত্তিশালী ইংরেজের অনুকরণ স্পৃহাও তাদের ভেতরে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এ কারণ একদিকে হীনমন্যতা এবং অপর দিকে পরানুচিকীর্ষা এই দুইই নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের যথোপযুক্ত উন্নতিতে ব্যাঘাত জন্মায়। তাই হিন্দুমেলার আবির্ভাব যেমন সময়োচিত হয়েছিল তেমনই এর কর্ম প্রণালীর দ্বারা তাদের মনে আত্মনির্ভর বা স্বাবলম্বন জাগ্রত হয়। এখানেই এর সার্থকতা। কিন্তু জাতীয় জীবনে কেশবচন্দ্র এক নূতন ভাব ও কর্মের সূচনা করলেন। শিক্ষিত সাধারণ কেশবচন্দ্রকে ধর্মীয় নেতা বলেই জানেন। কিন্তু তাঁর বিবিধ প্রচেষ্টার দ্বারা, তিনি জাতীয়তার যে পুষ্টিসাধন করেছিলেন এখানে সেটাই একটু বিস্তারিতভাবে বলতে চাই। কেশবচন্দ্র সেনের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে বাঙলা ইংরেজী এক বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ সব থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন। এখানে জাতীয়তাবোধের উন্মেষকল্পে তিনি যে ধরনের কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন তাই বিশেষ করে বলব। তবে এ কথা বলতে গেলে তাঁর জীবনের গতি প্রকৃতির বিষয়ও অনেকটা এসে যায়।

কেশবচন্দ্র ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের মূল উদ্দেশ্য দুটি: মানুষের মধ্যে ঈশ্বর প্রীতি জন্মানো এবং পরোপকার বৃত্তির উন্মেষসাধন। এই দুটি কার্যেই দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে বিশেষ সহায়রূপে পেলেন। তাঁর ব্রাহ্ম সমাজকেও অনুরূপভাবে

গঠন করলেন। যারাই কেশবচন্দ্রের জীবনী পাঠ করেছেন, তারাই লক্ষ্য করে থাকবেন কৈশোর থেকে মানুষের সেবা কার্যে তাঁর কত আগ্রহ। হিন্দু ও মুসলমান দরিদ্র ছাত্রদের জন্য তিনি পাঠদ্দশায়ই কলুটোলায় একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার পর তিন বৎসরের মধ্যেই কেশবচন্দ্র তাঁরই সহযোগে বিবিধ কল্যাণ কর্মে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ, যার কথা পূর্বে বলেছি, সংশিক্ষা ও সুশিক্ষা প্রচার কল্পে প্রকাশ্য সভার আয়োজন, ১৮৬১-৬২ সনে ভাগীরথীর উভয় তীরে জ্বর মহামারীতে আক্রান্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে সদলবলে সেবাকার্য—এই সকল কথা প্রথমে আমাদের জেনে রাখা দরকার।

এখানে 'সদলবলে' বলেছি। কেশবচন্দ্রের প্রায় সমবয়সী ধর্মপ্রাণ এবং সেবা পরায়ণ একদল যুবক এসে তখন ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। প্রৌঢ় দেবেন্দ্রনাথ এবং যুবক কেশবচন্দ্রের ধর্ম বিষয়ক উপদেশে তাঁরা সবিশেষ মোহিত ও অনুপ্রাণিত হন। সেবা কার্যেও তাঁরা সাগ্রহে লিপ্ত হলেন। এ বিষয়ে যুবক কেশবচন্দ্রের মধ্যেই তাঁরা আপনজন খুঁজে পান। এই যুবকদলের মধ্যে ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমার ঘোষ, উমানাথ গুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত প্রভৃতি। এই দশকের শেষার্ধে একান্তভাবে কেশবচন্দ্রের অনুগামী হয়ে আসেন গিরিশচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী) এবং কৃষ্ণবিহারী সেন। আরও এমন অনেকে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন যাঁরাও ছিলেন ধর্ম ও সেবা কার্যে সমান তৎপর। বাহুল্যবোধে নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত রইলাম।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের অর্থে ও উৎসাহে এবং সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক পরবর্তীকালের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও জাতীয় নেতা মনোমোহন ঘোষের সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান মীরর' নামক ইংরেজী পাক্ষিক পত্র (১লা আগস্ট) প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কেশবচন্দ্র প্রথমাবধি মীররের বৈষয়িক সম্পাদক বা পরিচালক ছিলেন। এখানে বলে রাখি, ১৮৬৫ সনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ যখন সম্পূর্ণ হয় তদবধি সেন মহাশয় এই পত্রিকাখানির সম্পূর্ণ ভার নিলেন, কিছুকাল সম্পাদনা কার্যেও ব্রতী হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের

ধর্মপ্রাণতা এবং সেবাকার্যে তৎপরতা দেখে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬২, ২৩শে জানুয়ারি তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধির দ্বারা ভূষিত করেন। পরবর্তী ১৩ই এপ্রিল, বাঙলা নববর্ষ দিবসে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদেও অভিষিক্ত হন।

কেশবচন্দ্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে গিয়ে ব্রাহ্মধর্মের উপরে একটি বক্তৃতা করেন। নদীয়া কৃষ্ণনগর ছিল খ্রীষ্টান পাদ্‌রিদের একটা মস্তবড় প্রচার কেন্দ্র। তাঁদের বিরুদ্ধে এবং স্বীয় ধর্মের সপক্ষে এমন বক্তৃতা ঐ অঞ্চলবাসীরা ইতিপূর্বে কখনও শোনেন নি। প্রগতিশীল রক্ষণশীল নির্বিশেষে হিন্দুগণ সকলেই এই বক্তৃতার ফলে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। তাঁদের আত্মপ্রত্যয় যেন ফিরে এল। তখন কেশবচন্দ্রের কথা সকলের মুখে মুখে। এর তিন বৎসর পরেও ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু কৃষ্ণনগরে পড়তে গিয়ে কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতার কথা শুনতে পান। তিনি নিজ স্মৃতি কথায় এ বিষয়ে উল্লেখও করেছেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার পরে প্রদত্ত পাদ্‌রি ডাইসনের প্রত্যুত্তর লোকের মনে আদৌ রেখাপাত করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি। এই দশকেই ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র একবার পাদ্‌রিদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন। প্রতিপক্ষ 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' সম্পাদক রেভারেণ্ড লালবিহারী দের খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় যুক্তির প্রতিবাদে কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন তাতে ইউরোপীয় পাদ্‌রিগণও স্তম্ভিত হন। ডাফ পর্যন্ত এই মন্তব্য করলেন যে, ব্রাহ্ম সমাজ আমাদের মধ্যে একটি শক্তি স্বরূপ, একে লঘুভাবে দেখলে ভুল করা হবে।

১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য—সুশিক্ষা ও সৎ-শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম সমাজের একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠান। ব্রহ্মবন্ধু সভার তত্ত্বাবধানে কেশবচন্দ্র বক্তৃতায় নীতিধর্ম বিহীন শিক্ষা তখন সমাজের পক্ষে কত অনিষ্ট সাধন করছে এবং নীতিধর্মভিত্তিক শিক্ষা সমাজের পক্ষে কত কল্যাণকর হতে পারে সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তৎকালীন স্ত্রী শিক্ষার অব্যবস্থা সম্বন্ধেও বক্তৃতায় তিনি আবেগ ভরে উল্লেখ করলেন। এই সভার পর একটি উৎকৃষ্ট ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশে ও বিলাতে অর্থসংগ্রহের আয়োজন হয়। এর ফলশ্রুতি কলিকাতা কলেজ নামে একটি আদর্শ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন। বলা বাহুল্য এখানে নীতিধর্ম শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র অনুপ্রাণিত একদল যুবক, কেশচন্দ্রেরই আগ্রহাতিশয্যে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন করলেন। এর অভিনবত্ব লক্ষণীয়। তখন অল্পবয়স্ক বালিকাগণের পক্ষে দু তিন বৎসর মাত্র পাঠশালায় পড়া সম্ভব হত। চর্চার অভাবে পঠিত বিষয়গুলিও বিবাহের পরে তারা ভুলে যেতেন। সুতরাং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা তারা খুব কমই উপকৃত হতেন। অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা পরিবারস্থ বালিকা ও নারীগণের শিক্ষা দান ব্যবস্থায় রত হন। ব্রহ্মবন্ধু সভার তত্ত্বাবধানে যুবকগণ পাঠক্রম তৈরি করে বিভিন্ন স্থলে পাঠাতেন, প্রয়োজন স্থলে বই পত্রও সরবরাহ করতেন। তাদের নির্দেশে পাঠোৎকর্ষ বিষয়ে মাঝে মাঝে জানাতে হত। ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক ও বাৎসরিক পরীক্ষারও তারা আয়োজন করতেন। পরীক্ষার ফল দেখে কৃতী ছাত্রীদের পুরস্কৃত করারও ব্যবস্থা হ'ল। এই সময় ১৮৬৩ সালে কয়েকজন যুবক ব্রাহ্ম মিলিত হয়ে বামাবোধিনী সভা স্থাপন করেন। এই সভার মুখপত্র হল 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (প্রতিষ্ঠাকাল আগস্ট ১৮৬৩; বাঙলা ভাদ্র ১২৭০)। পত্রিকার স্বত্ব-স্বামিত্ব এবং সম্পাদনা ভার ন্যস্ত হ'ল উমেশচন্দ্র দত্তের উপর। নাম থেকেই প্রকাশ স্ত্রী-জাতির উন্নতিকল্পে এই পত্রিকাখানির আবির্ভাব। অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার কথা প্রচারের ভার নিলেন এই পত্রিকা। বলা বাহুল্য কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণা ছিল এ সব কার্যের মূলে।

এখন পর বৎসরের কথায় আসি। এ বৎসরের একটি প্রধান কার্য কেশব চন্দ্র কর্তৃক দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা, মূল উদ্দেশ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার। ১৮৬৪, ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করেন এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দুই মাস কাটিয়ে এপ্রিল মাসে ফিরে আসেন। এই দুই প্রদেশের অধিবাসীদের সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সমুদয়ই অতি নিকট থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। এ দেশবাসীদের ভাল দিকটিই তিনি শুধু দেখেন নি, নানারকম ত্রুটি বিচ্যুতিও তাঁর চোখে ধরা দিল। তিনি কিন্তু সারটুকুই গ্রহণ করলেন। মাদ্রাজে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে একটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হ'ল। তিনি বোম্বাইতে গিয়েও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। একটি লক্ষ্য করবার বিষয় কেশবচন্দ্র সাধারণ মানুষকে কখন বাদ দেননি, তিনি তাদের অবস্থাও সম্যক জানতে চেষ্টা করতেন। তখনও

দাদাভাই নৌরজী বোম্বাইয়ে ছিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর স্বাদেশিকতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। এর পরেই দাদাভাই ব্যবসায় কর্ম উপলক্ষে বিলাতে চলে যান। কেশবচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে বোম্বাইবাসীরা একটি সমাজ স্থাপন করলেন। তাঁরা এর নাম দিলেন প্রার্থনা সমাজ। বিখ্যাত চিন্তানায়ক মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রাণ স্বরূপ।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে কেশবচন্দ্র স্বদেশে ফিরলেন, ১৮৬৪, এপিল মাসে। তিনি সমাজের বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। কেশবচন্দ্র ১৮৬৫, ১২ই জানুয়ারি বেথুন সোসাইটিতে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক সারগর্ভ বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশবাসীর কথা। বক্তৃতা শেষে বোম্বাই মাদ্রাজ ও বাঙলার অধিবাসীদের গুণাগুণ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র যে সব কথা বলেন তা আজিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বললেন প্রত্যেকটি প্রদেশরই এক একটি স্বতন্ত্র মিশন বা কর্মধারা আছে। বোম্বাইবাসীরা অর্থনৈতিক ব্যাপারে খুবই উদ্যোগী। এদের ব্যবসায় বুদ্ধি নিরতিশয় প্রখর। নূতন নূতন ব্যবসায় কর্মে লিপ্ত হয়ে এরা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় করতে তৎপর। মাদ্রাজীরা খুবই রক্ষণশীল। তাদের এই গুণটি হাল আমলের বিলাতী ফ্যাসান সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হবার পক্ষে বিষম বাধার স্বরূপ। তাদের এই রক্ষণশীলতা জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির এবং স্বদেশীয় আচারাদির পবিত্রতা রক্ষায় প্রহরার কার্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার কথাও কেশবচন্দ্র এই মর্মে বললেন যে, বাঙালীদের লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় এবং শিক্ষা-ব্যাপারের সমৃদ্ধি সাধন। এখানে অঞ্চলওয়ারী তিনটি প্রদেশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে কেশবচন্দ্রের জাতি গঠন প্রচেষ্টার একটি সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তী আলোচনায় এটি আমাদের নিকট আরও পরিষ্কার হবে।

এই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই কেশবচন্দ্রের সাংগঠনিক শক্তি বিকাশের এক নূতন পথ পাওয়া গেল। কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মী যুবকগণ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সংস্কার সাধনে যত্নপর হন। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু এ বিষয়টি ভাল চোখে দেখেন নি। লোকে সাধারণত উপাচার্যগণের উপবীত গ্রহণ ও ত্যাগ নিয়েই উভয়ের মধ্যে বিরোধের সূচনা দেখতে পান, কিন্তু বিরোধের

আসল বিষয় ছিল অন্য। কেশবচন্দ্র সংস্কারমূলক ব্যাপারগুলি ত্বরান্বিত করতে চাইতেন সন্দেহ নেই, কিন্তু দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের পর তিনি একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় মণ্ডলী স্থাপন করতে অভিলাষী হন, যা শুধু বাঙলার নয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ধর্ম সমাজগুলির মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপন করে পরস্পর উন্নতি সাধনে যত্নপর হবে। বঙ্গদেশে প্রতিনিধি সভা গঠিত হ'ল, নিয়মাবলীও রচিত ও গৃহীত হ'ল। প্রতিনিধি সভার কয়েকটি অধিবেশন এই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই হয়েছিল। কিন্তু এরূপ প্রতিনিধি সভা গঠনের প্রস্তাবেই দেবেন্দ্রনাথ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পাছে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিনিধি সভার হাতে চলে যায় এই আশঙ্কায় তিনি ট্রাস্টীর ক্ষমতা বলে তার কর্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন পরিচালক পদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বসান। কেশবচন্দ্রের পক্ষ হতে এর প্রতিবাদ হ'ল। তিনি প্রকাশ্য সভায় এরূপ কাজের সমালোচনা করতে ছাড়লেন না। এইভাবে বিরোধ ক্রমে বিচ্ছেদে পরিণত হ'ল। কেশবচন্দ্র সদলবলে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ হতে সরে দাঁড়ান। তিনি নিজ হস্তে 'ইণ্ডিয়ান মীরর'এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করলেন। একটি নূতন সংগঠন স্থাপনের দায় দায়িত্ব এসে পড়ল পূর্ণভাবে (ডিসেম্বর, ১৮৬৪) তাঁর উপর। তিনি সঙ্গীদের নিয়ে বিবিধ গঠনমূলক কার্যে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হন এই সময় থেকে।

২

কেশবচন্দ্র ১৮৬৬, ৫ই মে দিবসে "যিশু খ্রীষ্ট—ইউরোপ ও এশিয়া" শীর্ষে ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা দেন। তখনকার দিনে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে যে বিভেদ ও বৈষম্য দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে তারই পরিপ্রেক্ষিতে কেশবচন্দ্র মানব প্রেমিক যিশু খ্রীষ্টের জীবনাদর্শের কথা শ্রদ্ধাভরে বিশদভাবে উল্লেখ করলেন এ বক্তৃতায়। বক্তৃতার ফলে দুই দিক থেকে বিপদ উপস্থিত হ'ল। খ্রীষ্টান পাদ্রিরা মনে করলেন কেশবচন্দ্র সেন নিশ্চয় খ্রীষ্টান হবেন। এমন কি, এই বক্তৃতার পরে বড়লাট লর্ড লরেন্স পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎসুক হলেন। এখানে বলে রাখি লরেন্স ক্রমে কেশবচন্দ্রের বড়ই গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠেন। বিলাতে অবস্থান কালে লরেন্স মহোদয় কেশবচন্দ্রের বিলাত

ভ্রমণের এবং ঐ সময়ে বিশেষ বিশেষ কার্যে তাঁর সহায়তায় তৎপর হয়েছিলেন। বিরাট হিন্দু সমাজে তর্কের ঝড় উঠল। আর এ কার্যে বিশেষ ভূমিকা নিলেন দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তীরা। শিবনাথ শাস্ত্রী খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন, পরবর্তীকালে জনসাধারণ যে, ব্রাহ্মদের খ্রীষ্টানের সামিল গণ্য করতে থাকে তার মূলই হ'ল ঐ বক্তৃতা। এই অহেতুক ভুল বোঝাবুঝির নিরসনকল্পে কেশবচন্দ্র এই সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর 'মহাপুরুষগণ' শীর্ষে আর একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি পূর্বেকার যিশু খ্রীষ্টের মত এবারে বুদ্ধদেব, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই সনেই কেশবচন্দ্র আর একটি বিষয়ে হাত দিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম-গ্রন্থ ও শাস্ত্র থেকে ব্রাহ্ম ধর্মানুসারী বহু উক্তি, বঙ্গানুবাদ সহ, একখানি পুস্তকে নিবদ্ধ করলেন। বইখানি পরিবর্ধিত আকারে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র কর্তৃক পুনরায় প্রকাশিত হ'ল। এর নাম "ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ।" হিন্দু শাস্ত্র, বৌদ্ধ শাস্ত্র, কোরান, বাইবেল এবং জেন্দ্ আবেস্তা থেকে শ্লোক সমূহ সংগৃহীত হয়। একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, কেশবচন্দ্র তখনই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। নানা ধর্মাশ্রয়ীদের ভিতর ঐক্য সূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা এর মধ্যে সর্বপ্রথম সূচিত হয়। ভারতবর্ষ যে বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী জাতিদের একটি প্রকৃষ্ট মিলন ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থ কবিতার মধ্যেও তার প্রতিধ্বনি আমরা পাই। কেশবচন্দ্রের পরবর্তী উদ্যোগ সমূহে এ বিষয়টি অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছিল।

একটু আগে বলেছি প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদের মূল কারণ। প্রতিনিধি সভার দ্বারা কেশবচন্দ্র যে ব্রাহ্ম সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আজকালকার পরিভাষায় বলা যায় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র এটি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। শুধু কলকাতা নয় মাদ্রাজ বোম্বাইয়ের ব্রাহ্ম ধর্মানুবর্তীরাও যাতে এর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতে পারেন সেই চেষ্টাও ছিল কেশবচন্দ্রের। বিচ্ছেদের পর তিনি 'ইণ্ডিয়ান মীরর' মারফত স্বনামে ও বেনামে প্রতিনিধি সভার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু করেন। এইরূপ আলোচনা পর্যালোচনা কিছুকাল চললো। পরে ১৮৬৬, ১লা নভেম্বর শতাধিক ব্রাহ্মের আহ্বানে একটি সাধারণ

সম্মেলন আহূত হ'ল। এরই ফলশ্রুতি ১১ই নভেম্বর ১৮৬৬ তারিখে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ। শুধু বঙ্গদেশ নয়, বঙ্গেতর প্রদেশগুলিরও প্রতিনিধি স্বরূপ বলে সমাজের এই নামকরণ হয়। তবে এর অন্য কারণও ছিল বলে আমার ধারণা। সে কথা কিঞ্চিৎ পরে বলছি। দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ এর পর থেকে আদি ব্রাহ্ম সমাজ নামে আখ্যাত হতে থাকে।

এর পর কেশবচন্দ্র উত্তর ভারত পরিক্রমায় বা'র হন। তিনি বর্ধমান থেকে ৭ই জানুয়ারি (১৮৬৭) রওনা হয়ে পাটনা, এলাহাবাদ, কানপুর, লাহোর অমৃতসর, দিল্লী এবং পরে মুঙ্গের হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন (১৫ এপ্রিল)। কেশবচন্দ্র দক্ষিণ ভারতের মত উত্তর ভারতেও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বপ্রথম পরিভ্রমণ করলেন। ধর্ম প্রচার তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি স্থানে বক্তৃতা উপদেশ ও উপাসনার মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত সাধারণের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করার প্রয়াস পান। কিন্তু ভারতীয়দের ভিতরকার সুপ্ত জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবোধের উন্মেষে এই সমুদয় বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছিল। তিনি পঞ্জাবে অবস্থানকালে শিখ জাতির ঐতিহ্যপূর্ণ আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করেন। এই শিখ সম্প্রদায় ভারতবর্ষে একটি শক্তির মূলাধার। শিখ সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষের আধুনিককালের গণতন্ত্রের অনুরূপ শাসন পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তিত হয়। কেশবচন্দ্র কলকাতায় ফিরে নিজ প্রতিষ্ঠানে শিখ সমাজের গণতান্ত্রিক প্রথা চালু করতে উদ্বুদ্ধ হন। কয়েক মাস পরে ১৮৬৭, ১৯ ডিসেম্বর বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে পঞ্জাব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তথা শিখ জাতি সম্পর্কে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার শেষে কেশবচন্দ্র ভারতীয় মহাজাতি গঠনের কয়েকটি বুনিয়াদী বিষয়ের উল্লেখ করেন। বোম্বাই মাদ্রাজ বাঙলা এবং পঞ্জাববাসীর প্রত্যেকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে এবং প্রত্যেকেই একটি সুনির্দিষ্ট মহান লক্ষ্য সাধনে ব্রতী। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলবাসী শিক্ষিত সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সম্মিলিত উদ্যোগের উপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে। এইরূপে সক্রিয় সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি মিলন ক্ষেত্র রচনা সম্ভব।

সাধারণের ধারণা ভারতবর্ষে শিক্ষিত সাধারণের একটি মিলন ক্ষেত্র

রচনার কথা সর্বপ্রথম এলেন অক্টভিয়ান হিউমই বলেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে কেশবচন্দ্র সেন এরূপ একটি মিলন ক্ষেত্র রচনার কথা উল্লেখ করেন। আর শুধু উল্লেখ করা নয়, তিনি বেথুন সোসাইটিকে এরূপ একটি মিলনক্ষেত্রে পরিণত করতে অনুরোধ জানান।

এর পরবৎসর ১৮৬৮ সনে কেশবচন্দ্র একটি নূতন কাজে হাত দিলেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে ইতিপূর্বে অসবর্ণ বিবাহ আরম্ভ হয়। কিন্তু একে আইনসিদ্ধ করে নেওয়া একান্ত দরকার। কেশবচন্দ্র এই জন্য ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সভা করলেন। তাতে এ প্রস্তাব উপস্থাপিত হ'ল। কিন্তু এর ফলে কোন কোন দিক থেকে ভীষণ প্রতিবাদ দেখা দেয়। পূর্ব দশকের মধ্যভাগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে আইনসিদ্ধ করানোর সময় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নিকট থেকে ভীষণ প্রতিবাদের সম্মুখীন হন। এবার কিন্তু রক্ষণশীলদের চেয়ে তথাকথিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের একাংশই কেশবচন্দ্রের এই বিবাহ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। এঁরা হলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তীগণ। নানারূপ আলোচনা পর্যালোচনা এবং বাকবিতণ্ডার পর কেশবচন্দ্রের প্রস্তাব অনেকটা ভিন্নরূপ ধারণ করে। সরকারের নিকট যথাসময়ে এই প্রস্তাব সম্বলিত আবেদন পাঠান হয়। কেশবচন্দ্র নিজে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ জন্য দেখাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেশবচন্দ্র অনুমোদিত রূপটি বিপক্ষীয়দের প্রতিবাদ হেতু বদলে দিলেন। প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হতে চার বৎসর কাটে (১৮৭২, ১৯ জানুয়ারি)। ইত্যবসরে কেশবচন্দ্র কয়েকজন স্থানীয় দেশী বিদেশী খ্যাতনামা চিকিৎসকের অভিমত যাচ্ঞা করেন ছেলে ও মেয়ের বিবাহের নিম্নতম বয়স সম্পর্কে। তাঁদের অধিকাংশ মত দিলেন ছেলের ও মেয়ের পক্ষে বিবাহের নিম্নতম বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ১৪ বৎসর হওয়া বিধেয়। আইনে চিকিৎসদের এই অভিমত গৃহীত হ'ল। আইনটির ইংরেজী নাম সিবিল ম্যারেজ এ্যাক্ট। সাধারণের নিকট ১৮৭২ সনের 'তিন আইন' নামে এটি পরিচিত হতে থাকে। জাতীয় সংহতি ও সম্প্রীতি স্থাপনে এই আইনটি যে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় একথা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে আত্মজীবনীতে সাগ্রহে উল্লেখ করেছেন। এখানে কিন্তু একটি কৌতুককর বিষয়ের উল্লেখ করি। এই নূতন আইন

অনুযায়ী প্রথম বিবাহ হ'ল দুই জন শ্বেতাঙ্গের—সিবিলিয়ান হেন্‌রি বীভারিজ এবং শিক্ষাদান কর্মে লিপ্তা কুমারী এনেট এক্রয়েড। এই আইন ক্রমে ক্রমে সরলীকৃত হয়ে বর্তমানে ব্যাপকতর রূপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, কেশবচন্দ্র ১৮৬৮ সনে দ্বিতীয়বার উত্তর ভারত পরিক্রমা করেন মুখ্যত প্রস্তাবিত অসবর্ণ বিবাহ আইনের সমর্থন সংগ্রহকল্পে। এ সময়েও তাঁর বাগ্মিতা, ধর্মপ্রাণতা এবং সদাচরণের দ্বারা তিনি ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসীদের একেবারে আপন করে নেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের একটি স্থায়ী আবাসস্থল নির্মিত হ'ল। এর দ্বার উন্মোচিত হয় ১৮৬৮, ২২শে আগস্ট। নাম দেওয়া হ'ল ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির। এই দিনে অনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রমুখ একুশ জন যুবক আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময় দু'জন মহিলাও দীক্ষিত হন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন আনন্দমোহন বসুর পত্নী স্বর্ণপ্রভা বসু। কেশবচন্দ্র এই দিনকার বক্তৃতায় নরনারীর সমান অধিকার ঘোষণা করলেন। ধর্মীয় ব্যাপারেই যদিও এই ঘোষণা তথাপি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কবি গেয়েছেন "না জাগিলে ভারত ললনা / এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" ভারতবর্ষের মনুষ্যগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী; সমাজের সর্বাঙ্গের জাগরণ না ঘটলে সমগ্র জাতির উন্নতি যে পদে পদে ব্যাহত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীয়েরা এই দশকের প্রথমাবধি যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। পরেও তাঁরা নারীজাতির উন্নতিকে একটি বিশিষ্ট করণীয়ের মধ্যে গণ্য করে নেন। নারীগণ ক্রমে শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি এবং বিবিধ কল্যাণ কর্মে কখন পুরুষের সঙ্গে এবং কখনো বা একক ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। অর্ধ শতাব্দী পরে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে নারীগণ (এদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতাদের সঙ্গে সামান্য শিক্ষিতা নারীও ছিলেন) দলে দলে যে যোগ দেন তার আরম্ভ বোধ হয় কেশবচন্দ্রের প্রবর্তিত উক্ত যুগান্তকারী প্রচেষ্টার মধ্যেই।

এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করি। কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম সভা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির কথা দুইটির মধ্যে 'ভারতবর্ষীয়'

শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। পর বৎসর তিনি যে সমাজ-সেবামূলক ব্যাপক উদ্যোগ করেন তারও নাম ছিল ভারত সংস্কার সভা। কেশবচন্দ্রের আর একটি উদ্যোগের নাম ভারত-আশ্রম। 'ভারতবর্ষীয়' এবং 'ভারত' সম্বন্ধে এখানে একটু বিশেষ করে বলা প্রয়োজন। ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রহ্ম মন্দির কোন একটি অঞ্চল বা প্রদেশের জন্য নহে, এটি সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য। 'ভারত' কথাটিতেও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এটি কোন ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। সমগ্র ভারতবাসীর জন্য এর প্রতিষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। তখনকার দিনে ভারতবর্ষ দুটি কৃত্রিম অংশে বিভক্ত হতে চলে। এই অংশ দুটি হ'ল, ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত বা ব্রিটিশ ভারত এবং করদ বা মিত্র রাজাদের ভারত বা রাজন্য ভারত। কেশবচন্দ্র অখণ্ড ভারতেরই রূপ দেখেছিলেন এবং ভারত সংস্কার সভা মারফত ভারতবাসী মাত্রেরই বিবিধ কল্যাণ কর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর এই ভাব-ধারণা যে অনেকটা সার্থক হয়েছিল তা বুঝতে পারি পরবর্তী দশকে বিবিধ হিতকর্মে রাজন্যবর্গের অকুণ্ঠ পোষকতা থেকে। এর পর তিনি বিলাত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। কেশবচন্দ্রের বিলাত ভ্রমণ ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ হয়েছিল। একথাই এখন একটু বলি।

পর বৎসর কেশবচন্দ্র ১৮৭০, ১৫ ফেব্রুয়ারি বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পাঁচ জন। তন্মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ এবং অধ্যয়নেচ্ছু আনন্দমোহন বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বদেশে ফেরেন ঐ সনের ২০শে অক্টোবর। কাজেই যাতায়াত বাদ দিয়ে কেশবচন্দ্র বিলাতে অবস্থান করেন সর্ব সাকুল্যে মাত্র সাত মাস। এই সময়ের প্রতি দিনটি তাঁর নানারূপ কর্মের ভেতর দিয়ে কাটে। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্ম নেতা। ইংলণ্ডের সমধর্মী একেশ্বরবাদীরা তাঁর জন্য সভা সমিতির আয়োজন করেন। কেশবচন্দ্রের মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হলেন। ধর্মপ্রাণতা এবং বাগ্মিতাগুণে তিনি অল্পকালের মধ্যেই সাধারণের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হন। ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা বাদে নারী সমাজের কথা নিয়েও তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা দেন। ভারতীয় নারীদের অবস্থা এবং উন্নতির সম্বন্ধেও তিনি একাধিক সভায় বিশদভাবে বললেন। এই সব বক্তৃতা শুনে কোন কোন মহিলা ভারতবর্ষে এসে নারীদের

মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে উদগ্রীব হন। এইরূপ একজন মহিলা ছিলেন কুমারী এনেট এক্রয়েড।

কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের যোগ রাজা রামমোহন রায় থেকে। তিনি ১৮৬৬ সনের শেষভাগে ভারতে আসেন এ দেশবাসীর, বিশেষ করে, নারীজাতির অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে। তাঁরই উপদেশে ও পরামর্শে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিদ্বজ্জন কলকাতায় বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা স্থাপন করেন। এ বিষয়ে প্রথমাবধি অগ্রণী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তৎকালীন নারী শিক্ষার অবস্থা দেখে একে সুষ্ঠু পথে চালাবার জন্য একটি ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করলেন কুমারী কার্পেণ্টার। তারই আগ্রহাতিশয়ে সরকার ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন স্কুল সংলগ্ন একটি ফিমেল নর্মাল স্কুল বা স্ত্রী শিক্ষা বিত্তালয় তিন বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে খুল্লেন। এ ব্যাপারেও প্রথমে কুমারী কার্পেণ্টার এবং পরে কর্তৃপক্ষের বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। ব্রিস্টলে ১৮৬৯, ৯ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় নারীদের হিতকল্পে কার্পেণ্টার ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র তখন বিলাতে। তিনি ঐ দিনকার প্রতিষ্ঠা সভায় উপস্থিত থেকে এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। এবং এর দ্বারা যে স্বদেশীয় নারীদের বিস্তর কল্যাণ সাধিত হবে বক্তৃতায় তিনি এ আশাও ব্যক্ত করেন।

কেশবচন্দ্রের অপরাপর বক্তৃতার বিষয় বলার পূর্বে এখানে আরও দুই একটি কথা বলি। তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যেই বেদ বিত্তাবিদ্ ম্যাক্স্‌মুলার এবং দার্শনিক স্যর জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে এ সময় কথা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। রাজনৈতিক নেতা গ্লাডস্টোনকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করার তিনি সুযোগ নিলেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেন। এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করান। —(১৩ই আগষ্ট, ১৮৭০)।

এখন কেশবচন্দ্রের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বক্তৃতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাক। ভারতবর্ষের কল্যাণ ও হিতকল্পে বিলাতের জনসভায় এই ধরনের বক্তৃতাদানের প্রথম গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রতি

ইংলণ্ডের কর্তব্য, ভারত সরকারের আবকারি নীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা করেন তাতে বিলাতে ও এদেশে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এখানকার ইউরোপীয়দের সম্পাদিত পত্রিকাগুলি কেশবচন্দ্রের সমালোচনা ও নিন্দায় মুখর হ'ল। আশ্চর্যের বিষয় কোন কোন দেশীয় সংবাদপত্রও তাঁর নিন্দা করতে ছাড়েন নি। এ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা দুঃখ করে লিখলেন :

"কেশববাবু ধর্মশাস্ত্র বক্তা বলিয়া ইংলণ্ডে মহা সমাদর পাইয়াছেন, রাজনৈতিক বক্তা বলিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার বোধ হয় সেখানে স্থান হইত না। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি ও চমৎকার আছে, ইংলণ্ডবাসীরা তাঁহাকে ধার্মিক সত্যবাদী বলিয়া লইয়াছেন। এমতাবস্থায় কেশববাবুর দ্বারা আমরা দেশের কত উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি! অতএব তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই প্রাণপনে সমর্থন না করিয়া যেখানে কেহ কেহ বিপক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে আমরা ইহাই বলি যে, ভারতবর্ষের পাপের অদ্যাবধি শেষ নাই।"—(২১শে জুলাই ১৮৭০)।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কেশবচন্দ্র কোন কোন ইংরেজ পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। তিনি বুঝলেন ও-দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোই ইংরেজের সর্ববিধ উন্নতির মূল। তিনি স্বদেশে ফিরেই নিজেদের আর্থিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক উন্নতির দিকে সবিশেষ মনোযোগী হলেন। জাতি-গঠনের মূলেই রয়েছে এই ধরনের রচনাত্মক কাজ। এ কথার যাথার্থ্য তাঁর পরবর্তী প্রচেষ্টা সমূহের আলোচনাকালে হৃদ্‌গত হবে।

(৩)

কেশবচন্দ্র, একটু আগে বলেছি, সাত মাস বিলাত অবস্থানের পর ১৮৭০, ২০ অক্টোবর স্বদেশে ফিরে এলেন। আরও বলেছি তিনি কালবিলম্ব না করে পরবর্তী ৩ নভেম্বর ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন বা ভারত-সংস্কার সভা স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র এটিকে সম্পূর্ণ অ-ধর্মীয়, অ-রাজনৈতিক, এবং অ-সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুললেন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে। সুতরাং এটি হ'ল সকলেরই হিতার্থে পরিকল্পিত এবং হিন্দু (ব্রাহ্ম সমেত), মুসলমান, খ্রীষ্টান— প্রত্যেকের জন্যই এর দ্বার উন্মুক্ত। আবার সভ্যদের মধ্যেও ছিলেন বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের অনেকে। ভারত সংস্কার সভা নানা বিভাগে বিভক্ত হয়ে জাতির সেবায় মন দিলেন। বাঙলা দেশই এর কর্মক্ষেত্র, কিন্তু এ ছিল সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতবাসী মাত্রেরই জন্য উদ্দিষ্ট। সভার কার্য পাঁচটি বিভাগে ভাগ করলেন কেশবচন্দ্র। এখানে বলে রাখি এ ব্যাপারে তাঁর অনুবর্তীরা বিশেষ সহায় হন। অনুবর্তীদের ও-সময় এক কথায় বলা হত "কেশব মণ্ডলী"। সভার বিভাগগুলি এইরূপ—(১) স্ত্রী জাতির উন্নতি, (২) শিক্ষা, (৩) সুলভ সাহিত্য, (৪) সুরাপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণ এবং (৫) দাতব্য। প্রত্যেকটি বিভাগ উপযুক্ত কর্মীদের উপর ন্যস্ত হ'ল। কর্মী অনেক দরকার। এদের সময়মত পাবার উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র আর একটি যে ব্যবস্থা করলেন তার বিষয়ে এখানে আগে কিছু বলি। বিভাগগুলির কার্য আরম্ভ হবার পরে তিনি যে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন তাও সহজেই আমরা বুঝতে পারি।

কেশবচন্দ্রের এই ব্যবস্থাটি হ'ল ১৮৭২, নভেম্বর মাসে ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠা। এর অভিনবত্ব আজিও আমরা অনুভব করি। আজ থেকে সত্তর বৎসর পূর্বে এইরূপ পরিকল্পনা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। ভারত সংস্কার সভার কর্মী মণ্ডলীর অধিকাংশই ব্রাহ্ম যুবক। তবে এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বিস্তর অ-ব্রাহ্ম হিন্দুও কোন কোন বিভাগের কার্যে সাগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন। প্রধানত ব্রাহ্ম যুবকগণের পরিবার-পরিজন নিয়েই ভারত-আশ্রমের আবির্ভাব। এখানে প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবন একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসারে পরিচালিত হত। প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদের আশ্রমের পরিচালক বা অধ্যক্ষের নিকট নিজ নিজ আয় সবটাই দিয়ে দিতে হত। অধ্যক্ষ পরিবার পিছু যাবতীয় খরচ খরচা প্রয়োজন অনুরূপ, যেমন—পোষাক-পরিচ্ছদ, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, অত্যাবশ্যক করণীয় প্রভৃতি দিয়ে দিতেন। ধরুন, যে পরিবার মাত্র স্বামী স্ত্রী নিয়ে গঠিত, সে পরিবারের কর্তা ব্যক্তির আয় অধিক হলেও প্রয়োজন কম বলে তার জন্য কমই খরচা লাগত। আবার যে পরিবারের লোক পাঁচ জন, কর্তা ব্যক্তির আয় সামান্য হলেও সাধারণ ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় সমুদয় খরচা বহন করা হত। আহারাদি একত্রেই চলত। সাধারণ ভাণ্ডার থেকে খরচা মেটানো হত। ব্রাহ্ম পরিবার

বাদে দেখি, ব্রাহ্মেতর হিন্দু সমাজের অনেকে এসে আশ্রমভুক্ত হয়েছিলেন। আশ্রমিক পুরুষেরা বিভাগ পাঁচটির বেশীর ভাগ কাজই নিজেরা করতেন। আজকাল কমিউন বা কমিউনিজমের কত প্রচার। সে যুগে যখন এর বাস্তবরূপ সাধারণ মানুষের একেবারে অগোচর ছিল তখনই কেশবচন্দ্রের এই প্রকল্প অদ্ভুত দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয় কি ?

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রত্যেকটির কার্য আরম্ভ হ'ল। সংস্কার না হলে উন্নতি সম্ভবই না। সংস্কার এবং উন্নতি দু'টি আপেক্ষিক শব্দ। উন্নতির মূলে সংস্কার। এ জন্যই অনুমান হয় কেশবচন্দ্র সংস্কার কথাটির উপরে সভার নাম করণের সময় এতটা জোর দিয়েছিলেন। স্ত্রী জাতির উন্নতিকল্পে কেশব মণ্ডলীর প্রযত্নের কথা আগে থেকেই আমরা জেনেছি। এখানে একটি বিশিষ্ট ধারায় এর কার্য পরিচালনা হতে থাকে। অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা, বালিকা বিদ্যালয়, স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়—যাকে ইংরেজীতে এডাল্ট ফিমেল নর্মাল স্কুল বলা হত—এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হল। শেষোক্ত বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭১, ফেব্রুয়ারি মাসে। পূর্বেই আমরা জেনেছি বেথুন স্কুলের সঙ্গে তিন বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে একটি নর্মাল স্কুল সরকার স্থাপন করেন। কিন্তু বয়স্কা ছাত্রীর অভাবে ১৮৭১, ৩১ জানুয়ারি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেশবচন্দ্র শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই অভাব পূরণে প্রয়াসী হলেন। আশ্রমের অন্তর্গত বয়স্কা মহিলারা অনেকেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী হন। কিছুকাল লেখালেখির পর এই উদ্যোগটির সাফল্য-সম্ভাবনা দেখে সরকার পাঁচ বৎসরের জন্য বার্ষিক দুই সহস্র টাকা হিসাবে একে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেন। শর্ত থাকে যে, বে-সরকারী ভাবেও প্রতি বৎসর উক্ত পরিমাণ টাকা বিদ্যালয়ের জন্য খরচ করতে হবে। এখানে এই বিদ্যালয়টি বর্তমানের নর্মাল স্কুলের মত যে ছিল না তাও একটু বলা আবশ্যক।

বয়স্কা ছাত্রীগণকে উচ্চতর মানের শিক্ষা দেওয়া হত। দু-তিন বৎসরের মধ্যে দেখা গেল প্রবেশিকার মান পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় তাঁরা অনেকটা শিখে নিয়েছেন। এই সব ছাত্রী দিয়েই প্রাথমিক স্তরের বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সাধারণ ভাবে অন্যত্র গিয়েও তারা যাতে বালিকা বিদ্যালয়ের

শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হ'তে পারেন তারও চেষ্টা চলতে থাকে। শিক্ষণ বিস্তার পরিবর্তে উচ্চ শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের। দেখি প্রতিবৎসর বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কেশবচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য আশ্রমিকদের সঙ্গে ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের শিক্ষার উৎকর্ষ দেখে পরীক্ষকগণ চমৎকৃত না হয়ে পারতেন না। এই স্ত্রী শিক্ষা প্রচেষ্টার মুখপত্র হ'ল প্রথম থেকেই 'বামাবোধিনী পত্রিকা'। স্বত্ব স্বামিত্ব ছিল পূর্ববৎ এই বিভাগের সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তের। কিন্তু এর সম্পাদনা-ভার নেন এই বিভাগ। পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী সাহায্য তুলে নেওয়া হয়। এর পর এমন হিতকারক প্রতিষ্ঠানটি আর চলেনি। কেশবচন্দ্র কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় খুললেন, (১৮৭৯)। তিন বৎসর পরে তাঁরই নেতৃত্বে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হলে পূর্বোক্ত বিদ্যালয়টিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে কেশবচন্দ্র কতকগুলি মৌলিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। (বিশদ বিবরণের জন্য লেখকের কেশবচন্দ্র সেন—সাহিত্য সাধক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—অনুলেখক)।

সভার দ্বিতীয় বিভাগ, শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষা বাদে এ বিভাগের প্রধান কার্য হ'ল দুটি—শিল্প বিদ্যালয় ও শ্রমজীবী বিদ্যালয় পরিচালন। শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষনীয় বিষয়—সূত্রধরের কার্য, সূচীকার্য, ঘড়ি মেরামত, মুদ্রাঙ্কণ ও লিথোগ্রাফ, এনগ্রেভিং বা খোদাইয়ের কাজ। শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল—ভাষা, গণিত, সাধারণ ও প্রাকৃতিক ভূগোল, ভারতবর্ষের ইতিহাস, বস্তু বিচার, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও নীতি শিক্ষা।

ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন দৃষ্টে কেশবচন্দ্র প্রথম বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি ভারতবর্ষের শ্রমিকদের একটি আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্র। শ্রমজীবীদের উন্নতি চিন্তা ও তদনুরূপ কর্ম প্রয়াস দ্বারা কেশবচন্দ্র এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক। কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী বরাহনগর নিবাসী সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৪ (বৈশাখ, ১২৮১) 'ভারত শ্রমজীবী' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য—"কারিগর, দোকানদার ও কৃষক প্রভৃতি সামান্য লোকদিগের চরিত্র ভাল করিবার জন্য যাহা আমাদের আবশ্যক বোধ হইবে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবে।" বলা নিষ্প্রয়োজন

শ্রমজীবীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সমস্যাদি বিষয়ও এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। কেশবচন্দ্র উচ্চ শিক্ষা, জন শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নীতি ধর্ম শিক্ষা সম্বন্ধেও সবিশেষ চিন্তা করতেন। উক্ত দুটি বিদ্যালয় ব্যতীত আরও কোন কোন শিক্ষায়তন স্থাপনের মধ্যে তাঁর এ ধরনের চিন্তা রূপায়িত হয়। তিনি তৎকালীন বড়লাট নর্থব্রুককে এক প্রস্থ খোলা চিঠি লিখে এই সব বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের সহযোগে কলকাতায় এলবার্ট স্কুল ও পরে এলবার্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এই দশকের মাঝামাঝি।

তৃতীয় বিভাগের কাজ আরম্ভ হ'ল ১৫ নভেম্বর, ১৮৭০ (১ অগ্রহায়ণ, ১২৭৭) তারিখে এক পয়সা মূল্যের 'সুলভ সমাচার' নামীয় একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ দ্বারা। ইতিপূর্বে এত অল্প মূল্যের পত্রিকা আর বার হয় নি। অল্প ও সামান্য শিক্ষিতদের জন্য পত্রিকাখানির প্রকাশ। দেশ বিদেশের সংবাদ, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়—সমুদয়ই সহজ সরল গ্রামীণ লোকদের ব্যবহৃত ভাষায় পরিবেশিত হত। ভাষার দিক দিয়েও এখানি ছিল অভিনব। পরবর্তীকালের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যার' ভাষাও ছিল এই ধরনের। প্রতি বৎসর নূতন সম্পাদক নিযুক্ত হতেন। 'সুলভ সমাচারের' প্রথম সম্পাদক ছিলেন উমানাথ গুপ্ত। সংবাদ পত্র প্রকাশ বাদে সাধারণের আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে সুলভ সাহিত্য প্রকাশেও সভা তৎপর হন।

চতুর্থ বিভাগ—সুরাপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণের উদ্দেশ্য নিয়ে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীদের উদ্যোগ সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। সুরাপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণ প্রচেষ্টার সঙ্গে গত দশকেই কেশবচন্দ্র যুক্ত হয়েছিলেন। এবারে সভার একটি বিশেষ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে এ বিষয়ে আন্দোলন পরিচালনায় অগ্রণী হন। এ বিভাগের মুখপত্র ছিল 'মদ না গরল ?' কেশব-মণ্ডলীর অন্যতম পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পত্রিকা সম্পাদনে প্রথম দিকে বিশেষ সহায়তা করেন। ভারত-সংস্কার সভার পক্ষে কেশবচন্দ্র সকৌন্সিল বড়লাটের নিকট মাদকদ্রব্য নিবারণ কল্পে আবেদন করেন। এতে কতকটা ফলও হয়। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার কতকগুলি বিধি প্রবর্তন করেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু এতে

সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি ১৮৭৮ সালে তরুণ ছাত্রদের নিয়ে ব্যাণ্ড অব হোপ বা আশালতা দল গঠন করলেন। এই আশালতা দলের উদ্দেশ্য ছিল সুরাপান নিবারণের নিমিত্ত প্রচার পরিচালন এবং জনমত গঠন। সুরাপান ও মাদক দ্রব্য নিবারণ নিয়ে ভারত-সংস্কার সভা পরে জোর আন্দোলন চালান। পরিশেষে এই প্রচেষ্টা আমাদের মুক্তি আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

দাতব্য বিভাগের কথা কিছু বলি। দরিদ্র ছাত্রদের বেতন ও পুস্তকদান, অন্ধ, খঞ্জ, বধিরকে অর্থ সাহায্য, বিধবা ও দুঃস্থ পরিবারগুলিকে নিয়মিত মাসিক সাহায্য, অনাথ আতুরদের ঔষধপত্র বিতরণ ইত্যাদি ছিল দাতব্য বিভাগের কার্য। এই বিভাগের ভার নেন প্রধানতঃ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

পূর্বেই বলেছি ভারত-সংস্কার সভা জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীরই উন্নতিমূলক ও হিতকর প্রতিষ্ঠান। এটি এ দিক দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের পুরোবর্তী। রাজনীতি ক্রমে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভারত-সংস্কার সভার অভ্যুদয় কালে ভারতের রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলনের ভার পড়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বা ভারতবর্ষীয় সভার উপর। তখনও রাজনীতি সমাজ-জীবনের সমুদয় বিভাগকে আচ্ছন্ন করে ফেলে নি, আবার এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না, অথচ তাঁরা ভারতবাসীর একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষীই ছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভারত সংস্কার সভা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না হয়েও একটি ব্যাপকতর ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হতে পেরেছিল। এতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী বহু মনীষী যোগদান করেন। সরকারী কর্মচারী, খ্রীষ্টান পাদ্রি, প্রগতিশীল ব্যক্তি, রক্ষণশীল হিন্দু কাহারও যোগ দিতে কোনরূপ বাধা ছিল না। সভার সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন মতের ও ধর্মাবলম্বীর মিলন ঘটেছিল। প্রতিটি বিভাগই জনকল্যাণকর। কাজেই তাঁরা সাগ্রহে এর কাজ সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, বিশেষত গান্ধীযুগে কংগ্রেস জাতীয় সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাজনীতি ব্যতিরেকে কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মধারার সূচনা দেখতে পাই এই ভারত-সংস্কার সভার মধ্যে।

কেশবচন্দ্রের আর একটি গঠনমূলক কার্যের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করি। প্রশাসনিক কারণে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে এই সময় ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। আবার বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীদের ভিতরে নানা বিষয় নিয়ে বাদ বিসম্বাদেরও অন্ত ছিল না। কেশবচন্দ্র জাতিগঠন প্রচেষ্টার মধ্যে বিরোধের পরিবর্তে মিলনের সূত্রকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। বিরোধ বিসম্বাদ সত্ত্বেও সকলের জন্য একটি মিলন ক্ষেত্র রচনায় উদ্যোগী হলেন কেশবচন্দ্র। সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনা এ সবের উর্ধ্বে। কাজেই এ দুটিকে ভিত্তি করে তিনি পরস্পর বিবাদমান মানুষের জন্য মিলন ক্ষেত্র স্বরূপ এলবার্ট ইনষ্টিটিউট স্থাপন করলেন। এর আনুষঙ্গিক একটি হল বা বক্তৃতাস্থল ছিল এলবার্ট হল। পরে এলবার্ট হল নামে এই প্রতিষ্ঠানটি সাধারণের নিকট পরিচিত হয়। কেশবচন্দ্র এর অধ্যক্ষ সভায় হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম, ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিদগ্ধজনের স্থান করে দিলেন। দীর্ঘকাল স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির আত্মবিলুপ্তি ঘটে। (বিস্তৃততর বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য :—লেখকের কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র : এলবার্ট হল।—অনুলেখক)।

এই দশকের শেষে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ব্যাপকতর উদ্দেশ্য নিয়ে একটি উদ্যোগে হাত দিলেন। রবীন্দ্রনাথের "ভারত তীর্থ" কবিতাটি এখানে আমরা একবার স্মরণ করি। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীর বাস। অনেকেই বিদেশ থেকে এসে এখানকার স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যান। প্রতিবেশী সুলভ হৃদ্যতা এঁদের মধ্যে সহজেই জন্মে। কিন্তু বিরাট মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে একাত্ম-বোধ তথা আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত করার পক্ষে আরও বিশেষ কিছু প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেই এ কার্য শুরু করলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য আলোচনা-গবেষণার উদ্দেশ্যে অনুবর্তীদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করলেন। খ্রীষ্ট-তত্ত্ব, শাস্ত্র-সাহিত্য আলোচনার ভার নিলেন অঘোরনাথ গুপ্ত (বা সাধু অঘোরনাথ)। উদ্যোগ আরম্ভের মাত্র দুই বৎসর পরেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, তাঁর পুস্তকাদির মধ্যে এর প্রমাণ মেলে। পরে কেশবচন্দ্র অনুজ কৃষ্ণবিহারী

সেন বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনায় আত্ম নিয়োগ করেন। মহম্মদীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য আলোচনার ভার দেওয়া হ'ল গিরিশচন্দ্র সেনের উপর। তিনি চার বৎসরকাল লক্ষ্মৌএ থেকে আরবী ও ফারসী ভাষা, সাহিত্য অনুশীলন করে বিশেষ পারঙ্গম হন। মুসলমান শাস্ত্র ও সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ নিয়ে তিনি বিস্তর বই পুঁথি লেখেন। গিরিশচন্দ্রকৃত কোরানের বঙ্গানুবাদ বিশেষ সমাদর লাভ করে। গিরিশচন্দ্রই সর্ব প্রথম কোরানের বঙ্গানুবাদ করেন। এখানি এতই আদৃত হয়েছিল যে মুসলমান সমাজ তাঁকে মৌলবী গিরিশচন্দ্র সেন আখ্যা দেন। হিন্দু শাস্ত্র ও সাহিত্য আলোচনায় লিপ্ত হলেন উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায়। তাঁর কৃতির স্বাক্ষর স্বরূপ নানা পুস্তক বিদ্যমান রয়েছে। তৎকৃত গীতার ভাষ্য একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্য আলোচনায় ব্রতী হন 'চারণ কবি' ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল। চিরঞ্জীব শর্মা এই ছদ্ম নামে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত। তিনিও এই বিষয়ে অনেক খানি অগ্রসর হয়েছিলেন।

কেশবচন্দ্রের এবম্বিধ কার্যকলাপের দরুন বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। এ সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনে বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী সম্প্রদায়ের যে মিলন ঘটে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন বলা যায় কেশবচন্দ্র সেন। তিনি ১৮৭৩-৭৫ এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনবার উত্তর ভারত পরিক্রমা করেন। ১৮৭৬-৭৭ সনে উত্তর ভারত পরিক্রমাকালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্থলে লোকজনের নিকট থেকে যে অমন সাড়া পেয়েছিলেন তারও প্রস্তুতিতে কেশবচন্দ্রের অনেক হাত রয়েছে। বস্তুত এই দশকের রাজনৈতিক আন্দোলন জন-চিত্তে বিশেষ আলোড়ন আনে। কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনমূলক রচনাত্মক কর্মোদ্যোগ এর মূলে ঢের রসদ যোগায়। এখন আমরা রাজনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির কথায় ফিরে আসি। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্ব পুস্তকে লিখেছেন উনবিংশ শতাব্দীতে মাত্র দুই জন ব্রাহ্মণ রয়েছেন, এর মধ্যে একজন হলেন কেশবচন্দ্র সেন। কেশব জীবনের কার্যকলাপের মধ্যে জাতিগঠনমূলক প্রচেষ্টার কথাই এখানে উল্লেখ করা হ'ল। এই আংশিক চিত্রণের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করি।

শাসকে-শাসিতে : হলাহল ও অমৃত

ভারতবর্ষীয় সভা নিখিল ভারতীয় ও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে যে সব আন্দোলন পরিচালনা করেন তার ফলে একে তখনকার জাতির একমাত্র রাজনৈতিক মুখপাত্র বলে কেহ কেহ উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিকই ঐ যুগে সভার কার্য-কলাপ দৃষ্টে এ কথার যাথার্থ্য আমাদের সম্যক উপলব্ধি হয়। জাতি বৈরিতা ক্রমে কিরূপ উৎকট আকার ধারণ করে তার পরিচয়ও আমরা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে সিবিল সার্বিস পরীক্ষার নিয়মকানুন বদলের কথা স্বতঃই আমাদের মনে আসে। পূর্বে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেছি, এখন পুনরায় আমাদের দৃষ্টি একটু ফিরাই। অবশ্য এখানে সত্তরের দশকে প্রথম পাঁচ বৎসরের ভিতরকার বিষয়াদির আলোচনার মধ্যেই আমরা মুখ্যত নিবদ্ধ থাকব।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটির কথা আমরা আগে জেনেছি। এটি প্রতিষ্ঠার দু বৎসর পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয়, ভারত হিতৈষী ইংরেজ এবং অবসর প্রাপ্ত সদাশয় সিবিলিয়ান কর্মী মিলে এই এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সভাপতি দাদাভাই নৌরজী হলেন এই নূতন প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক বা আধুনিক পরিভাষায় কর্ম-সচিব। কিছু আগে থেকেই সিবিল সার্বিস সম্পর্কে বিলাতেও বেশ আলোচনা আরম্ভ হয়। মনোমোহন ঘোষ পরীক্ষায় ব্যর্থতার কারণগুলি বিলাতের সমসাময়িক সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি পত্রে সবিস্তারে বিবৃত করেন। বিলাতে অবস্থানকালেই এই পত্রগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন এইরূপ ঘোরতর অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠার পরই আন্দোলন আরম্ভ করে দেন। তাঁরা কর্তৃপক্ষকে লিখলেন যে, অবিলম্বে লণ্ডনের মত ভারতবর্ষের কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক। ঐ প্রস্তাব ভারতবর্ষীয় সভা বহু বৎসর ধরে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে আসছিলেন। সভা সত্বর বিলাতস্থ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে যোগাযোগ করলেন। লণ্ডনস্থ পূর্ব পূর্ব

প্রতিষ্ঠানের মত এটিও ক্রমে ভারতবর্ষীয় সভার প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে আরম্ভ করলেন। বলা প্রয়োজন, ভারতবর্ষীয় সভার কোন কোন সভ্য উক্ত এসোসিয়েশনের চাঁদা দাতা সভ্যও হলেন। মনোমোহন ঘোষ স্বদেশে ফিরে এলে এই সভা একটি জনসভার আয়োজন করে তাঁর প্রমুখাৎ বিলাতস্থ কর্তৃপক্ষের অপকৌশলের কথা সাক্ষাৎভাবে শুনলেন। এ বিষয়ক আন্দোলন অতঃপর আরও জোরদার হয়ে উঠল।

তৎকালীন ভারত সচিব ১৮৬৯ খ্রী. নাগাদ হিসাব করে দেখালেন যে এই সনের পূর্ব পর্যন্ত ১৬ জন ভারতবাসী সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উপস্থিত হন; কিন্তু একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত আর কেহ উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁর কথার ব্যঞ্জনা কি তা বুঝা দুষ্কর। এই সময়ে গিলক্রাইস্ট নামক জনৈক উদারচেতা ইংরেজের অর্থানুকূল্যে বিলাতি কর্তৃপক্ষ গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ নামে একটি পঞ্চবার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এর উদ্দেশ্য বিলাতে গিয়ে ভারতীয় যুবকেরা যাতে বিবিধ বিদ্যা, যেমন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবহার শাস্ত্র, অর্থনীতি প্রভৃতি অধ্যয়নে ও অনুশীলনে রত হতে পারেন। বলা বাহুল্য, সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীরাও এই বৃত্তির অধিকারী ছিলেন। গিলক্রাইস্ট বৃত্তির সুযোগ নিয়ে বহু ভারতীয় একে একে উচ্চতম বিদ্যালাভে সমর্থ হন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এখানে সুপণ্ডিত প্রসন্নকুমার রায় (ডক্টর পি. কে. রায়), ভূতত্ত্ববিদ প্রমথ-নাথ বসু এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই বৃত্তি চালু হয়। বৃত্তিধারী না হয়েও ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দেই চারজন ভারতীয় বিলাতে গিয়ে সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। এঁরা ছিলেন বঙ্গের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত এবং বোম্বাইয়ের শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এরা প্রত্যেকেই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং সরকার নির্দিষ্ট অঞ্চলে সিবিলিয়ান কর্মীরূপে যোগ দেন। এতে কিন্তু কি বিলাতে কি এ দেশে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভাবে টনক নড়ল। তাঁরা কর্তৃত্ব স্বহস্তে অটুট রাখবার জন্য উচ্চশিক্ষার মূলেই আঘাত হানতে উঠে পড়ে লাগলেন। তাদের অছিলা ছিল কিন্তু অন্য। এই কথাই এখন বলব।

এই ১৮৬৯ সনেই ভারত সরকার বিলাতি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে

ঘোষণা করলেন যে, এ দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য আয়োজন প্রচুর, আর এর দ্বারা উপকৃত হন সমাজের উচ্চতর সম্পন্ন শ্রেণীর লোকেরাই বেশী করে। উচ্চ শিক্ষা খাতের ব্যয় কমিয়ে সাধারণ লোকের প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন করা দরকার। উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকার যে ব্যয় করেন তার একটি বিশেষ অংশ এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ হতে পারে। উচ্চ শিক্ষার এতাদৃশ সংকোচ সাধনের প্রস্তাবে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় সবিশেষ বিচলিত হয়ে উঠলেন। কলকাতা তখন সমগ্র ভারতের রাজধানী। কাজেই এখান থেকেই এই অহেতুক শিক্ষা সংকোচের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হ'ল এবং সত্বর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। উচ্চ শিক্ষার খাতে ব্যয় প্রয়োজনের তুলনায় যে আদৌ যথেষ্ট নয় ভারতবর্ষীয় সভা তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করে সরকারকে লিখলেন এবং নিজেদের সপক্ষে যে জনমত প্রবল তা প্রমাণের উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন স্থানে জনসভার আয়োজন করলেন। অল্পকাল মধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী ঘোষণার বিরুদ্ধে অন্তত ৪৩টি জনসভা হয়। মফস্বলে—জেলা শহরে, যেমন, যশোহর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, ঢাকা, রাজসাহী প্রভৃতিতে প্রতিবাদ সভা হয়েছিল। ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবৃন্দ এতাদৃশ জনমতকে সংহত ও সুপথে চালনা করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এক প্রতিনিধিমূলক সমাবেশের আয়োজন করেন ১৮৭০ সনের ২ জুলাই। সভায় ১৭টি জেলা থেকে প্রতিনিধি এসে যোগ দিলেন। সমাবেশে ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি রমানাথ ঠাকুর পৌরোহিত্য করেন। সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল সরকারী প্রস্তাবের প্রতিকূলে এবং ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে ইতিমধ্যে সর্বত্র যে জনমত সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সবিস্তারে বলেন। উক্ত প্রস্তাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তার প্রমাণ স্বরূপ একটি কথা এখানে উল্লেখ করি। এই সভায় শুধু রাজনীতি-বিদগণই নহেন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্প ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবী, চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, এবং কেহ কেহ সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সভায় সর্বসাকুল্যে চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর উপর যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, কালীমোহন দাস ও কিশোরী চাঁদ মিত্র।

প্রস্তাবগুলিতে এই মর্মে বলা হ'ল :—১. লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তী বড়লাটগণ এটা বরাবর চালু রাখেন। এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই স্কুল কলেজ সমূহে সরকারী সাহায্যের সংকোচ সাধন জাতীয় দুর্দৈব বলে সভা মনে করেন। ২. ইংরেজীর পক্ষপাতি হয়েও সভা অঙ্গীকার করেন যে, দেশীয় ভাষা সমূহের উন্নতিসাধন একান্ত আবশ্যক। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে দেশীয় ভাষার যথাযোগ্য উন্নতি সম্ভব। ৩. ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হেতু গবর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সাশ্রয় ঘটবে। এর ফলে শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হবে এবং বিধিবদ্ধ আইনসমূহ শিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য হবে। শাসক ও শাসিতেরা ভাব বিনিময়ের দরুন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবেন। ব্রিটিশ অধিকারের উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত হবে। ৪. সভ্য দেশ সমূহের উচ্চ শিক্ষায়তনের ব্যয় ছাত্র বেতন দ্বারা সঙ্কুলান হয় না; সরকার এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকেন। ভারতে সরকার পক্ষে এ রকম ব্যয় বরাদ্দ করা আরও বেশী প্রয়োজন এই কারণে যে, এখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় দরিদ্র এবং শিক্ষাদানের নিমিত্ত অধিক বেতনে ইউরোপীয় অধ্যাপক নিযুক্ত রাখতে হয়।

এই সকল প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত স্মারকলিপিটি সাধারণ সভা অনুমোদন করেন। পরে উহা ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষ থেকে ভারত সচিবের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিলাতের ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুকাল আলোচনা চলে এবং শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার কার্যত ইংরেজী শিক্ষা সংকোচনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। (অক্টোবর ১৮৭১)।

ভারতবর্ষীয় সভা কর্তৃক আয়োজিত উক্ত বিশেষ জনসভাটিকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ফার্ষ্ট পার্লামেন্ট ইন ইণ্ডিয়া বা ভারতবর্ষের প্রথম পার্লামেন্ট (আধুনিক কালের সংসদ অর্থাৎ লোকসভা+রাজ্যসভা) বলে অভিহিত করলেন। সম্পাদক শিশিরকুমার উক্ত শিরোনামায় তিনটি নিবন্ধে বহু যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করে লিখলেন যে তখনই ভারতবর্ষে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা সম্ভব। গণতন্ত্র মূলক সভার কথা ইতিপূর্বে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা

তৎকালীন অবস্থায়ই যে প্রবর্তন করা সম্ভব এ কথা শিশিরকুমারই সর্বাগ্রে অতি জোরের সঙ্গে পত্রিকার পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন। পত্রিকা আরও লিখলেন যে, এই উদ্দেশ্যে মফস্বল শহরে যে সব সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারও একটা স্থায়ীরূপ দেওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় সভা জনগণের মুখপাত্র স্বরূপ কার্য করছেন বটে, কিন্তু পত্রিকা একে আরও জন প্রতিনিধিমূলক করে তুলবার প্রস্তাব করলেন এই সময়ে। এ নিয়ে কিছুকাল যাবৎ বেশ বিতর্ক চলে। এ প্রস্তাব কিন্তু অল্প পরেই পরিত্যক্ত হ'ল। ফলে জনপ্রতিনিধিমূলক একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ হয়। একথা আমরা পরে বিশেষভাবে জানতে পারব।

ভারত সচিব তখন ভারত শাসনের সর্বেসর্বা। পার্লামেণ্ট তাঁকে মুখপাত্র করেই খালাস। বৎসরে একবার মাত্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে পার্লামেণ্টে আলোচনা হবার অবকাশ ছিল, সেও এ দেশের বাজেট পাস করা সম্পর্কে। দেখা যেত পার্লামেণ্ট অধিবেশনের শেষের দিকেই বাজেট আলোচনার দিনটি ধার্য হত। এবং কখন কখন কোরাম বা সিদ্ধ সংখ্যার অভাবে অধিবেশন স্থগিত হয়ে যেত। ভারত সচিব ও ভারত সরকার যথেচ্ছ ভাবে ভারত শাসনে প্রবৃত্ত হন। তুরস্ক-যুদ্ধেই হোক বা আবিসিনিয়ার যুদ্ধেই হোক ভারতের কোষাগার থেকে নির্বিবাদে অর্থ ব্যয় করা হত। এই দশকে রুশ ভীতি ব্রিটিশকে পেয়ে বসে। রুশিয়াকে ঠেকাবার জন্য সকল খরচা ভারত সরকারই বহন করতেন। পূর্বে কুড়ি বৎসর অন্তর অন্তর ভারত শাসন সম্পর্কে ভাল মন্দ সব দিক দিয়েই প্রায় দু বৎসর যাবৎ আলোচনা চলত। এর দ্বারা ভারত শাসনের রাশ আগলানোও খানিকটা সম্ভব ছিল। ভারতবর্ষ কোম্পানির বদলে ব্রিটিশ রাজের অধীন হওয়ায় শাসন সম্পর্কে এরূপ খুটিনাটি আলোচনা পর্যালোচনার অবকাশ থাকে নি। এ কারণ ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবাসীর মুখপাত্র স্বরূপ পার্লামেণ্টে এই মর্মে স্মারকলিপি পাঠালেন যে, ভারত শাসন বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি রয়াল কমিশন সত্বর গঠন করা হোক। লণ্ডনস্থ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন এর সপক্ষে আন্দোলন উপস্থিত করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। ভারত যে তখন সরকারী বেসরকারী সমগ্র ব্রিটিশ জাতিরই একচেটিয়া সম্পত্তি!

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৮৮৫ সনে প্রতিষ্ঠার পর অবধি কংগ্রেসও প্রায় প্রতিবৎসর ভারত শাসন সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং ইতিকর্তব্য নির্ধারণের নিমিত্ত এইরূপ একটি রয়াল কমিশন গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করতেন।

ভারতবর্ষীয় সভার উক্ত প্রস্তাব, বলা বাহুল্য, গৃহীত হয় নি। পার্লামেন্ট তরফে ভারতসচিব অবশ্য একটি ফাইনান্স বা অর্থ কমিটি স্থাপন করে খানিকটা মুখ রক্ষা করলেন। ভারত বন্ধু স্যর হেন্‌রি ফসেট ভারতবর্ষীয় সভার সপক্ষে পার্লামেণ্টে নানাভাবে কার্য করেন। অর্থ কমিটি বিলাত-বাসীরই নিকট থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে থাকেন। ভারতবর্ষীয় সভা এর কোন কোন সদস্যকে এ দেশে এসে ভারতবাসীদের নিকট থেকে সাক্ষ্য গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু তাও রক্ষিত হ'ল না। বিলাতে পার্লামেন্টীয় নূতন নির্বাচনের পর ফাইনান্স কমিটি উঠে গেল। পরিবর্তে স্থাপিত হ'ল মাত্র একটি সিলেক্ট কমিটি।

এই নির্বাচনে ভারত বন্ধু ফসেট পুনরায় ব্রাইটন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হলেন। ভারতবাসীর সপক্ষে সক্রিয়ভাবে কার্য করার জন্য ভারতবর্ষীয় সভা তাঁকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেবার ব্যবস্থা করেন। কেম্ব্রিজে অধ্যয়নরত আনন্দমোহন বসুর উপর এই অভিনন্দন পত্র সভার পক্ষে দেওয়ার ভার পড়ল। ব্রাইটনে এই উদ্দেশ্যে লর্ড মেয়রের সভাপতিত্বে একটি জনসভার অনুষ্ঠান হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ আনন্দমোহন সেখানে উপস্থিত থেকে ফসেটকে ভারতবর্ষীয় সভা প্রেরিত মানপত্র প্রদান করেন। এই উপলক্ষে আনন্দমোহন একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে ব্রিটেন মানবতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, ভারত-শাসনে ভারতবাসীর দায়িত্ব স্বীকার করে তাকে এই ব্যাপারে অংশী করে নিলে দেশ এক বিরাট ভূখণ্ডের মহদুপকার সাধন করতে পারে। আনন্দমোহন প্রদত্ত বক্তৃতার মূল অংশ 'মধ্যস্থ' (১৭ চৈত্র ১২৭৯) থেকে এখানে দিলাম:

"যে সকল রাজপদে কিছু মান ও অর্থলাভ আছে, তাহার প্রায় সমুদায়ই ইউরোপীয়দের একচেটে! দেশীয় লোকের ভাগ্যে তদ্রূপ পদলাভের অতি অল্প সম্ভাবনা—সেই অল্প সম্ভাবনা যদি ভাগ্যে ঘটে এই আশাতেই

আমি ইংলণ্ডে পরীক্ষা দিতে আসিয়াছি। এক্ষণে ইহা বিবেচ্য, কোন ইংরাজ স্বরাজ্যের সিভিল পদে নিযুক্ত হইতে না পাইয়া ভিন্ন দেশে যান তবে আপনাদের তাহা কেমন লাগে? তাহারা কি ইহাকে ন্যায্য বিচার বলিবেন; যে নিয়মে বলে 'অন্যে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে তুমি ভালবাস, অন্যের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিবে? এরূপ আচরণ এক নিমিষের নিমিত্তও বিচার ও ন্যায়ের আলোকে তিষ্ঠিতে পারে না। এ বিষয় অধিক না বলিয়া আমি আর এক বিষয়ের উল্লেখ করিব।

"অর্থাৎ ভারতের প্রতিনিধিত্ব বিষয়। মার্ক্যুইস অব স্যালিসবরী বলেন 'ভারতবর্ষে যদি প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রণালী প্রবর্তিত হয়, তবে আমার মতে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।' (হাস্য এবং শব্দ উঠিল 'তিনি নির্বোধ—fool'—পুনশ্চ হাস্য।) আমার বিবেচনায় ঐ লর্ডের মত ইংলণ্ডের শুনা উচিত নয়। যে যে শাসন-প্রণালীতে প্রজারা সমবেদনাশীল ও সমান অংশী নহে এবং তাহাদের অভাব তাহারা জানাইতে না পারে, সে প্রণালী কদাচ উত্তম হইতে পারে না। আমি এত নির্বোধ নই যে, যে প্রকার প্রতিনিধি প্রণালী ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে, আমাদের দেশে অবিকল তাহাই হউক। কিন্তু ইংলণ্ড এক দিনেই এরূপ হয় নাই।......

"লক্ষ লক্ষ ইংরাজ ভারতবর্ষে এ প্রকারে উপজীবিকা লাভ করিতেছেন যাহা ভূমণ্ডলের অন্যত্র সুপ্রাপ্য নহে! এই এক কারণেই ভারতের প্রতি ইংরেজ-জাতির চিত্তাকর্ষণ করা উচিত।...এ কথা বলা গুরুতর হয়, কিন্তু ভারতবর্ষ দ্বিতীয় আয়ারল্যাণ্ডের ন্যায় ইংলণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারে। তত্তুল্য কেন? তদপেক্ষা অধিক; যেহেতু ভারতবর্ষ বহু বিস্তৃত ও ইংলণ্ডের বহু দূরে স্থিত। ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী কিন্তু চিরকাল অসম্বদ্ধ থাকিবেক না। যদি থাকে তথাপি স্বীয় সুশাসনের উপর নির্ভর না করিয়া প্রভুত্ব রক্ষার জন্য যে রাজনীতি, অধীন জনগণের দৌর্বল্যের প্রতি নির্ভর করে, সে রাজনীতি কোন কার্যের নহে। আত্ম-নির্ভর ব্যতীত কোনো জাতি মহৎ হইতে পারে না। ইংরেজ জাতির স্বাবলম্বনকে আমি বিশেষ প্রতিষ্ঠা করি। একটি কোন অভাব বা অভিযোগের কারণ উপস্থিত হওয়ামাত্র চতুর্দিকে আন্দোলন এবং তৎফল স্বরূপ প্রতিবিধান হইয়া উঠে। এ বিষয়ে এদেশে ও

সেদেশে কত বিভিন্ন? যদিও আন্দোলনের সূত্রপাত সম্প্রতি ভারতবর্ষে হইয়াছে, কিন্তু ভারতের ভাবী চরিত্র ইংলণ্ডের রাজনীতিক রাজপুরুষগণের দয়া বাৎসল্যের উপর বিস্তর নির্ভর করে। তাঁহারা যদি ঐ সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রকে সুদৃষ্টিতে উত্তম পরিচালক হয়েন, তবে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।...

"মধ্য এশিয়া মণ্ডলে রুশিয়ার ভাবগতিক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। এই যে রুশিয়া অতদূর গিয়াছে, তাহাদের হস্ত হইতে ভারত রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য কোন গড় বন্দী, কোন বাহ্য দুর্গ ইংলণ্ডের পক্ষে কোন কাজের হইবে না, কিন্তু ভারতবাসীদের হৃদয় মধ্যে ভক্তি দুর্গ বাঁধিতে পারিলে নিতান্ত নিরাপদ অবস্থা হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাহা হইলে, রুশিয়া যত সৈন্য এক্ষণে রণক্ষেত্রে আনয়ন করিতে সমর্থ, তাহার শতগুণ বেশী সৈন্য হইলেও কোন চিন্তা নাই—প্রজার হৃদয়স্থ ভক্তি দুর্গ নিতান্তই অভেদ্য! শাসন কর্তাদের পূর্বভাব কি লোক স্মরণ করিয়া থাকে? তাহার পরিবর্তে বর্তমান শাসনপ্রণালীর দ্বারাই অধীন জাতির মনের ভাব গঠিত হয়। অতএব আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের ন্যায় ভারতবর্ষ কেন যে সমভাবাপন্ন ও সমাধিকার প্রাপ্ত না হয়, তাহার কারণ কিছুই ভাবিয়া পাই না।"*

আনন্দমোহন এই বক্তৃতায় ইংরেজ ও ভারতবাসীর ভিতরকার সম্পর্ক তিক্ত না হয়ে কিরূপ মধুর হতে পারে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু তখন কি এদেশে কি বিলাতে শাসন কর্তৃপক্ষের মনোভাব ভারতীয়দের প্রতি একান্তই বিরূপ। কাজেই এই ধরনের কাহিনী শোনবার মত মানসিকতা ওদের মধ্যে গড়ে উঠবার সুযোগ বা সুবিধা মোটেই পায় নি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই সভার বৎসরখানেক পরে ১ জানুয়ারি ১৮৭৪ তারিখে শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করে এই মর্মে লিখেছিলেন :—ভারতবর্ষে জনসাধারণ এবং গবর্ণমেণ্ট দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস—তাদের স্বার্থ আলাদা, কর্মের পরিধি আলাদা, এ জন্য কর্তৃত্ব ও সুবিধা নিয়ে উভয়ের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ।

* মূল বক্তব্যটি The *Modern Review* March 1948 সংখ্যায়—"*Ananda Mohan Bose on the Future of British Rule in India*" নামে প্রকাশিত।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক যে, গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের স্বার্থহানি না করে জনস্বার্থ রক্ষা করতে পারেন না।*

২

এখন আবার কিঞ্চিৎ পূর্বেকার কথায় আসা যাক। ভারত সরকার উচ্চ তথা ইংরেজী শিক্ষা সংকোচের ব্যাপারে জনমত অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তাঁরা এ থেকে শেষ পর্যন্ত নিরস্তই হলেন। কিন্তু বঙ্গের ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেল (১৮৭১-৭৪) উচ্চ শিক্ষা সংকোচে বদ্ধপরিকর হন। তিনি প্রস্তাব করেন যে বঙ্গ প্রদেশের আটটি সরকারী কলেজের মধ্যে চারটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবনমিত করা হোক; অন্য চারটি কলেজ থেকে কালেজী শ্রেণী তুলে দিয়ে একেবারে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করা হোক। ক্যাম্বেলের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। আর এ আন্দোলনের পুরোভাগে এলেন ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবৃন্দ। ভারত সরকার এ আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁদের নির্দেশে ক্যাম্বেল প্রস্তাব সংশোধন করে নিলেন। তিনটি কলেজ মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবনমিত হ'ল। একটি কলেজ থেকে সরকারী কর্তৃত্ব তুলে নিয়ে জনসাধারণের উপর এর পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়। উচ্চ শিক্ষা সংকোচের আয়োজন চলার সময়ে জনশিক্ষা দরদী বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিচলিত না হয়ে পারেন নি। তিনি ১৮৭৩, জানুয়ারি মাসে মেট্রোপলিটন কলেজ—উক্ত প্রস্তাবের খানিকটা প্রতিষেধ কল্পে স্থাপন করলেন। বৎসরখানেক পরে এটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। স্বল্প ব্যয়ে সুযোগ্য দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করে কিরূপে উচ্চতর শিক্ষার আয়োজন করা যায় তার দৃষ্টান্ত দেখালেন সর্বপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়। উচ্চ শিক্ষা সংকোচ না করেও জনশিক্ষা

* মূল ইংরেজী এই—

The people and government here are two different bodies, their interests clash, their aims and scope differ and the result is a continual struggle between them for prerogatives and privileges. The difference of their position is, indeed, so wide that our government can not further the interests of the people without injuring its own interests directly or indirectly.

খাতে এই উপায়ে অর্থাগমের সুযোগ ঘটতে পারে এ কথাও বিদ্যাসাগর অবলম্বিত ব্যবস্থার দ্বারা অবিলম্বে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। অধ্যাপনার উৎকর্ষও একটি ব্যাপারে প্রমাণিত হ'ল। দুই এক বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় ছাত্রগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, এমন কি প্রথম স্থানও একাধিকবার অধিকার করলেন।

ক্যাম্বেলের উচ্চ শিক্ষা সংকোচ বিষয়ক প্রস্তাবের হেতুবাদে বলা হয় যে, কলেজগুলির ব্যয় সংকোচ করে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে তা জনশিক্ষা অর্থাৎ জনসাধারণের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হবে। কিন্তু এ যে মরুভূমিতে জলবিন্দু! তবে এ উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ আরও কিছু অর্থাগমের ব্যবস্থা করলেন। এই সময় রোড সেস্ বা পথ কর ভারতবর্ষীয় সভার প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রবর্তিত হ'ল। উদ্দেশ্য স্বরূপ বলা হয় জন শিক্ষা জন স্বাস্থ্য পথঘাট নির্মাণ ও মেরামতী, জল সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতির নিমিত্ত অর্থ আসবে এই পথকর হতে। পথকর আদায় ও ব্যয় উদ্দেশ্যে জেলাওয়ারী এক একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটি থেকেই পরবর্তী কালে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উদ্ভব। সাম্প্রতিককালের জেলা পরিষদ এর স্থান অধিকার করেছে।

ছোটলাট ক্যাম্বেলের উপর ঐ সময়ের শিক্ষিত সমাজ খুবই চটা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় সভার জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারতেন না। নানা ভাবে এই সক্রিয় প্রতিষ্ঠানটিকে অপদস্থ করতে চেয়েছিলেন। তথাপি তাঁর অবলম্বিত নীতি এবং কৃতকর্ম যে আমাদের দিক থেকে বিশেষ উপকারে আসে তাও স্বীকার করতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সরকারী বিদ্যালয়ে শরীর চর্চার প্রবর্তন, প্রাদেশিক রাজস্ব ভারতীয় রাজস্ব থেকে পৃথকীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার, দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান রীতি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার কথা একটু বেশী করে বলছি। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত বিস্তারকে সরকারী কর্তৃপক্ষ কখনও ভাল চোখে দেখেন নি। এর কারণ সুবিদিত। এ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা কিম্বা ইংরেজী শিক্ষা সংকোচের অছিলায় প্রাথমিক শিক্ষা যে কতখানি ত্বরান্বিত হয়েছিল সে কথাই এখন একটু বলি। রেভাঃ লালবিহারী দে প্রমুখ কোন কোন মনীষী

ইতিপূর্বেই প্রাথমিক শিক্ষাকে স্থায়ী এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন। আয় এবং ব্যয়ের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থার কথাও এতে উল্লিখিত হয়।

আগে কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে তথাকথিত নিম্ন বা স্বল্প বিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে এর বিস্তারে লিপ্ত হবেন। একে বলা হত ফিলট্রেশন থিওরি। ক্রমে দেখা গেল এ ধারণা ভুল। উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের মতিগতিও বদলে যায়। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার দীর্ঘকালের মধ্যেও আশানুরূপ চালু হ'ল না। এই ফিলট্রেশন থিওরি সম্বন্ধে আর একটু বলা দরকার। ক্যাম্বেলের প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে উইলিয়ম এডাম শিক্ষা বিষয়ক বিবরণে এর অসারতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি গ্রামের পাঠশালাকে ভিত্তি করে থানা মহকুমা ও জেলাওয়ারী উচ্চতর স্তরের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছিলেন। তিনি আরও বলেন সবার উপরে থাকবে রাজধানী কলকাতায় কেন্দ্রীয় উচ্চতম বিদ্যায়তন। শিক্ষার মাধ্যম তিনি বাঙলাকেই করতে চেয়েছিলেন। ক্যাম্বেলের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা দেখে তাঁর পূর্বসূরী উইলিয়ম এডামের কথা স্বতঃই আমাদের মনে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও উক্ত ফিলট্রেশন থিওরির অসারতা প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেছিলেন। ঐ সময়কার কর্তৃপক্ষ ফিলট্রেশন থিওরি অগ্রাহ্য করে কতকটা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ হেতু এবং কতকটা জনসাধারণের হিতসাধনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে অবহিত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা যাই থাকুক এর দ্বারা যে জাতি সবিশেষ উপকৃত হয়েছে তা স্বীকার না করলে মুক্তি যজ্ঞের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যায়। ক্যাম্বেল প্রবর্তিত ব্যবস্থায় গ্রামে গ্রামে সরকারী ও বে-সরকারী অর্থ সাহায্যে পাঠশালা স্থাপনের উদ্যোগ হয়। নিয়ম হ'ল গ্রাম থেকেই গুরুগণ সংগৃহীত হবেন। ছেলেরা মাতৃভাষায় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি শিখবে। এই ব্যবস্থায় গ্রামবাসী খুচরা দোকানদার, ছোট ছোট ভূস্বামী, রায়ত, ছুতার মিস্ত্রি, তাঁতী, গ্রামের সর্দার, নৌকার মাঝি, জেলে, কৈবর্ত প্রভৃতি প্রাথমিক বিদ্যালাভ করে নিজ নিজ কার্য সুষ্ঠুরূপে সমাধা করতে সক্ষম হবেন। মেধাবী ছাত্রদের জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা হয়, যার ফলে তারা উচ্চতম বিদ্যা পর্যন্ত আয়ত্ত করার সুযোগ পেতে

পারে। ক্যাম্বেলের পরও ষাট সত্তর বৎসর যাবৎ তৎপ্রবর্তিত ব্যবস্থা মোটামুটি চালু ছিল।*

ক্যাম্বেল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সরকার পক্ষে আর একটি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন যা নিয়ে তখন খুবই বিতর্ক উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে এর ফলও হয়েছিল মর্মান্তিক এবং কোন কোন দিকে সুদূরপ্রসারী। তাঁর অপরাপর কার্যে যেমন ভারতবর্ষীয় সভা তথা শিক্ষিত সমাজ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, এ ব্যাপারটিতেও তাঁদের আশঙ্কার অবধি রইল না। সাধারণের হিতসাধক হলেও তাঁর অনেক কাজ উদ্দেশ্যমূলক বলে সমসময়ে নিন্দিত হয়। বস্তুতঃ তাঁর তখনকার কার্যাবলী প্রায় সব সময়েই শিক্ষিত সমাজকে এড়িয়েই করা হত। আর এ জন্য তিনি তাঁদের সন্দেহভাজন হয়েছিলেন। উচ্চ শিক্ষা সঙ্কোচ ব্যাপারে যেমন, আলোচ্য ব্যাপারটিতেও তেমনি তাঁরা অনর্থপাতের সূচনা দেখতে পান। এই সময়ে তিনি যে প্রস্তাব সরকারী স্তরে ঘোষণা করলেন তার মূল কথা হ'ল: জমিদারদের করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রজাদের জোট বাঁধবার অধিকার অবশ্যই আছে। তবে আইনগত দেয় খাজনা প্রাপককে দিতে হবে। সরকার কখনও বেআইনী দাঙ্গা হাঙ্গামা সহ্য করবেন না; কঠোর হস্তে তা দমন করবেন।

পূর্বে দেখেছি নীল বিদ্রোহকালে প্রজারা নীলকরের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল। তারা প্রায় সর্বত্রই অহিংস ছিল এবং এর দরুন তারা খানিকটা সাফল্য অর্জন করে। এবারে প্রজাদের জোট বাঁধবার অধিকার স্বীকৃত হ'ল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। এখানে পাবনার তথাকথিত প্রজা বিদ্রোহের কথা বলছি। জমিদারের কর বৃদ্ধি নিয়ে প্রজাদের মধ্যে খুবই আলোড়ন সুরু হয়। তারা জোট বাঁধে। বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় জেলা কর্তৃপক্ষ এ কার্যে তাদের সহায় হন। তারা ভেবেছিলেন জোট বেঁধে জমিদারদের উপর চড়াও হলেও তাতে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন বাধা আসবে না। সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশ, পাবনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টেলর এবং

*পূর্ণ বিবরণের জন্য লেখকের "স্যার জর্জ ক্যাম্বেল ও প্রাথমিক শিক্ষা" ('বাঙলার শিক্ষক', বৈশাখ ১৩৫৩) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—অনুলেখক।

সিরাজগঞ্জের মহকুমা হাকিম নোলান তাদের নানাভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্ররোচনাও দিয়েছিলেন। সাধারণ প্রজারা জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলেন; তারা লুঠতরাজ গৃহদাহ মারপিট প্রভৃতি উপায়ে জমিদারদের সায়েস্তা করতে লেগে গেলেন। সরকারী প্রস্তাবের শেষাংশের প্রতি তাঁরা ভ্রূক্ষেপও করলেন না। এর ফলও কিন্তু তাদের ভোগ করতে হয়। আইন ভঙ্গের জন্য ধরপাকড়, জরিমানা, কারাদণ্ড কতই না তাদের কপালে জুটল। তাদের প্ররোচনা যারা দিয়েছিলেন, টেলর, নোলান প্রমুখ সেই কর্তা ব্যক্তিরা তখন মুখ ফিরিয়ে নেন। কিছুকালের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট টেলর দীর্ঘ ছুটি নিয়ে বিলাত যান। তার স্থলাভিষিক্ত হলেন মহকুমা হাকিম নোলান। জমিদার প্রজার মধ্যে এরূপ আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৮৭৩, ৮ আগস্ট তারিখে এই মর্মে লেখেন যে, এতাদৃশ দ্বন্দ্বে জমিদার প্রজা উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য। আর এর দ্বারা একমাত্র সরকারেরই বল সঞ্চয় হবে।

ভারতবর্ষীয় সভা নিশ্চেষ্ট বসে রইলেন না। সভা কর্তৃপক্ষ ১৮৭৩, ২০ সেপ্টেম্বর ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশনে মিলিত হন। এই বিসদৃশ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে জন্য বিশেষ আলোচনায় লিপ্ত হলেন। এর কারণ নির্ণয় এবং স্থায়ী প্রতিষেধের উপায় নিয়েও নেতৃবর্গ নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করলেন। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই ব্যাপ্যারটির ব্যাপ্তিলাভের জন্য ছোটলাট ক্যাম্বেলের সরকারী রেজলিউশনকেই বিশেষভাবে দায়ী করেন। সভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তন্মধ্যে একটি হ'ল—সরকার যেন অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন কর্মচারী নিযুক্ত করেন যারা জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সভার মতে খাজনা সম্পর্কীয় আইনেরও রদবদল প্রয়োজন। এই নিমিত্ত তাঁরা একটি কমিশন গঠনের জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র পাঠান। কিন্তু ছোটলাট ক্যাম্বেল এরূপ গঠন-মূলক প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি।

কথায় বলে, অশুভ থেকে শুভের উৎপত্তি। পাবনার এই প্রজা বিদ্রোহ উপলক্ষ করে বাঙলার মনীষীরা জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হলেন। নবীন সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত 'আর্য্যসিভি' (ARCYDE) ছদ্মনামে লালবিহারী দে সম্পাদিত 'বেঙ্গল

ম্যাগাজিনে' এক প্রস্ত ইংরেজী প্রবন্ধ লেখেন, ভূমিতে হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ আমলের প্রজাস্বত্ব নিয়ে। পর বৎসর ১৮৭৪ সনে এ সমুদয় দি পেজানট্রি অব বেঙ্গল নামে প্রকাশিত হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজ 'বঙ্গ দর্শনে' বাঙ্গালার কৃষক শীর্ষে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখলেন। এগুলিও পরে সাম্য পুস্তকে প্রকাশিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জনিত প্রজার দুর্দশার কথা তিনি যুক্তি প্রমাণ সহকারে ইহাতে ব্যক্ত করেন। বাঙালী প্রজা সাধারণের ভূমি স্বত্ব স্বীরিকৃত না হলে যে তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এ কথাও বিশেষ জোরের সঙ্গে লিখলেন। একস্থানে তিনি আবেগভরে বলেন দেশের হাজার করা ৯৯৯ জনের যদি শ্রীবৃদ্ধি না হ'ল তবে একে কার সমৃদ্ধি বলব? রামা কৈবর্ত ও রহিম সেখের মত সাধারণ মানুষের উন্নতি হলেই তবে দেশের সত্যিকার উন্নতি হ'ল বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকৃতি স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিতজনের অন্তঃকরণে গেঁথে গেল। দেখা যায় নব প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বা ভারত সভা এই দশকের শেষ দিকেই কৃষককুলের সমস্যা সম্বন্ধে আন্দোলনে অগ্রণী হন। এ কথা পরে আলোচ্য।

ক্যাম্বেলের সময়, ১৮৭৩ সনের শেষ দিকে বঙ্গ প্রদেশের রাঢ়, উত্তর বঙ্গ এবং পূর্ব বিহার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। কুখ্যাত উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক কাহিনী তথা লক্ষাধিক লোকক্ষয়ের কথা তখনও সাধারণের মনে জাগরূক। আসন্ন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে স্বদেশবাসীদের রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভা সরকারের নিকট পরিসংখ্যান সহ একটি লিপি পাঠালেন। এতে তারা শস্য উৎপাদন, শস্যহানি এবং শস্যের প্রয়োজনীয় পরিমানের উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রেও ছোটলাট ক্যাম্বেলের বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকট হয়ে পড়ল। তিনি সভা কর্তৃপক্ষকে সেক্রেটারি মারফত জানান যে, এ বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে তারা যেন প্রজা ও জমিদারের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে নিজেদের নিয়োজিত করেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁর কঠোর মনোভাব প্রকাশ পেল। সভা কিন্তু নিরস্ত না হয়ে পুনরায় জনসাধারণের দুর্গতির দিকে নজর দিতে সরকারকে অনুরোধ করেন। দুর্ভিক্ষ সত্বর ঐ সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠিয়ে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলে লোকজনের দুর্গতির কথা প্রকাশ করতে লাগলেন। ক্যাম্বেলের সুর নরম হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষ প্রশমনে তিনি অবিলম্বে

বে-সরকারী সাহায্য যাচ্ঞা করতে বাধ্য হন। ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে ভূস্বামীগণ বিশেষ সাড়া দেন। তাঁরা দুর্গতদের ত্রাণকার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। ভূস্বামী মহাজন ব্যবসায়ী এমন কি ইউরোপীয়েরা পর্যন্ত এ দুর্ভিক্ষকালে মুক্ত হস্তে দান করেন। ভূস্বামীরা একবৎসর কি তদূর্ধ্বকাল খাজনা আদায় স্থগিত রাখলেন। সরকারী উদ্যোগে যে ছ হাজার মাইল রাস্তা নির্মিত হয় তার জমিও তারা স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিলেন। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় দুর্ভিক্ষ প্রশমন সম্ভব হ'ল। এ সময়ে একজনেরও প্রাণহানি হয়নি বলে সরকারী নথীপত্রে উল্লিখিত হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ স্যর রীচার্ড টেম্পলকে দুর্ভিক্ষ কমিশনার নিযুক্ত করেন। ক্যাম্বেলের পর তিনিই হলেন বঙ্গের ছোটলাট (১৮৭৪-৭৬)। তাঁর কার্যভার গ্রহণের পরেও কিছুকাল দুর্ভিক্ষের জের চলেছিল। দুর্ভিক্ষকালে যারা ত্রাণকার্যে সবিশেষ তৎপর হন তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিজ অভিজ্ঞতা থেকে ভূস্বামী ও অপরাপর সম্পন্ন ব্যক্তিরা দুর্ভিক্ষ প্রশমনে কতখানি অগ্রসর হয়েছিলেন তাও তাঁর জানা। দেখি এই সকল ব্যক্তিকে সরকার পক্ষে সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্রও দেওয়া হয়। তৎকালীন 'কলিকাতা গেজেটে' এগুলি মুদ্রিত দেখেছি। প্রশাসনিক দিক থেকে শিক্ষিত ভারতবাসীদের সম্মুখে বিবিধ অসুবিধা সৃষ্টি সত্ত্বেও তাঁরা এইরূপ মানব কল্যাণকর কার্যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পশ্চাৎপদ হন নি, এবং সাগ্রহে এ বিষয় সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। এর ফলে তাঁদের গঠনমূলক কর্ম শক্তিরও পরিমাপ করতে তাঁরা সক্ষম হন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল ছোটলাট ক্যাম্বেল ছিলেন জবরদস্ত শাসক। বঙ্গ প্রদেশের শাসনভার তাঁর উপর অর্পিত। তিনি এমন অনেক কাজ করেছেন যা আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে সুফলপ্রসূ হয়েছিল। তবু তিনি এত নিন্দিত হলেন কেন? তখনকার নবজাগ্রত বাঙালী মানসিকতা ক্যাম্বেল বরাবর অগ্রাহ্য করে চলেন। তাদের কোন তোয়াক্কা না রেখেই নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনা মত কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হন। গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের নাগরিক হয়েও তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্রের একান্ত পক্ষপাতি। এ দিক দিয়ে ক্যাম্বেলকে লর্ড কার্জনের সমগোত্রীয় বলা চলে। কার্জন ছিলেন বড়লাট এবং ভারত শাসনে একরূপ সর্বেসর্বা। ক্যাম্বেলের

ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু এই সীমিত অবস্থার মধ্যেও তিনি স্বৈরতন্ত্রের চূড়ান্ত নজীর রেখে গেছেন।

৩

কথা উঠেছে এ সময়ে—এই সত্তরের দশকেই বাঙলায় যে নব জাগরণ উপস্থিত হয় তাতে মুসলমান সমাজের দান বা কৃতিত্ব ছিল কতখানি। পাঠক লক্ষ্য করবেন, মুক্তি সাধনায় সমগ্র বাঙালী তথা ভারতীয়ের কথাই আমি এ পর্যন্ত আলোচনা করেছি, কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণী বিশেষের বিষয় আমার আলোচনা বহির্ভূত। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ব্রিটিশ এবং ভারতবাসীর মধ্যে নানারূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সিপাহী যুদ্ধ ছিল এর ভিতর সর্বপ্রধান। এই যুদ্ধের প্রভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরে গিয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ও ভারতীয়ের মধ্যে যে ব্যাপারে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তার ফল হয়েছিল বিষময় এবং বহুদূর প্রসারী। তাই আমাদের মুক্তি প্রচেষ্টায় এর উল্লেখ না থাকলে ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যায়। এ কারণেই আমিও এর কার্যকারণ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। মুসলমান সমাজের কথা আলাদাভাবে এ যাবৎ কিছু বলা হয় নি। ওহাবী বিদ্রোহ* সম্বন্ধে যে এখনও উল্লেখ মাত্র করিনি তারও কারণ এই। তবে মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষের কথা বলতে গেলে এ বিষয়টি সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন।

মুসলমান সমাজের তথাকথিত উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে পৃথক ধরণের কাজ এই সময়ে সুরু হয়। তখন স্বল্প সংখ্যক হলেও কিছু কিছু মুসলমান ইংরেজী শিক্ষালাভ করেন এবং সরকারী চাকরি নেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্গ প্রদেশের মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ এবং উত্তর অঞ্চলের সৈয়দ আহ্‌মেদ খাঁ (পরে স্যর)-এর নাম করতে পারি। আবদুল লতিফ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং সৈয়দ আহ্‌মেদ মুন্‌সেফ। এই শ্রেণীর লোকেরা হিন্দু তথা অপরাপর সমাজের নেতৃ স্থানীয়দের সঙ্গে কখন একযোগে কখনও বা স্বতন্ত্র-ভাবে কাজ করতেন দেখেছি। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কলকাতায় শিক্ষিত ও

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের 'বিদ্রোহ ও বৈরিতা' গ্রন্থের "ওহাবী বিদ্রোহ" (পৃ ২৮-৪৯) প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।—অনুলেখক।

সম্পন্ন মুসলমানেরা মিলে ভারতবর্ষীয় সভার আদর্শে ন্যাশানাল মহ্‌মেডান এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। তারা ব্রিটিশের আধিপত্য স্বীকার করেই রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় উক্ত সভার মতই লিপ্ত হন। ১৮৬৩ সন নাগাদ আবদুল লতিফের উদ্যোগে মহ্‌মেডান লিটারারি এসোসিয়েশন কলকাতায় স্থাপিত হ'ল। সাহিত্য সভা বলে আখ্যাত হলেও এখানে বিবিধ বিষয়ের, যেমন শিক্ষা সংস্কৃতি এবং এমন কি রাজনীতিরও পর্যন্ত আলোচনা চলত। আবদুল লতিফ ষাট ও সত্তরের দশকে বিবিধ সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত ছিলেন। বেথুন সোসাইটিতে মুসলমান সমাজের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শীর্ষে তিনি একটি বক্তৃতা দেন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি, যতদূর জানা যায়, সর্বপ্রথম মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছিলেন। এ সময়েও কিন্তু সৈয়দ আহ্‌মদের মনে এ ধারণা স্পষ্টরূপ পায় নি। বরং ঐ ১৮৬৮ সনেই তিনি আলিগড়ে একটি ভার্নাকুলার ইউনিভার্সিটি স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। তখন ভারতবর্ষীয় সভা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম স্বরূপ ইংরেজীরই পক্ষপাতি ছিলেন। কলকাতার কেন্দ্রীয় সভা সৈয়দ আহ্‌মেদকে এ প্রস্তাব করার জন্য মৃদু ভর্ৎসনাও করেছিলেন। এর সাত আট বৎসর পরে হ'ল আহমেদের আলিগড় স্থিত এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের উদ্ভব। আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আহমেদ জাতীয় প্রচেষ্টা সমূহের অংশী বা উদ্যোক্তাও হয়ে ওঠেন। লালা লজপৎ রায় পরবর্তীকালে বলেছেন যে, তারা উত্তর ভারতে জাতীয়তার প্রথম পাঠ নেন স্যর সৈয়দ আহ্‌মেদের নিকট।

এখন অন্য কথায় আসি। দুই তিন দশক ধরে ওহাবীরা সমগ্র উত্তর ভারতে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে মুসলমান ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন ও প্রচার আরম্ভ করেন। এদের একটি সঙ্গীতে পাই—পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এমন ব্যাপক ও গভীরভাবে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে যেখানে আল্লার জয়ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যাবে না। ওহাবীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে শাসক ব্রিটিশেরা উত্যক্ত হয়ে ওঠেন এবং এদের দমনে প্রবৃত্ত হন। উভয়ের মধ্যে কত সংঘর্ষ ঘটেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার জয়ী হন। তবে এ জয় বিস্তর ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে লাভ করতে হয়েছে। ওহাবীদের

কার্যকলাপের আনুপূর্বিক বিবরণ থেকে বুঝা যায় ব্রিটিশেরা ছিলেন উপলক্ষ, আদতে হিন্দুরাই ছিলেন লক্ষ্য। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে হিন্দুরাই যে এক সময় ভীষণ প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবেন এ কথাটা এরা ভালভাবে বুঝেছিলেন। ষাটের দশকে একদিকে যেমন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় অন্যদিকে তেমনি সরকার নেতৃবৃন্দকে ধরে কখন বিচার দ্বারা কখনও বা বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ করেন। ওহাবীরা কিন্তু 'মরিয়া না মরে রাম'। তাদের প্রকোপ কিছু প্রশমিত হলেও ১৮৭১ সনের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন নর্মান এবং আন্দামানে বড়লাট মেয়োকে ওহাবীরা হত্যা করে (৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২)। ইতিমধ্যেই কিন্তু কোন কোন সরকারী কর্মচারী ওহাবী বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং সাধারণ মুসলমানকে স্বপক্ষে আনবার জন্য বেশ কিছু উপায় বাৎলান।

সিবিলিয়ান ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার ছিলেন একজন মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ১৮৭০ সনে দি ইনডিয়ান মুসলমানস্ নামক একখানি পুস্তক লিখলেন। এর মধ্যে ওহাবীদের কথা আছে। কিন্তু মূল বিষয় ছিল সাধারণ মুসলমানকে ইংরেজের পক্ষে টানবার ফন্দি ফিকির। হিন্দুরা মুসলমানদের নিকট ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রধান বিপক্ষ। কাজেই এদের উপর বিদ্বেষ ছিল অবর্ণনীয়। হাণ্টার এই মনোভাবের সম্পূর্ণ সুযোগ নিলেন। তিনি লিখলেন সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে মুসলমানদের অর্থ নৈতিক সামাজিক এমন কি ধর্মীয় উন্নতিও সম্ভব হবে না। তাদের হিন্দুদের মত শিক্ষায় অগ্রসর হতে হবে। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান তৎকালে ছোট বড় যাবতীয় কর্ম প্রায় হিন্দুদেরই অধিকারে। উকিল মোক্তার ডাক্তার কারণিক ব্যবসায়ী—অর্থাগমের সবকিছু ক্ষেত্রই হিন্দুরা দখল করে নিয়েছেন। ভূমি স্বত্বের ব্যাপারেও পূর্বে মুসলমানের যে একান্ত প্রাধান্য ছিল তা আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে লাগল এবং তারা হয়ে উঠল নিঃস্ব—'নিজভূমে পরবাসী'! ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মোহে পড়ে থাকলে তাদের আত্মঘাতই করা হবে। হাণ্টারের এই গ্রন্থখানি কিছু পরেই মুসলমানদের নিকট আধুনিককালের 'হাদিস্' বলে গণ্য হয়।

হাণ্টারের বইখানি ইংরেজীতে লেখা। ইংরেজী না জানা সাধারণ অনুন্নত মুসলমানেরা তখনই এর দ্বারা কতখানি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বলা কঠিন। কিন্তু সরকারী

শাসক গোষ্ঠী এ থেকে এক নূতন পথের সন্ধান পেলেন। দেখি, ১৮৭৪-৭৫ সনে শিক্ষা অধিকর্তার বার্ষিক বিবরণে মোসলেম এডুকেশন বা মুসলমানদের শিক্ষা শীর্ষক একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। ক্যাম্বেলের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারটি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্যই উদ্দিষ্ট। তথাপি অনগ্রসর মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নব নব উপায় অবলম্বিত হ'ল। মুসলিম শিক্ষার এক প্রধান উপায় হ'ল মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা। মক্তব প্রাথমিক পাঠশালারই মত। তফাৎ এই যে, এখানে প্রথম থেকেই আরবী বা ফারসীর চর্চা সুরু হ'ত। মাদ্রাসা উচ্চতর শিক্ষার জন্য গঠিত। এখানে আরবী ফারসীর অনুশীলন বেশী করে করা হ'ত। আর মুসলমানী আচার আচরণ রীতি পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধনই এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণ মুসলমানের মধ্যে ওহাবী প্রচার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। হিন্দু দলন এবং হিন্দু বিদ্বেষ তাদের প্রচারের ছিল এক প্রধান অঙ্গ। এখন আর ওহাবীদের প্রাধান্য রইল না। কিন্তু হিন্দু বিদ্বেষ দৃঢ়ীভূত হবার সুযোগ পেল এই মক্তব মাদ্রাসার ভিতর দিয়ে। আমরা শৈশবে ও কৈশোরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে মাদ্রাসায় পড়া মৌলবীদের দেখেছি। সাধারণভাবে ঢালোয়া কিছু বলা না গেলেও আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি হিন্দু মুসলমানে ভেদ-নীতি প্রচারে এরা হয়ে পড়েন সরকারের বড় রকমের হাতিয়ার।

ক্যাম্বেলের সময়েই মুসলমানদের এই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতির প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি কতখানি দায়ী বলা যায় না। তবে একটি বিষয় সুস্পষ্ট; যে ধারায় হিন্দু বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল তা পরবর্তী আশির দশকেই উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান নেতৃবৃন্দকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮৭৪, ২৪ মে) মূলে সৈয়দ আহ্‌মেদ প্রাচ্য ভাবাসমূহ শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষাকেও উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। তিনি তখনও জাতীয়তাবাদী এবং সরকারের ছলাকলার বিরুদ্ধে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই চলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী দশকে তাঁরও মতিগতি বদলায়। জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে শুধু মুসলমানদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকেই তিনি বড় করে দেখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য এ কিঞ্চিৎ পরের কথা।

হিন্দু মুসলমানের বিভেদ বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক-রূপ পেল। বড়লাট কার্জন তো একটি বক্তৃতায় বলেই ফেল্লেন মুসলমানেরা তার সুয়োরাণী এবং হিন্দুরা দুয়োরাণী! বঙ্গ দেশে সত্তরের দশকে নব জাগ্রত বাঙালীদের মধ্যে যে প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দেয় তার সঙ্গে আবদুল লতিফ বা সৈয়দ আহ্‌মেদ ছাড়া আর কারো যোগাযোগ ঘটেছে বলে প্রমাণ পাই না। আবদুল লতিফ এই দশকেও সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক বিবিধ কার্যে অগ্রসর হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মিলিত প্রতিষ্ঠান জনহিতকর বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার তিনি শুধু সক্রিয় সদস্যই ছিলেন না শেষ দিকে কয়েক বৎসর তিনি এর সম্পাদকের কার্যও বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে নির্বাহ করেন। একটু আগেই নবজাগ্রত বাঙালীর প্রাণ চাঞ্চল্যের কথা বলেছি। এখন আমরা সে বিষয়ে একটু বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই।*

* লেখকের 'বাংলার নব জাগরণের কথা', পুস্তকে "বঙ্গের নব জাগৃতি ও মুসলমান" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (পৃ, ১৭৭— ২০০)।—অনুলেখক।

শাসনে স্বৈরাচার : নূতন ভাবনা নূতন কাজ

পূর্ব অধ্যায়ে বাঙালীর প্রাণ চাঞ্চল্যের কথা উল্লেখ করেছি। পাঠকগণ আগের অধ্যায়গুলি থেকে এ সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পেয়েছেন। প্রশাসনিক পদ্ধতি নবজাগ্রত বাঙালীর মনে বিষম ক্ষোভের সঞ্চার করে। তবে তখন যে সব আদর্শের দ্বারা তাঁরা অনুপ্রাণিত হন, প্রশাসনিক বাধা কাটিয়ে আত্মস্থ হতে এর ফলে আশাতীত সক্ষম হয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকে ইউরোপের, বিশেষ করে মধ্য ইউরোপের খণ্ড খণ্ড অঞ্চলগুলি সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক একটি জাতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ষাটের দশকে, ১৮৬৩ সন নাগাদ আমেরিকায় নিগ্রো দাসেরা স্বাধীনতা লাভ করে। এই সকল দৃষ্টান্ত তখন শিক্ষিত মাত্রকেই যে উদ্দীপিত করে তা বুঝা কঠিন নয়। এর উপর ১৮৬৯ সনে সুয়েজ খাল জাহাজ যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত হ'ল। আগে থেকেই আমরা ইউরোপীয় প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকি। সুয়েজ খাল খোলার পরে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ইতিহাস দর্শন এবং নূতন নূতন ভাবধারায় সমৃদ্ধ গ্রন্থরাজি এ দেশে সহজেই ভূরিভূরি আমদানি হতে লাগল। আমরা অনায়াসে এ সবের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হলাম।

পশ্চিমের মুক্তি প্রচেষ্টার আদর্শ এবং ঐ সব ধারায় সমৃদ্ধ রচনাদি পরাধীন ভারতবাসীকেও একজাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এ জন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থা যে কত অনুন্নত সে সম্বন্ধেও চেতনা জাগল। বাঙালী মনীষা এই নিদারুণ অবস্থা এবং তা থেকে পরিত্রাণ লাভের ভাবনা গদ্যে পদ্যে ব্যক্ত করতে লাগল। ইতিমধ্যেই হিন্দু মেলার জন্য রচিত সঙ্গীত-গুলির সঙ্গে বাঙালী সমাজ পরিচিত হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সব ভারত সন্তান / হয়ে একমন প্রাণ / গাও ভারতের যশোগান' কবিতাটি (১৮৬৮ সনে হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত) আমাদের মনকে আবেগপ্লুত না করে পারে না। কিন্তু তখন ছিল, মোটামুটিভাবে বলতে গেলে জাতীয় সঙ্গীতের উষাকাল। এই দশকেই মুখ্যত নব্যভাব ধারায় উদ্দীপিত

আমাদের মনের কথা ছন্দে প্রকটিত হতে সুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর পর লিখেছিলেন: কবির মৃত্যুতে আমাদের অশেষ দুঃখ, কিন্তু হতাশ হবার কারণ নাই। কেন না আমাদের মধ্যে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও রয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অতঃপর তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করলেন। নূতন ভাবনার কথা কবিবর হেমচন্দ্র ব্যক্ত করলেন "ভারত সঙ্গীতে"। এর আরম্ভ এই:

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?

কবিতাটি প্রকাশিত করলেন স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেটে' (১২৭৭, ৭ই শ্রাবণ)। ভূদেব সম্বন্ধে আমাদের এ পর্যন্ত তেমন কিছু বলার অবকাশ হয়নি। তিনি সরকারী শিক্ষা বিভাগের পদস্থ কর্মী হয়েও ছিলেন স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ। আমাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ঐ সময়েই যে এতটা দানা বেধেছিল ভূদেবের লেখনি এর মূলে ছিল অনেকখানি। তাঁর 'শিক্ষা দর্পণে' পূর্ব দশকে এই উদ্দেশ্যে যে সব প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখেন তা পরে পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ এবং বিবিধ প্রবন্ধে-পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। ভূদেবের লিখনশৈলীর দ্বারা শিশিরকুমারও বিশেষ প্রভাবিত হন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যে অমন মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখনী পরিচালনা করে প্রারম্ভ থেকেই নবজাগ্রত বাঙালীর চিত্তকে জয় করতে পেরেছিলেন তার মূলেও দেখি এই পরিপাটি পরিচ্ছন্ন লিখনশৈলী। "ভারত সঙ্গীত" প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট ভূদেববাবুকে জবাবদিহি করতে হ'ল।

হেমচন্দ্রের মত অপরাপর বহু কবিও এই সময়ে জাতীয় সঙ্গীত রচনায় মন দিলেন। এই সকল সঙ্গীতের শুধু ভাবোদ্দীপনাই নয়, পরাধীনতার বিষময় ফল স্বরূপ অর্থনৈতিক দাসত্বও বড় স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছিল। এখানে পর পর কয়েকটি কবিতা বা কবিতাংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া গেল। বিখ্যাত কবি

ও নাট্যকার হিন্দু মেলার অনন্যতুল্য প্রবক্তা মনোমোহন বসুর এই কবিতাটি সর্বাগ্রে আমাদের মনে আসে। তিনি লিখলেন :

দিনের দিন, সবে দীন, হয়ে পরাধীন !
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ,
সে সাহস বীর্য নাহি আর্য-ভূমে,
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য-বংশ সগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা রাহু মুখে লীন ॥
অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন ॥
তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষী শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন !
তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর, হ'ল দেশে—কি দুর্দিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ,
ধ'র্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ, বাকল টেনা
ডোর কপীন।
ছুঁই, সুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে ; খেতে শুতে, যেতে, কিছুতে
লোক নয় স্বাধীন।"
('হরিশ্চন্দ্র'—পৌষ ১২৮১)।

সে যুগে আমাদের পরনির্ভরতা কত চরমে উঠেছিল মনোমোহনের কবিতায় তা সুব্যক্ত। এলাহাবাদ প্রবাসী গোবিন্দচন্দ্র রায়ও স্বদেশের দৈন্য

দশায় একটি চিত্র পরবর্তী কয়েক পঙ্‌ক্তিতে আমাদের চোখের সামনে ধরেন। এর অংশ বিশেষ হ'ল :

"কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ওকি শেষ নিবেশে রসতল রে,
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পরদাস খতে সমুদায় দিলে।
পরহাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে,
পর লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে,
পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

—[(?) ১৮৭৪]

সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলসরূপে ১৮৭৫-এর শেষ দিকে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন যে কবিতা লেখেন, তার মধ্যে ভারতবাসীর দৈন্যের কথাও বিধৃত। নবীনচন্দ্র তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এ সত্ত্বেও তিনি লিখতে ভুললেন না :

'ভারতের তন্তু নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টার!
লবণাম্বুরাশি—বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে লিবরপুলে লবণ তাহার।'

(—১৮৭৫)।

এই সময়ে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দাশ প্রমুখ কবি ও নাট্যকারেরা ঐ একই সুরে মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে। এ দেশে ও বিদেশে মধ্যে মধ্যে এমন সব আইন কানুন বিধিবদ্ধ হয় যার ফলে এ সময়ে আমাদের জাতীয় শিল্পসমূহ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। এমন কি তখন অনেকগুলি অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কতখানি পরনির্ভর হই তাও উপরি-উদ্ধৃত কবিতা বা কবিতাংশ থেকে আমাদের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম

হয়। ফলে পরনির্ভরতা এ দেশবাসীকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে। বিলাতের ফ্রি-ট্রেড বা অবাধ বাণিজ্য নীতি পরাধীন ভারতবর্ষে বিশেষ অনুসৃত হয়। এর ফলে ইংলণ্ডবাসিদের হ'ল ষোল আনা সুবিধা। ভারতবাসী আমরা অতি দ্রুত নিঃস্ব হয়ে পড়ি, দুঃখ দারিদ্র্য হয় আমাদের চির সঙ্গী। বাঙলার কবিকুলের মত চিন্তাবিদ খ্যাতিমান মনীষীদের প্রাণেও এর ব্যথা কম বাজে নি। মনীষী ভোলানাথ চন্দ ছিলেন সে যুগের এক বিখ্যাত লেখক। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রাজনারায়ণ বসুর সহপাঠী ও সমগোত্রীয় ছিলেন তিনি। শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিনে' ভোলানাথ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে অনুসৃত অবাধ বাণিজ্য প্রথা আমাদের শিল্পকে কতখানি ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে তা তথ্য প্রমাণ সহযোগে সবিস্তারে বিবৃত করেন। তিনি সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখলেন যে, পূজা মণ্ডপে, বিবাহ বাসরে, শ্রাদ্ধ সভায় এমনকি গৃহাভ্যন্তরে নানা উপলক্ষে বিদেশজাত উপচার সমূহ আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিলাত থেকে সরবরাহ হচ্ছে।

কিন্তু এ অসহনীয় অবস্থার প্রতিকার কি? এ সম্পর্কে ভোলানাথ এই মর্মে বলেন,—এর প্রতিকারকল্পে নতুন আইন কানুনের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, আসুন নষ্ট শিল্প উদ্ধারের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করি—স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যতিরেকে বিলাতি দ্রব্য স্পর্শ করব না। এ সম্পূর্ণ আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকলে আমরা সাফল্য লাভ করব, শিল্পে বাণিজ্যে আবার উন্নত হব।

ভোলানাথ এই প্রসঙ্গে একটি সক্রিয় কর্মপন্থার বিষয়ও আমাদের সম্মুখে ধরলেন। তিনি বল্লেন: 'কোনরূপে দৈহিক বল প্রয়োগ না করে, রাজানুগত্য অস্বীকার না করে এবং কোন নূতন আইনের জন্য প্রার্থনা না জানিয়ে আমরা আমাদের পূর্ব সম্পদ ফিরিয়ে আনতে পারি। চরম ক্ষেত্রে একমাত্র না হলেও সবচেয়ে অধিক কার্যকরী অস্ত্র নৈতিক শত্রুতা (moral hostility)। এ অস্ত্র অবলম্বনে কোন অপরাধ নেই। আসুন বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিব না—এই সঙ্কল্প আমরা সকলে গ্রহণ করি। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীরই সাধ্য।'

ভোলানাথ চন্দ্র সক্রিয় পন্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'নৈতিক শত্রুতার' কথা বলেছেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় এটি একটি নূতন শব্দ দ্বারা আমাদের নিকট খুবই পরিচিত হয়। এ শব্দটি হ'ল 'বয়কট'। তখনো বয়কট কথাটির প্রয়োগ হয়নি। এই প্রসঙ্গে দুই একটি কথা এখানে বলে নি'। ক্যাপটেন বয়কট (১৮৩২-৯৭) নামক আয়ারল্যাণ্ডের এক ভূস্বামী নিজ অঞ্চলে প্রজাদের ভূমি-স্বত্ব ব্যাপারে নানারূপ কুকার্যে লিপ্ত হন। তখন আইরীশ ল্যাণ্ড লীগের পরিচালনায় প্রজাবৃন্দ আন্দোলন সুরু করে। তারা সর্বপ্রকারে তার সংস্রব ত্যাগ করল। বয়কটকে নিত্য ব্যবহার্য কোন দ্রব্যই সরবরাহ করা হয়নি। দোকানদার তার নিকট কোন জিনিষ বিক্রয় করল না। কুলি মজুর ধোপা নাপিত গাড়োয়ান কাউকেই তার কাজ করতে লীগ দিত না। কথিত আছে, জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে উঠলে বয়কট বিলাতে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। তখন লীগের পরিচালনায় বয়কটের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তা এইরূপে সাফল্য মণ্ডিত হ'ল। পরবর্তীকালে— শতাব্দী শেষে চীনে এবং বর্তমান শতাব্দীতে বাংলায় যে বিলাতী বর্জন আন্দোলন সুরু হয়, এক কথায় তাকে আমরা আয়ারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্তে 'বয়কট' বলে অভিহিত করি। সামাজিক ও নৈতিক অপরাধের জন্য আমাদের দেশেও 'এক ঘরে' করার ব্যবস্থা ছিল। একথাটিও এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন। ভোলানাথের নৈতিক শত্রুতা আলোচনা কালে এখানে বয়কট প্রসঙ্গও স্বতঃই এসে যায়।

যুগ যুগ ব্যাপী প্রশাসনিক কলা কৌশল ভারতবাসী জনসাধারণকে কিরূপ দুর্বল ও নিস্তেজ করে তোলে সে বিষয়ে আমরা এখন খানিকটা অবহিত হয়েছি। প্রশাসন ক্ষেত্রে ইংরেজ আমাদের অংশী করতেও নারাজ। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এক ফতোয়া জারি করে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিলেন যে, বঙ্গেতর প্রদেশে কোন শিক্ষিত বাঙালীকে সরকারী কর্মে নিয়োগ করা চলবে না। এর পরবর্তী কয়েক বৎসর যাবৎ উচ্চ শিক্ষিতদের প্রতি কর্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাবের পরিচয় আমরা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে পেয়েছি। এই মনোভাব কার্যক্ষেত্রে আরও প্রকট হয়ে উঠল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষে।

আমরা ইতিপূর্বে সিবিল সার্বিস সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি। পাঠকের

মনে হয়তো প্রশ্ন জাগবে আমাদের মুক্তি প্রচেষ্টার সঙ্গে সিবিল সার্বিসের সম্পর্ক কি? আজিকার দিনে এর তৎকালীন গুরুত্ব আমাদের তেমন হৃদগত হওয়া সহজে সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজনবশে ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলতে হয়েছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে প্রথম মহাসমরের পর তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী লয়েড জর্জ একবার এই সার্বিসকে ভারতীয় প্রশাসনের স্টীল ফ্রেম বা ইস্পাত কাঠামো বলে উল্লেখ করেছিলেন। সিবিল সার্বিসের আনুপূর্বিক ইতিহাস যাদের জানা তাদের নিকট লয়েড জর্জের এই কথাটি আদৌ বিস্ময়ের উদ্রেক করে নি। আমি এখানে কি স্বদেশী কি বিদেশী সমুদয় চিন্তাশীল এবং এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের কথা প্রয়োজনমত বলে নিয়েছি। এ দেশের শাসন ব্যবস্থা এক রকম পুরোপুরিই পরিচালিত হত এই সার্বিসের অন্তর্ভুক্ত কর্মীদের দ্বারা। তাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভারতবাসীর নিকট এর দ্বার রুদ্ধ করার এত কৌশল ও বিধি নিষেধ, এবং স্বদেশীয়দের এর সামিল হয়ে আংশিকভাবে ভারত শাসনের অঙ্গীভূত হওয়ার এতখানি আকূতি। বস্তুতঃ এ তাবৎ কাল মাত্র পাঁচশ ভারতীয় সিবিল সার্বিস মণ্ডলী-ভুক্ত হয়েছিলেন। এতেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কতই না বিরূপ মনোভাব তখনই চোখে পড়ে। সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামান্য কারণে কর্ম থেকে অপসারণের কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। এ প্রসঙ্গটি এখানে একটু বিশদভাবে আলোচ্য।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশে আসেন এবং ১৮৭১ সনে নভেম্বরে শ্রীহট্টে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ নিয়ে যান। দুই বৎসর যেতে না যেতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উপর অশনিপাত হল। যুধিষ্ঠির নামে এক আসামীকে নিয়মতম কর্মচারী ফেরার বলে লেখেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করান। ম্যাজিস্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড একে কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা এবং তজ্জনিত অপরাধ বলে গণ্য করলেন ও সবিস্তারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখলেন। এই সাদারল্যাণ্ড কে ছিলেন আমাদের একটু জানা দরকার। তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি এবং 'স্বাধীন ব্রিটন' বলে গর্বে স্ফীত। এর পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ফিরিঙ্গিরা ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে জানতেন। ব্রিটিশের বিরূপ মনোভাব তাদের মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল করেছিল বেশী করে।

ডিরোজিও স্বদেশ ভারতবর্ষের উপরে প্রথম জাতীয়তা মূলক কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু ক্রমে ফিরিঙ্গিদের মনোভাবে প্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটল। সিপাহী বিদ্রোহ কালে ফিরিঙ্গিরা ব্রিটিশকে নানাভাবে সাহায্য করে। প্রতিদান স্বরূপ তাদের সামরিক ও অসামরিক সরকারী বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করা হয়। তারাও ক্রমে নিজদিগকে ব্রিটিশের সমান বলে ভাবতে শেখে। আলোচ্য দশকের প্রথম থেকেই এর যথেষ্ট পরিচয় আমরা পেতে থাকি।

ম্যাজিস্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড সুরেন্দ্রনাথের এই অপরাধকে ফলাও করে বর্ণনা করতে ছাড়লেন না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সুরেন্দ্রনাথের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশন কর্তৃক সুরেন্দ্রনাথকে কর্তব্যে অবহেলা হেতু দোষী সাব্যস্ত করা হ'ল। ভারত সরকার ও ভারত সচিব কমিশনের রায় গ্রহণ করে সুরেন্দ্রনাথকে কর্ম থেকে বরখাস্ত করলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ ভাতা স্বরূপ মাসিক ৫০ টাকা দেবার ব্যবস্থা হয়। এ নিয়ে তখন বঙ্গদেশে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করলেন প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলিও কর্তৃপক্ষের এতাদৃশ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ নিরস্ত হবার পাত্র নন। তিনি এই গুরুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করার নিমিত্ত বিলাতে রওনা হলেন। বিলাত পৌছে যথাস্থানে আপীল করলেন। তাঁর এই মোকদ্দমায় জুনিয়র আনন্দমোহন বসু ছিলেন ব্যবহারজীবি। এর আগেই আনন্দমোহন ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথের আবেদন অবশ্য না-মঞ্জুর হ'ল। ভাবলেন ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরবেন এবং স্বাধীন আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হবেন। কিন্তু এতেও যে বিষম বাধা। কোন বরখাস্ত সরকারী কর্মীকে ব্যারিস্টারি সনদ দেওয়া চলবে না এই অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথ এ থেকেও বঞ্চিত হন। এর পরে স্বদেশে ফেরা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ১৮৭৫ সনে তিনি কলকাতায় ফিরলেন। পিতৃ বন্ধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সুরেন্দ্রনাথকে স্বদেশে ফেরা মাত্রই মেট্রোপলিটান অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এর দ্বারা সরকারী অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি কার্যত প্রতিবাদ জানান। এর পর

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের স্থচনা হ'ল। এ সম্বন্ধে আমরা পরে জানতে পারব।

এই সময়কার আর একটি দুঃখজনক ঘটনা—বরদার গাইকোয়াড়ের গদিচ্যুতি। ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্ণেল ফেয়ারের হত্যার ষড়যন্ত্রে গাইকোয়াড় লিপ্ত ছিলেন এই সন্দেহে তাঁর বিচার হ'ল বরদার বাইরে ব্রিটিশ আদালতে। বিচারের ফলে গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি ঘটে। তখন এ নিয়ে কলকাতায় বেশ আলোড়ন উপস্থিত হয়। প্রশ্ন জাগে, কোথায় ভারতের পশ্চিম প্রান্তে বরদায় এই ব্যাপার ঘটল, তা নিয়ে কলকাতায় এত আন্দোলন কেন? তখন কলকাতা সমগ্র ভারতের—ব্রিটিশ ভারত, কি রাজন্য ভারত—রাজধানী এবং কেন্দ্রীয় শাসন কেন্দ্র। ভারত সীমানার মধ্যে দূর দূরান্তেও যা কিছু ঘটুক না কেন তার স্পন্দন এ হেতু কলকাতায়ই বিশেষভাবে অনুভূত হত। সিপাহী যুদ্ধের পর কোন মিত্র রাজার রাজ্যচ্যুতি আমাদের এক রকম কল্পনার বাইরেই ছিল। কেননা রাণী ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণা পত্রে এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ থাকে যে, কোন মিত্র বা করদ রাজ্যকে ব্রিটিশ ভারতের অঙ্গীভূত করা হবে না। ঘোষণা পত্রের আক্ষরিক উক্তি অনুসারে গাই-কোয়াড়ের গদিচ্যুতি হয়ত অসম্ভব মনে হ'ত না, কিন্তু এ দীর্ঘকালের অবস্থা দৃষ্টে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে, কোন মিত্র রাজাকে রাজ্যচ্যুত করাই হবে না। রাজন্য ভারতকে ব্রিটিশ ভারত থেকে আলাদা করে রাখার এক মূল কারণ ছিল বলে মনে হয়। মিত্র রাজ্যগুলিতে মধ্যযুগীয় শাসন পদ্ধতি বহাল রাখাই ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের স্বার্থ। সিপাহী যুদ্ধের কথাও কর্তৃপক্ষ তখন পর্যন্ত মোটেই ভুলতে পারেন নি। তাদের আরও আশঙ্কা ছিল, পাছে রাজন্যবর্গ আধুনিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একযোগে অভ্যুত্থান ঘটান। ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীরা ক্রমশ সচেতন হয়ে ওঠেন এবং ব্রিটিশের সকল কার্যকলাপই বিনা আপত্তিতে সমর্থন না করে পরীক্ষা করে দেখতে স্বরু করেন। তাতে স্বৈরাচারী প্রশাসনের পক্ষে বিষম বাধা বলে সরকার মনে করতে আরম্ভ করেন।

আবার বরদার গাইকোয়াড় ছিলেন প্রগতিপন্থী। তাঁর শাসন পদ্ধতি প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত। তাঁর উপর ব্রিটিশের বিরূপ মনোভাবের এও

একটি কারণ বলে অনেকের ধারণা। গাইকোয়াড় বরাবর প্রগতিশীল বলে কি শাসন কেন্দ্রে কি অন্যত্র সকলের নিকটে পরিচিত। তিনি ব্রিটিশ অংশের মত নিজ রাজ্যকেও সমানতালে চালনা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। যদিও পরবর্তী কালের ঘটনা, তথাপি দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। গাইকোয়াড় ছিলেন এতই প্রজাবৃন্দের কল্যাণকামী যে, তিনি বরদায় সর্বপ্রথম অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত করেন। এ হেন প্রগতিশীল বরদা! তখন শাসন কর্তৃপক্ষ অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথাও ভাবতে পারেন নি। গাইকোয়াড়ের গদিচ্যুতির ব্যাপারটা ভারত শাসনকেন্দ্র কলকাতায় যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে তাতে আর আশ্চর্য কি! 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'সোমপ্রকাশ' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। পত্রিকার কথা ছিল মর্মস্পর্শী, তীব্র ও কঠোর। ইংরেজী বাঙলা পত্র পত্রিকা, বিশেষ করে, ইংরেজী পত্রিকা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয়তামূলক ভাবাদর্শ প্রচারে সহায় হ'ল। এখানে সমগ্র ভারতকেই একই রাষ্ট্র বলে ভাবনার পরিচয়ও নানা সূত্র থেকে জানতে পারি। পত্রিকা তখন ছিল দ্বি-ভাষিক—বাংলা ও ইংরেজী অংশ সমন্বিত। এমন কি মহারাষ্ট্রে পর্যন্ত এর প্রভাব কত গভীর ভাবে অনুভূত হয়েছিল তখন। কিশোর ও যুবক মন এ থেকে কতখানি অনুপ্রাণনা লাভ করেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের কোন কোন উক্তি থেকে আমরা তা পরিষ্কার বুঝতে পারি। বলা বাহুল্য, গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতির ব্যাপারটা নিয়েও পত্রিকা জ্বালাময়ী ভাষায় যুবক মনে আলোড়ন উপস্থিত করেছিলেন ঐ যুগে।

তখনকার দিনে আমাদের জাতীয় নাট্যশালা সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছে। গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি উপলক্ষেও বহু নাটক রচিত হয় এবং জাতীয় নাট্যশালায় এগুলি অভিনীত হতে থাকে। ব্রিটিশের স্বৈরাচার হৃদয় মনকে এই ভাবে আলোড়িত করল। আমাদের মধ্যে নব চেতনা জন্মানোয় জাতীয় নাট্যশালার কৃতিত্ব অনেকখানি। তাই এখানে এ সম্বন্ধেও একটু বিশদ করে বলা দরকার।

জাতীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ কয়েকজন বঙ্গ সন্তান মিলে কলকাতায় ১৮৭২

খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রভৃতি। নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার কল্পনা জল্পনা হতেই হিন্দু মেলার অধিনায়ক নবগোপাল মিত্র এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। নাট্যশালার অভিনয় শুরু হয় দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ দ্বারা (৭ ডিসেম্বর ১৮৭২)। পৌরাণিক ও সমসাময়িক ভাবাদর্শ নিয়ে রচিত বহু নাটক এখানে অভিনীত হতে থাকে। কিশোর ও যুবক মনে এই ভাবাদর্শ একেবারে গেঁথে গেল। জাতীয় নাট্যশালা সাধারণগম্য হওয়ায় ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে কিছু অর্থের বিনিময়ে সকলেই প্রবেশাধিকার পান। কাজেই জন সাধারণের মধ্যে নূতন নূতন ভাবনা দৃঢ়মূল হবার সুযোগ লাভ করে। এই নাট্যশালা পরে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বিভক্ত হয়ে গেলেও জাতীয় আদর্শ কিন্তু বরাবর অক্ষুন্নই ছিল। ক্রমে এর উপর রাজ-রোষও নেমে আসে। দুই একটি ব্যাপারের উল্লেখ করলেই আমরা তা বুঝতে পারব।

সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলসরূপে ১৮৭৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় আগমন করেন। এই উপলক্ষে সরকারী উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরস্থ পুরনারীদের নিয়ে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি দ্বারা নারীগণ যুবরাজকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। এর দ্বারা সামাজিক মর্যাদাবোধে বিশেষ আঘাত লাগে। এ ব্যাপার তখন সমাজে সবিশেষ ধিকৃত হয়। জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি মাত্রেই এই ব্যাপারটিকে তখন বরদাস্ত করতে পারেন নি। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কুখ্যাত সম্বর্ধনাকে 'বাজিমাৎ' কবিতায় জাতীয় চিত্তের তৎকালীন প্রতিক্রিয়ার একটি স্পষ্টরূপ দিয়েছেন। জগদানন্দের কার্যকে ব্যঙ্গ করে গজদানন্দ প্রহসনও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'ল। এ ব্যাপারে কিন্তু সরকার আর বসে থাকতে পারলেন না। তারা রাজভক্ত প্রজাকে রক্ষার জন্য অর্ডিনান্স জারি করে এর অভিনয় অবিলম্বে বন্ধ করে দিলেন। নাট্যশালার উপর এর পরেও কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোপ পড়ল। অশ্লীলতার অজুহাতে সুরেন্দ্র বিনোদিনীর অভিনয় বন্ধ করানো হয়। বিচারে অমৃতলাল বসু ও উপেন্দ্রনাথ দাসের এক

মাস কারাদণ্ড হ'ল। হাইকোর্টে অবশ্য সুরেন্দ্র বিনোদিনী অশ্লীল বলে প্রমাণিত হয়নি। ফলে অমৃতলাল ও উপেন্দ্রনাথ মুক্তি পান। ১৮৭৬ সনের ডিসেম্বর মাসে জনসাধারণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সরকার রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করিয়ে নেন। অর্ডিন্যান্স জারি থেকে আইন পাস হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং ভারতবর্ষীয় সভা এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করতে থাকেন। সভা একটি প্রস্তাবে বলেন যে, সরকারের এ ব্যবস্থার দ্বারা বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ক্রমশ হ্রাস পাবে। স্বাধীন চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের বিষম বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু কোন স্তরেই জনসাধারণের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হ'ল না। কর্তৃপক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রচারের বিভিন্ন সূত্রকে প্রতিরোধ করতে এ সময়ে বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। তাদের এই স্বৈরাচারী মনোভাব বুঝতে তখন লোকের এতটুকুও অসুবিধা হয়নি। অভিনয় সংক্রান্ত নিষেধক আইন দুই বৎসরের মধ্যেই সাহিত্য সংক্রান্ত এক ব্যাপকতর নিষেধাত্মক আইনের বিধানে পরিণত হয়। যথা সময়ে এ কথা বলব।

সত্তরের দশকে বাঙালীর প্রাণচাঞ্চল্য দিকে দিকে পরিলক্ষিত হ'ল। সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রে এই চাঞ্চল্যের ছাপ সুস্পষ্ট। তখনও বাঙলা দৈনিক পত্রের আবির্ভাব হয়নি। সাপ্তাহিক পত্র দ্বারাই সমাজের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলত। গত পূর্ব দশকে 'সোমপ্রকাশ' এবং পূর্ব দশকের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই সব সমস্যার আলোচনায় নিজেদের প্রতিষ্ঠাবধিই ব্যাপৃত রেখেছিলেন। আলোচ্য দশকে বাঙালী চিত্তে আমাদের নব জাগরণের অভ্যুত্থান দেখা দেয়। এই দশকে উক্ত দুইখানি সাপ্তাহিকের সঙ্গে আরও অনেক সংবাদপত্র বার হয়। জাতীয়তার ভিত্তিতে জাতি সংগঠনের কার্যে এ সবের ভূমিকা যে কত তা বলে শেষ করা যায় না। এ সময়কার নবপ্রকাশিত সাপ্তাহিকগুলির মধ্যে 'সুলভ সমাচার' (১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭), 'মধ্যস্থ' (২ বৈশাখ ১২৭৯ প্রথমে সাপ্তাহিক), 'ভারত সংস্কারক' (৭ বৈশাখ ১২৮০), 'সহচর' (৩ আষাঢ় ১২৮০), 'সাধারণী' (১১ কার্তিক ১২৮০), 'প্রতিধ্বনি' (৭ আশ্বিন ১২৮১), প্রভৃতির কথা সকলের আগে মনে আসে। বাঙালীর নব জাগৃতির এ গুলি হ'ল এক কথায় ধারক ও বাহক। স্বাধীনতার ইতিহাসে এদের নাম উল্লেখ না করলে ইতিবৃত্ত অপূর্ণ

থেকে যায়। পত্র পত্রিকার মধ্যে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ক্রমে এদের আদর্শ স্থল হয়ে দাঁড়ায়। সংবাদপত্রে যেমন এই দশকের সাময়িক পত্রেও তেমনি (মাসিক পাক্ষিক ইত্যাদি) নবজাগৃতির মূল সূত্রগুলিও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এই ধরণের পত্রিকাগুলির যথাক্রমে 'বঙ্গ দর্শন' (বৈশাখ ১২৭৯), 'মধ্যস্থ' (অগ্রহায়ণ, ১২৮০), 'আর্য্যদর্শন' (বৈশাখ ১২৮১), 'ভারত শ্রমজীবী' (বৈশাখ ১২৮১), 'বান্ধব' [ঢাকা] (আষাঢ় ১২৮১), 'সমদর্শী' (অগ্রহায়ণ ১২৮১), 'ভারতী' (শ্রাবণ ১২৮৪), প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন' ছিল এ সমূহের শীর্ষ স্থানে। 'বঙ্গ দর্শনের' আদর্শ এই দশকের শেষ দিকে প্রকাশিত 'ভারতীতে' অনেকটা পরিগৃহীত হয়। সাময়িক সাহিত্যে 'বঙ্গ দর্শন' যুগান্তর আনয়ন করে। 'বঙ্গ দর্শন' প্রকাশ থেকেই এর মুকুরে আমরা যেন নিজেদের পরিষ্কার দেখতে থাকি। আমরা কতখানি জ্ঞান বিজ্ঞানের শক্তির অধিকারী তাও এ থেকে জানতে ও বুঝতে সক্ষম হই। বিদ্যার প্রায় সব বিভাগের আলোচনা 'বঙ্গ দর্শনের' পৃষ্ঠায় স্থান পায়। বাঙলা সাহিত্য (প্রাচীন ও আধুনিক), সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য), ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, জাতিতত্ত্ব, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি কত বিষয়েই তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক আলোচনা এতে আরম্ভ হয়। আমাদের উন্নতি চিন্তায় মনীষীরা তখন কিরূপ অগ্রসর হয়েছিলেন তা বলে শেষ করা যায় না।

এইরূপে পত্রিকার পৃষ্ঠায় আমাদের প্রাণের কথা, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা পরিষ্কার বিধৃত হয়। এ থেকে জাতীয়তার তথা জাতীয় উন্নতির মূল মন্ত্রগুলি আমাদের কর্ণে অনুরণিত হতে লাগল। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি থেকে এ কথার যাথার্থ্য বুঝতে পারবেন।

রাজনারায়ণ বসু প্রদত্ত 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭২, ১৫ সেপ্টেম্বর) শীর্ষক বক্তৃতা পুস্তক আকারে গ্রথিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র এর উপরে আলোচনা প্রসঙ্গে শেষ দিকে যে উক্তি করেন তা আমাদের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বক্তৃতাটি রাজনারায়ণ বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত—'মিলে সবে ভারত সন্তান' দিয়ে শেষ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন: "রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে

বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!" (বঙ্গ দর্শন, চৈত্র ১২৭৯)।

জাতীয় উন্নতির পক্ষে বিজ্ঞান (বিশুদ্ধ এবং ফলিত) ঐ সময়েই উন্নত জাতি-গুলির কত সহায় হয় মনীষীদের কেহ কেহ তা দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পান। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা* প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। বিজ্ঞান সভা স্থাপনের প্রস্তাবনা মহেন্দ্রলাল প্রথমে তৎ-সম্পাদিত 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্ণাল' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। একটি অনুষ্ঠান পত্রে সভার উদ্দেশ্য নিয়মাবলী এবং শিক্ষণীয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম বিবৃত হয় (১৮৬৯)। এ প্রস্তাবনা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই মহেন্দ্রলালের এ সাধু অভিপ্রায়টি বঙ্গের জ্ঞানী গুণী ধনী মানী—জাতির উন্নতি-প্রয়াসী প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এবং তারা অর্থ দিয়ে পরামর্শ দিয়ে এর প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করলেন। ডাঃ সরকার বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে ১৮৭৬, ২৯ জুলাই বিজ্ঞান সভার দ্বার উন্মোচনে সমর্থ হন। 'বঙ্গ দর্শন' প্রকাশের মাস পাঁচেকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে একটি নিবন্ধ লেখেন। বিজ্ঞানে উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে কি বিষম পার্থক্য তার উল্লেখ করে তিনি আমাদের বিজ্ঞান অনুশীলনে অভিনিবিষ্ট হতে আবেগভরে উপদেশ দেন। তাঁর উক্তি বর্তমান স্বাধীনতার পরিবেশেও যে কতখানি সার্থক তা আমরা সকলেই বুঝতে পারছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সারগর্ভ উক্তির কিয়দংশ এই: বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু। বিজ্ঞান মহায়সশকট বাহনে, তড়িৎ তার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রসূ ভারত ভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশই নির্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন

* ইংরেজি নাম—Indian Association for the cultivation of science.

দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।" (ভাদ্র, ১২৭৯)।

ভারতবর্ষ তখন সত্যসত্যই একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালায় রূপান্তরিত। অবাধ বাণিজ্য নীতির দরুন ভারতবর্ষের শিল্প-সম্পদ বিলুপ্তপ্রায়, ভারতবর্ষ একটি বিরাট কৃষিক্ষেত্রে পরিণত। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলী বিজ্ঞান রহস্য পুস্তকে গ্রথিত রয়েছে। এ সমুদয় অনুসন্ধিৎসু জনের অবশ্য পাঠ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' কমলাকান্ত মারফত বাঙালীকে স্বদেশপ্রেম মন্ত্রে দীক্ষা দিতে অগ্রণী হলেন। আমার দুর্গোৎসব নিবন্ধে কমলাকান্তের মুখ দিয়ে মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে তিনি বলান:

"চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোতে পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ প্রহারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি এই কাল-স্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা।...

"এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি।" (বঙ্কিম রচনাবলী: সাহিত্য সংসদ, সং। পৃ ২২-২৩)।

বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তির মধ্যে আশার বাণীও আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্"-ও এই সময়ের রচনা। সঙ্গীতটি পরবর্তী দশকে আনন্দ মঠে সর্বপ্রথম সন্নিবেশিত হয়। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বন্দেমাতরম্‌ই ছিল ভারতবর্ষের একমাত্র জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গেও বিশেষ পরিচিত

ছিলেন। অগাস্ট কোঁৎ-এর "Humanity-পূজা" বা মানব-কল্যাণ-বাদ, যাকে আমরা সচরাচর হিতবাদও বলে থাকি—বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। জন স্টুয়ার্ট মিল বিশ্লেষণ করে একে নবযুগের দর্শন বলে আখ্যাত করেন। কোঁৎ উদ্ভাবিত ও মিল ব্যাখ্যাত মতবাদই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের "বাঙ্গালার কৃষক" ও সমজাতীয় রচনা সমূহের প্রেরণা স্থল।

মানুষের কল্যাণ চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের সকল কাজই নিয়ন্ত্রিত করেছে। একদা জনৈক অধ্যাপক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন বঙ্কিমচন্দ্র কার্ল মার্কসের (১৮১৮—১৮৮৬) প্রায় সমকালীন রচনা সমূহের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কি না। এই রচনাগুলির মধ্যে মার্কসীয় দর্শন—শ্রেণীবিহীন সমাজের কথা সন্নিবেশিত রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' নিবন্ধটিই অধ্যাপকের মনে হয়ত এই জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে। বিড়ালের সকল বিষয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এমন যুক্তিসহ বর্ণনা বাঙলা সাহিত্যে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। মার্কস কথিত শ্রেণী-বিহীন সমাজের নির্দেশও এতে মিলবে হয়ত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে 'হিতবাদ' বা Humanity-পূজা যেমন ওতপ্রোত ভাবে বিধৃত, উক্ত মতবাদ অন্য কোন রচনার মধ্যে পাই না। তখন এই নূতন দর্শনের সবে আবির্ভাব হয়। বঙ্কিম এই মতবাদের সঙ্গে পরিচিত যে ছিলেন না তেমন কিছু হলপ করে বলা যায় না। পরে তিনি এর অনুসরণ করা সমীচীন বোধ করেন নি। আবার আর একটি কথাও বলা যায়। তখনকার দিনের এই নূতন ভাবনা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পাওয়া বিচিত্র নয়। কার্ল মার্কসের নিকট থেকে যে এটি ধার করা তা কিরূপে জোর করে বলা যায়?

বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, সে সময় তাঁর যৌবন উন্মেষে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তৎ প্রচারিত তত্ত্বগুলি তাঁরা তখন বুঝতে পারেন নি। তিনি পরে লিখেছেন, এই তত্ত্ব সমূহই আমাদের জাতীয়তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে এ সময়েই স্থাপন করে। ইংরেজ ও ভারতীয়ের মধ্যে জাতি বৈরিতার বিকট রূপ দেখে অনেকেই তখন আতঙ্কিত হন। জাতি বৈরিতার প্রশমন কল্পে কেশবচন্দ্র সেন এই দশকের মাঝামাঝি নাগাদ নানারূপ উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকেন। কিন্তু এ যে নির্বাধ স্রোত। এবং জাতির উন্নতির পক্ষে এর সার্থকতা বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৩ সনের

শেষেই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

"যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধে থাকিবে, যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই। এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতি-বৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতি-বৈর আছে ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈর ভাবের কারণই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত উপহসিত হইলে যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে তত দূর করিব না—কেননা সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।" "(সাধারণী, ১১ কার্তিক ১২৮০। দ্র. বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সং)।

একদিকে পত্র পত্রিকার রচনা অপর দিকে সভা সমাবেশের প্রাণ মাতানো বক্তৃতা—এ দুটির দ্বারাই তখনকার যুবশক্তি বিশেষ অনুপ্রাণনা লাভ করে। প্রথমটির কথা আমরা এতক্ষণে জানতে পেরেছি। দ্বিতীয়টির বিষয়ও খানিকটা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কলকাতায় একটি সাধারণগম্য কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন চলে এই দশকের গোড়া থেকেই। কিন্তু উক্ত দ্বিবিধ প্রচেষ্টার ফলেই এইরূপ প্রতিষ্ঠান এই দশকের মাঝামাঝি গঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। আসুন, এই দিকে এখন আমাদের দৃষ্টি ফিরাই। এখানে প্রথমে একটি কথা বলে রাখি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাত থেকে ফিরবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজে অধ্যাপক পদে বৃত হন। এই সময় থেকেই ছাত্র তথা যুবক সম্প্রদায়ের তিনি সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন। কিছু পরেই তাঁর প্রচেষ্টাও আমরা জানতে পারব বিশেষ ভাবে।

ইণ্ডিয়ান লীগ ঃ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভার প্রস্তুতি পর্ব

কলকাতা ব্রিটিশের শাসন কেন্দ্র। ভারতবর্ষের দিগদিগন্তে এই কেন্দ্রস্থল থেকেই সরকার সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতেন। আবার বেসরকারী যাবতীয় হিতকর্মের সূচনা প্রায়ই হতে দেখি এখান থেকে। কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং বেসরকারী সকল কার্যই এর মধ্যে পড়ে। ভারতবর্ষে সার্বিক অখণ্ডত্ব-ভাবনা সমাজ নেতৃবর্গের চিত্তে দৃঢ়মূল হয় এ সময়ে বিশেষ করে। নিখিল ভারতীয় এবং স্থানীয় সমস্যাদি নিয়ে ভারতবর্ষীয় সভার কার্যকলাপ আমরা দেখেছি। ক্রমে নব্য-শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সাধারণগম্য কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এবিষয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং তৎ সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ অগ্রণী হয়েছিলেন। আর এই ভাবনাকে বাস্তবরূপ দিতে তাঁর মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষ বিশেষ সহায় হন। এ বিষয়টি এখানে আমরা আগেই বলে নি'।

শিশির কুমার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় সভা কর্তৃক আয়োজিত উচ্চ শিক্ষা নিরোধক সরকারী প্রস্তাবের প্রতিবাদের সাফল্য দেখে তখনই এই সভাকে একটি ব্যাপকতর ভিত্তির উপর স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। অল্পবিত্ত শিক্ষিত সমাজ—যাকে আমরা মধ্যবিত্ত বলতে পারি—এর সঙ্গে যুক্ত হলে সভা অধিকতর শক্তিমান হবে আর এর দ্বারা দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে আশাতীত। এই উদ্দেশ্যে পত্রিকার মাধ্যমে শিশিরকুমার প্রস্তাব করলেন যে, ভারতবর্ষীয় সভার প্রতিটি সভ্যের বার্ষিক চাঁদা ৫০ টাকা হতে কমিয়ে ৫ টাকা করা হোক। এই প্রস্তাব নিয়ে শিক্ষিত সাধারণ ও সভার নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশ আলোচনা চলে। শেষে কর্তৃপক্ষ ১৮৭৩ সন নাগাদ ভারতবর্ষীয় সভার এক অধিবেশনে শিশিরকুমারের এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে অগ্রাহ্য করলেন। ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রস্তাবের সমর্থনে নানা জায়গায় রাজনৈতিক সভা সমিতি স্থাপিত হতে থাকে। পত্রিকার পক্ষে হেমন্তকুমার ঘোষ বিভিন্ন

স্থলে গমন করেন। সমাজ-হিত কল্পে এবং সরকারী অবিচার ও অনাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলা শহরেই যে এরূপ সংঘবদ্ধ উদ্যোগ হওয়া দরকার তার প্রতিও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অবহিত হন। পত্রিকার সঙ্গে জন সংযোগ কয়েকটি কারণে আরও বিশেষ করে ঘটেছিল।

যেখানেই কোনরূপ বিপদ বা বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হত সেখানেই লোক পাঠিয়ে সংবাদ সরবরাহ করতেন পত্রিকা। পাবনার 'প্রজা-বিদ্রোহ', রাঢ়, উত্তর বঙ্গ এবং পূর্ব বিহারের দুর্ভিক্ষ (১৮৭৩-৭৪), চা শ্রমিদের উপর চা-করদের অকথ্য অনাচার, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে বিচার বিভ্রাট, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (জেলা ও মহকুমা হাকিম এবং পুলিশ) দুষ্কার্য প্রভৃতি প্রতিটি ব্যাপারেই পত্রিকা অগ্রণী হয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণাদি সহ যথাযথ প্রকাশ করতেন। এই সব কারণে সাধারণ মানুষের নিকট পত্রিকাখানি বিশেষ আদরণীয় হয়ে ওঠে। শুধু লেখার ভিতর দিয়েই নয় প্রতিনিধি পাঠিয়ে রাজনৈতিক সভা স্থাপনে জেলা শহরগুলিতে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠায়ও—শিশিরকুমার সহায়তা করতে লাগলেন। হেমন্তকুমার ঘোষ ছিলেন এদের মধ্যে প্রধান। ১৮৭৫ সনের পূর্বেই দেখা গেল বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, যশোহর, খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, হুগলী, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে রাজনৈতিক সভা সমিতি সংগঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও এই ধরনের সভা স্থাপনে অগ্রণী হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি সভার কথা উল্লেখ করব। রাজশাহী এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন জনহিতব্রতী রাজচন্দ্র সরকার। রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদে তাঁর হিতকর্ম সেকালে ছিল সুবিদিত। রাজচন্দ্র সরকার আচার্য যদুনাথ সরকারের পিতা। শিশিরকুমার বিভিন্ন জেলার এই সভাগুলিকে সুসংহত ও সুপরিচালিত করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্রতী হন। ভারতবর্ষীয় সভায় ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সদস্য হতে সক্ষম। কিন্তু এ সময় প্রস্তাবিত সংগঠনকে সাধারণগম্য করার উদ্দেশ্যে বার্ষিক চাঁদা মাত্র পাঁচ টাকা ধার্য হয়। এই হেতু শিক্ষিত অল্পবিত্ত লোকেরাও এর সভ্য হতে অধিকতর আগ্রহী হলেন।

এখানে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলা দরকার। দীর্ঘ পঁচিশ

বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষীয় সভা স্বদেশের উন্নতি কল্পে বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন। এদেশে ও বিদেশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আবেদন, চিঠিপত্র ও স্মারকলিপি পাঠানো ছিল এই উপায়গুলির মধ্যে প্রধান। পার্লামেণ্টের বিরোধী পক্ষের মর্যাদাও সভা কর্তৃপক্ষ খানিকটা পান। কিন্তু ক্রমে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সরকারের মতিগতি ভারতবাসীদের উপর বড়ই বিরূপ হয়ে পড়ে। তাঁরা প্রশাসনে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তার অধিকাংশই দেখা গেল ভারতের জনস্বার্থ বিরোধী। এইরূপে সংঘাত বিষম আকার ধারণ করল। এ সময় থেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝতে পারলেন শুধু আবেদন বা স্মারকলিপি পাঠিয়েই কাজ সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। মিলিত হয়ে কার্য না করলে এই সকল প্রতিবাদ গ্রাহ্য হবে না। জন সংযোগ কী রূপে সম্ভব? উপরে যেমন বলেছি, বিভিন্ন অঞ্চলের জন-সাধারণের মধ্যে যোগ স্থাপন ও রক্ষার জন্য ভারতবর্ষীয় সভাকে সাধারণগম্য করা আবশ্যক। এ প্রস্তাবে সভা কর্তৃপক্ষ সম্মত না হওয়ায় অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার দিকে ঝুকলেন শিশিরকুমার প্রমুখ প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ। তাঁরা দেখলেন সরকারকে দিয়ে কোন কিছু গ্রাহ্য করাতে হলে পেছনে চাই 'স্যাঙ্‌শান' বা জনমত। এজন্য বিভিন্ন জেলায় ঐরূপ রাষ্ট্রীয় সভা সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ চলে অতঃপর। শিশিরকুমার পত্রিকা মারফত স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে যেমন এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণা দেন তেমনি বিভিন্ন উপায়ে এই ধরনের সংগঠনেও সাহায্য করেন, একটু পূর্বেই আমরা তা দেখেছি। এই দিক দিয়ে সাধারণগম্য কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সভা স্থাপনের সার্থকতা। ভারতবর্ষীয় সভার দ্বারা এ কার্য সম্ভবপর ছিল না। প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা এ অভাব পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল। কেননা জনমত বিজ্ঞাপক বিভিন্ন জেলা সভাগুলি রাষ্ট্রীয় সভা সমিতির মূলাধার।

শিশিরকুমারের কথা এখানে একটু বেশী করে কেন বলছি তা পাঠকবর্গ বুঝতে পারছেন। কিন্তু এই সময় কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের সুযোগও ঘটে। শিশির কুমারের বন্ধু 'অমৃতবাজার পত্রিকার' লেখক আনন্দমোহন বসু ইতিপূর্বে, ১৮৭৪ অক্টোবর মাসে বিলাত থেকে স্বদেশে ফিরেছেন। ঐ সময়কার শুধু পত্রিকায়ই নয়, অন্যান্য সংবাদপত্রেও আনন্দ-

মোহনের গুণপনার কথা প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি ভারতবর্ষের প্রথম র‍্যাংলার। বিলাতস্থ সভাসমিতিতে ভারতবর্ষের কল্যাণমূলক বক্তৃতাদির দ্বারা তিনি স্বদেশবাসীর নিকট সুপরিচিত ও প্রশংসিত হয়েছিলেন। তাঁর আগমনে শিশিরকুমার কেন্দ্রীয় সভা প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে একজন বিশেষ সহায়ক পেলেন। বিলাতে অবস্থান কালে আনন্দমোহন গণতন্ত্র ভিত্তিক শাসনের মূলে কি শক্তি রয়েছে তা বিশেষভাবে অবগত হন। কাজেই কলকাতায় এরূপ প্রতিনিধি মূলক সভা প্রতিষ্ঠায় তিনি যে শিশিরকুমার ও সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে ঐকান্তিক ভাবে যোগ দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

কলিকাতায় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে এই সময় শিশির-কুমার ও আনন্দমোহনের সঙ্গে আরও যাঁরা আলাপ আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও এখানে উল্লেখ করা দরকার। ভাবী সভার নামকরণ করা হ'ল ইণ্ডিয়ান লীগ। 'ইণ্ডিয়ান' বা ভারতীয় কথাটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আমরা আগে একাধিকবার আলোচনা করেছি। কলকাতায় স্থাপিত হলেও এর আদর্শ ছিল নিখিল ভারতীয়। তবে ভারতবর্ষীয় সভার মত স্থানীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে বেশী করে আলোচনা চলতো এখানেও। শিশিরকুমার আনন্দমোহন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও সলাপরামর্শের পর ১৮৭৫, আগস্ট নাগাদ ইণ্ডিয়ান লীগের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ধার্য হয়। 'সাধারণী' ১৫ আগস্ট ১৮৭৫ থেকে এগুলি উদ্ধৃত হ'ল:

"১। কি করিলে সর্বসাধারণের রাজকীয় ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সকলের মত সংগ্রহ ও প্রচার করণ।

২। সাধারণের ইষ্টসাধন ও তাহাদের যাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মে তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ ও তৎসমুদায় প্রতিষ্ঠা করণ।

৩। বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত ন্যায়সঙ্গত উপায় নির্ধারিত ও তৎসমুদায় অবলম্বন করণ।

৪। সর্বসাধারণের মনে যাহাতে একজাতিত্ব ভাবের উদয় হয় তন্নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করণ।

৫। "দেশের অর্থোৎপাদিকা শক্তি যাহাতে সম্যক স্ফূর্তি লাভ করে তাহার উপায় অবলম্বন করণ।"

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তায় বেশ সময় যেতে লাগল। লীগের প্রধান উদ্যোক্তা শিশিরকুমার কালক্ষেপ করা আর সমীচীন বোধ করলেন না। তিনি ১৮৭৫, ২৫ সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপন করলেন। এ সময় কিন্তু লীগের অন্যতম উদ্যোক্তা আনন্দমোহন কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে রত। তাঁর জন্য অপেক্ষা না করেই সভা প্রতিষ্ঠার দরুন তখন সংবাদপত্রে বেশ বিতর্ক উপস্থিত হয়। 'প্রতিধ্বনি', 'সাধারণী' প্রভৃতি পত্র এতে যোগ দেন। শিশিরকুমার কিন্তু নিজ সমর্থনে *Coup de etat* বলে এ ঘটনাকে উল্লেখ করেন। এর মানে হ'ল—প্রচলিত বিধি নিয়ম স্থগিত রেখে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাড়াতাড়ি কিছু করা। অবশ্য আনন্দ মোহন কলকাতা ফিরেই শিশিরকুমারের সঙ্গে লীগ পরিচালনায় মনে প্রাণে যোগ দিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগের সভাপতি হলেন 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' সম্পাদক সুবিখ্যাত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, হাইকোর্টের উকিল *কালীমোহন দাশ এবং সহকারী সম্পাদক শিশিরকুমার স্বয়ং। তিনি অন্তরালে থেকেই লীগের কার্য নিয়ন্ত্রিত করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে নবগোপাল মিত্রের নাম আমরা স্মরণ করি। হিন্দু মেলার প্রধানতম উদ্যোক্তা হলেও নবগোপাল ছিলেন এর সহকারী সম্পাদক মাত্র। এই সময়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে লীগের কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। এদের মধ্যে ছিলেন কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ, রেভা: কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, দুর্গামোহন দাশ, নরেন্দ্রনাথ সেন, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীন ও নবীন ব্যক্তিবর্গ।

প্রতিষ্ঠার পরেই লীগ বিভিন্ন কার্যে হাত দিলেন। লীগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য সাধারণের মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করা। সহর ও মফস্বলে প্রশাসনিক অপকর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং গঠন মূলক নানা প্রচেষ্টার সূচনা, লীগের এই প্রধান দুটি উদ্দেশ্যের দিকে কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে

কালীমোহন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠতাত।

মনঃসংযোগ করেন। কিন্তু বেশী দিন যেতে না যেতেই লীগ পরিচালনা ব্যাপারে সভাপতি এবং সভ্যদের মতদ্বৈধ দেখা দেয়। লীগ একটি গণতন্ত্র মূলক প্রতিষ্ঠান। সভ্যেরা গণতন্ত্রে আস্থাবান। কাজেই উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে বৈষম্য তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে উঠল। তাঁরা অনেকে একে একে লীগের সংস্রব ত্যাগ করলেন। সভাপতি শম্ভুচন্দ্রও ১৮৭৬, জানুয়ারি মাসে পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে সভাপতি পদে বৃত হলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষ্ণমোহন যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু আজীবন স্বদেশীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও দর্শন ইতিহাসের আলোচনায় গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। গবেষণার মৌলিকতা ও ব্যাপকতা দৃষ্টে সুধী সমাজ তাঁকে একজন প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যে তিনজন প্রাচ্য বিদ্যাবিদকে অনরারি ডক্টর অব ল' উপাধির দ্বারা সম্মানিত করেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন একজন। অপর দুইজন ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মনিয়র উইলিয়মস্। স্বদেশপ্রেম ডিরোজিও শিষ্য কৃষ্ণমোহনের অস্থি-মজ্জাগত। তিনি ঐ সময়কার প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে অবিলম্বে যুক্ত হন। এবং সাধারণের পক্ষে প্রতিটি হিতকর্মে যুবকের মত উৎসাহ দেখান। এখানে আর একটি কথা বলে রাখি, প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন রাজনীতিজ্ঞ, ভারতবর্ষীয় সভার এক প্রধান স্তম্ভ। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা কালে (১৮৮৫) রাজেন্দ্রলাল ছিলেন ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি। সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে এই মর্মে লিখলেন যে, বার্ধক্যেও কৃষ্ণমোহন স্বদেশের উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। যুবকের মত কর্মশক্তি তখন না থাকলেও প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল যুবজনোচিত। লীগ কৃষ্ণমোহনকে সভাপতিরূপে পেয়ে বিবিধ বাধার মধ্যেও স্বদেশ কল্যাণকর কর্ম সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই ধরনের দুইটি প্রধান কার্যের কথা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি হ'ল এলবার্ট টেম্পল অব সায়ান্স প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬ সনের প্রথমেই। এটি ছিল একটি শিল্প বিদ্যালয়। ব্যবহারিক বা কারিগরি বিদ্যা, যাকে আমরা বর্তমানে

প্রযুক্তি বিদ্যা বলি—তারই শিক্ষার আয়োজন করা ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য। পরে অবশ্য চারুকলা শিক্ষাদানও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। লীগের পক্ষে শিশিরকুমার ছিলেন এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী। সভাপতি কৃষ্ণমোহন বিদ্যালয়ের জন্য খুবই শ্রম স্বীকার করেন। এই সনের প্রথম দিকে মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা স্থাপন ত্বরান্বিত করার জন্য চাঁদাদাতাদের নিয়ে একাধিক সভা হতে দেখি। এই সকল সভায় কৃষ্ণমোহন উপস্থিত থেকে নিজের বিদ্যালয়টিই যে উক্তসভার প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট তার অনুকূলে বক্তৃতা দেন। শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রলাল ১৮৭৬, ২৯শে জুলাই ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পূর্বোক্ত বিদ্যালয় দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিজ প্রয়োজন সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেই নূতন ট্রাস্ট ডীড্ করে একে একটি চারুশিল্প বিদ্যালয়ে মাত্র পরিণত করা হয়। এখনও এটি রবীন্দ্র কাননের (পূর্বতন বিডন স্কোয়ার) সন্নিকটে অবস্থিত।

আজিকার পাঠকের নামটি সম্বন্ধে কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এলবার্ট ১৮৭৫ সনে ভারত পর্যটনে আসেন। তাঁর নামের সঙ্গে লীগ এই বিদ্যামন্দিরটির নাম যুক্ত করে নেন। দেখি ১৮৭৬ সনের এপ্রিল মাসে বঙ্গের ছোটলাট স্যার রীচার্ড টেম্পল এ বিদ্যালয়টির জন্য সরকারী কোষাগার থেকে বার্ষিক আট হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত এলবার্ট স্কুল (ও পরে এলবার্ট কলেজ) এবং এলবার্ট ইনষ্টিটিউশান যা পরে এলবার্ট হল নামে সুপরিচিত হয়েছিল—এ সমুদয়েরও নামের সঙ্গে এই এলবার্ট নামটি সংযোজিত করা হয়েছিল।

ইণ্ডিয়ান লীগের অপর কার্য—কলকাতা পৌরসভায় নির্বাচন প্রথার সমর্থনে আত্যন্তিক প্রযত্ন। পৌরসভায় নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের দ্বারা এ দেশে সর্বপ্রথম গণতন্ত্র মূলক সংস্কার সূচনা হয়। শিশিরকুমার বরাবর নিজ পত্রিকায় গণতন্ত্র ভিত্তিক অর্থাৎ প্রতিনিধি মূলক শাসন ব্যবস্থার অনুকূলে স্পষ্ট ভাষায় লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। কলকাতা পৌরসভায় যখন এই প্রথা প্রবর্তনের কথা হ'ল তখন তিনি এবং লীগ এর সপক্ষে নিজ নিজ মত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন না, জনমত গঠনের জন্য আন্দোলনও উপস্থিত করলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা কিন্তু উক্ত প্রস্তাবের সংশোধনীরূপে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের মনোনীত সদস্য নিয়েই পৌরসভা গঠনের জন্য নূতন প্রস্তাব করেন। সভার মতে পৌরসভার সদস্য হবেন একশত জন এবং প্রতিবৎসর সংখ্যা ঠিক রেখে দশজন করে নূতন সদস্য মনোনীত হবেন। এতে কিন্তু সাধারণ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ ছিল। নির্দিষ্ট মানভিত্তিক সাধারণ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন কল্লে লীগের অভিমতই বহাল রইল। ১৮৭৬, ২৫শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নূতন পৌরসভা আইন পাস হয়ে গেল। এতে স্থির হ'ল পৌরসভার সদস্য থাকবেন মোট ৭২ জন। এর দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪৮ জন হবেন করদাতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শিশিরকুমারের উপর ভারতবর্ষীয় সভার কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই রুষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল মতবাদ সভ্যগণ আদৌ পছন্দ করতেন না। এবারে তাদের রোষ শিশিরকুমার তথা ইণ্ডিয়ান লীগের উপর পুরোপুরি বর্ষিত হ'ল। তাই দেখা যায় ইণ্ডিয়ান লীগ বর্জন করে যারা পরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সভা-নেতৃবৃন্দ তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন, প্রতিষ্ঠা সভায়ও কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভারত সভার বিপ্লবাত্মক কর্মপদ্ধতির সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবৃন্দের কোন রকম যোগই ছিল না। বরং তাঁদের কার্যকলাপ এই সভার উদ্দেশ্য-পরিপন্থীই ছিল অনেকখানি। এ সব কারণে বুঝা যায় শিশিরকুমারের উপর রুষ্ট মনোভাবই সভ্যদের এর সাহায্য দানে বেশী করে প্ররোচিত করে। এখানে বলা দরকার যে, ইণ্ডিয়ান লীগের সভাপতি পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম নির্বাচনেই কলকাতা পৌরসভার সদস্য হয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় সভার মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পৌরসভা প্রসঙ্গে কৃষ্ণমোহনের প্রতি হোরি হেডেড পাদ্রী অথবা গ্রে হেয়ারড পাদ্রী (পক্ক কেশ পাদ্রী) এই রকম বিদ্রূপাত্মক উক্তি করতেও ছাড়েন নি।

ইণ্ডিয়ান লীগের কথা বলতে গিয়ে স্বতঃই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভার উল্লেখ করতে হ'ল। যে বিপ্লবাত্মক বা বৈপ্লবিক উন্মাদনার দ্বারা যুবশক্তি তখন উদ্বেলিত হয়েছিল তাকে একটি নিয়মানুগ সংস্থার মাধ্যমে দেশমাতৃকার সেবায় পরিচালিত করাও তখন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন সিদ্ধির বশেই ভারত সভার জন্ম। ইণ্ডিয়ান লীগ অল্পকালের মধ্যেই

এই সভায় অঙ্গীভূত হয়ে যায়।··তথাপি বৎসরাধিক কাল যাবৎ লীগ দেশের কল্যাণ সাধনে যে কিরূপ তৎপর হয়েছিলেন দুইটি ব্যাপারের উল্লেখে তা পাঠকের ইতিমধ্যেই অধিগম্য হয়েছে বলে মনে হয়। বিবিধ বিষয়ে লীগের সার্থক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৮৭৬, ২১শে সেপ্টেম্বর এই বিবরণ দেন।

"···এ দেশবাসীদিগের হৃদয়ে রাজনৈতিক উন্নতির স্পৃহা উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত লীগ অনুষ্ঠিত হয় এবং এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় লীগের আশা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে।······ইহার যত্নে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশান কার্যটি সমাধা হইয়াছে।···লীগের দ্বারা আরও কয়েকটি উপকার হইয়াছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশন ক্রমে নির্জীব হইয়াছে।···লীগ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশনকে এই নির্জীব অবস্থা হইতে কিয়ৎপরিমাণে জাগরিত করিয়াছেন। যদিও কলিকাতার ইলেকটীব প্রথা লইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশন পরাস্ত হন, যদিও এই সদনুষ্ঠানের প্রতি বাধা দিয়া তাহারাও স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান করেন তথাচ ইহার নিমিত্ত তাহারা এরূপ উদ্যোগ ও পরিশ্রম করেন যে, অনেকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন।···ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা যে এত শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারও মূল লীগ। লীগের অনুষ্ঠিত কলেজ দ্বারা মহেন্দ্রবাবু বিশেষ উদ্যোগী হন। মহেন্দ্রবাবু বিজ্ঞান সভার নিমিত্ত গত ছয় বৎসর অবধি ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ইহার নিমিত্ত যে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, আপনার অনেক সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করিলে মহাপাপ হইবে। তবে লীগের কলেজের অনুষ্ঠান না হইলে এত শীঘ্র তাহার সভা প্রতিষ্ঠিত বোধ হয় হইত না। এতদ্ভিন্ন লীগ কর্তৃক এদেশের মধ্যে যে রাজনীতি সম্বন্ধীয় একটি ঘোর আন্দোলন হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কলিকাতায় যে ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশন হইয়াছে, এ লীগের ছায়া। এটি লীগের অবিকল নকল। যদি লীগের সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পর মনোবাদ না হইত তাহা হইলে বোধ হয় ইহার সৃষ্টি হইত না। যদি ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য দেশের মঙ্গল করা হয় তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে কালে লীগ একত্রিত হইবে।···লীগ শুদ্ধ

এদেশীয়দিগের মধ্যে এই আন্দোলন উত্থিত করে নাই, এ দেশীয় ফিরিঙ্গিদিগের মধ্যে এইরূপ অনুষ্ঠান হইতেছে।"

পত্রিকার আশা ফলবতী হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ দেশের পক্ষে এতই মঙ্গলজনক হয় যে, এর ভিতরে লীগ অনতিকাল মধ্যে লীন হয়ে যায়। দেখি সভাপতি কৃষ্ণমোহন ১৮৭৮ জানুয়ারি নাগাদই ভারত সভার সভাপতি পদে যুক্ত হয়েছেন। লীগের অন্যতম প্রধান কর্মী শিশিরকুমার অনুজ মতিলাল ঘোষও পরে ভারত সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। এখন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতসভার কথা বলতে হবে। কিন্তু এর পূর্বে আর একটি বিষয়েও খানিকটা বিশদভাবে বলা দরকার। দেশের যুব শক্তি আত্মনির্ভর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এসময়ে। ভাবী এসোসিয়েশনের এ যে কতখানি বল সঞ্চার করে তা বলে শেষ করা যায় না। এই যুব শক্তির উদ্বোধনকে আমরা ভারতসভার প্রস্তুতিপর্ব বলে উল্লেখ করতে পারি।

২

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা আনন্দমোহনের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়া স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন বা ছাত্র সভারই পরিণতি। ইণ্ডিয়ান লীগ এবং ভারতসভার পারস্পরিক যোগাযোগের কথা স্বীকার করেও ঐ উক্তির যাথার্থ্য অনেকটা আমরা বুঝতে পারি। আনন্দমোহন ১৮৭৪, ১২ই অক্টোবর প্রায় পাঁচ বৎসর বিলাত প্রবাসের পরে স্বদেশে ফিরলেন। ফেরার পথে পুণার ছাত্র সভার দ্বারা তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। কয়েক মাস পরে আনন্দমোহন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন বা ছাত্র সভা স্থাপন করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং অধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বক্তৃতারও ব্যবস্থা করেন। সভার সম্পাদক ছিলেন ঐ কলেজেরই ছাত্র নন্দকিশোর বসু। ছাত্রসভার মাধ্যমে ছাত্র তথা যুব সমাজের চিত্তে কিরূপ আলোড়ন উপস্থিত হয় সেই কথাই আগে কিছু বলব।

আনন্দমোহনের পূর্ব পরিচিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৫, জুন মাসে

বিলাত থেকে বিফল মনোরথ হয়ে কলকাতায় এলেন এবং পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগর তাঁকে নিজ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করলেন, এ কথা পূর্বেই আমরা জেনেছি। আনন্দমোহনের এই ছাত্রসভার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটল কয়েক মাসের মধ্যেই। তাঁর বাগ্মীতা, বিশ্লেষণ নৈপুন্য, সর্বোপরি স্বদেশপ্রেম যুবচিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। তখনকার কিশোর ও যুবকগণ সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন কেহ কেহ স্পষ্ট ভাষায় তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। এই সব যুবকদের পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত কয়েকজনের নাম প্রথমে উল্লেখ করি। এদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়), নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), প্রভৃতি। ব্রহ্মবান্ধব কৈশোরে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় কিরূপ অনুপ্রাণনা লাভ করেন, 'আমার ভারত উদ্ধার' পুস্তকে তার সাক্ষ্য মিলবে। স্বদেশের স্বাধীনতালাভের জন্য যুবচিত্ত উদ্বেলিত। ঐ বয়সেই ব্রহ্মবান্ধব উক্ত উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার জন্য দু-দু'বার গোয়ালিয়রে যান। বিপিনচন্দ্র পাল লেখার মাধ্যমে ঐ সময়কার সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা-বলীর প্রভাবের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র সভার আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত সভায় ক্রমে যে সব বক্তৃতা করেন তার মধ্যে ছিল : শিখ-জাতির অভ্যুদয়, শ্রীচৈতন্যদেব, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, কাভুর, য়ুন ইটালি বা যুব ইটালি, আয়ারল্যাণ্ডে দেশচর্চা প্রভৃতি। বিপিনচন্দ্র যুবচিত্তে এর প্রত্যেকটির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে যা লেখেন তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করি। এ থেকেই তখনকার আলোড়নের কতকটা আঁচ্ পাওয়া যাবে, স্বদেশের ও বিদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যেন তখন প্রাণবন্ত হয়ে আমাদের নিকট সশরীরে উপস্থিত হয় এবং চিত্ত একেবারে হরণ করে নেয়। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় :

"সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই সর্বপ্রথমে আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমক্ষে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই যে সেই জাতির স্বদেশ ভক্তির অবলম্বন ও প্রতিষ্ঠা এই সত্য প্রচার করিলেন।

"এই ছাত্র সভায় সুরেন্দ্রনাথ শিখজাতির অভ্যুদয়—The rise of the Sikh power সম্বন্ধে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাঁহার স্মৃতি—সেই

বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন তাহাদিগের চিত্ত হইতে কখনও লুপ্ত হইবে না। শিখ ধর্মের উৎপত্তি, শিখ খালসার প্রতিষ্ঠা, প্রথমে মোগল এবং পরে ব্রিটিশ প্রভু শক্তির সঙ্গে শিখ খালসার যুদ্ধ বিগ্রহের কথা সেকালের স্কুলপাঠ্য ভারত ইতিহাসের মধ্যেও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমত নহে। কিন্তু সেই সকল পূর্ব পরিচিত ঘটনার অন্তরালে স্বরাষ্ট্র প্রীতির যে শক্তিশালিনী উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল, সুরেন্দ্রনাথের তড়িৎ সঞ্চারিণী বাগ্মী-প্রতিভাই সর্বপ্রথমে আমাদের নিকট তাহা ফুটাইয়া তোলে। সেই হইতেই এ দেশের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসচক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম ও উন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে।" (চরিত কথা : সুরেন্দ্রনাথ পৃ. ৪৭)।

পূর্ব দশকে কেশবচন্দ্র সেন পঞ্জাব ভ্রমণান্তে নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বেথুন সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি, যতদূর মনে হয়, সর্বপ্রথম শিখজাতির ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের নিকট বিবৃত করেন। তখন এ কথাও বলেন যে, নবভারত গঠনে শিখ সমাজের দান হবে অপরিসীম। সুরেন্দ্রনাথ এবারে বক্তৃতার মাধ্যমে জনসমক্ষে শিখদের কীর্তিকলাপের কথা তুলে ধরলেন। নব্য শিক্ষিতেরা এর দ্বারা তখন সবিশেষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতার ফলে যুবচিত্তে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র লিখে গেছেন। তিনি বলেন : "বাবা নানক প্রবর্তিত ধর্মে একদিকে যেমন কোনো প্রকারের কর্মবাহুল্য ছিল না ; অন্যদিকে সেইরূপ গুরুগোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে জাতিবর্ণগত কোনো বৈষম্যও ছিল না। শিখ খালসা বহুল পরিমাণে ইংরাজের পিউরিটান (puritan) সাধারণতন্ত্রের বা commonwealth-এর অনুরূপ ছিল। আর এই জন্যই আমাদের ইংরেজী শিক্ষা ইউরোপীয় সাধনায় অভিভূত চিত্তকে শিখ ইতিহাসের উদ্দীপনাতে এমন প্রবলভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিল।...সুরেন্দ্রনাথের মুখে শিখ ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষু রাজপুতনার কীর্তি কাহিনীর উপরেও গিয়া পড়িল। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে আমাদের নিকটে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এক নূতন প্রাণতার প্রতিষ্ঠা করেন।" (ঐ.)

সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতা শ্রীচৈতন্যদেব স্বদেশবাসীর ভ্রান্ত ধারণাসমূহের শুধু নিরাকরণ করেনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় চৈতন্যদেবের কৃতিত্ব আমাদের সম্মুখে পরিষ্কার করে ধরলেন। বিপিনচন্দ্র বলেন : "চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে এতদিন শিক্ষিত সমাজ নানারূপ কুধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছিল। মহাপ্রভুর ধর্ম ও শিক্ষার প্রতি রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বহু বঙ্গীয় মনীষী কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইহার গুণগান করিতে থাকেন। কিন্তু সমাজের তথাকথিত উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠায় এবং নিম্ন বর্ণের সামাজিক উন্নয়নে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম কতখানি সাফল্য অর্জন করিয়াছিল যে বিষয়ে তখন পর্যন্ত কেহই আলোচনা করেন নাই। সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র সমাজের নিকট এই বিষয়ে যে বক্তৃতা করিলেন তাহাতে মহাপ্রভুর ধর্মের এই দিকটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের দৃষ্টি ইহার দিকে সম্যক্ আকৃষ্ট করিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভিত্তি যেমন তাহারা শিখ খালসার মধ্যে প্রাপ্ত হইল, চৈতন্যদেবের শিক্ষার মধ্যে তাহারা তেমনি প্রথম সামাজিক সাম্যের আদর্শের কথা শুনিতে পাইল।"

স্বদেশের ইতিহাস থেকেও যেমন, বিদেশের থেকেও তেমনি, আমরা নূতন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমসময়ের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথাও সুরেন্দ্রনাথের মুখে শুনলাম। বিপিনচন্দ্র এ সম্বন্ধেও সংক্ষেপে এইরূপ লিখেছেন ; "সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মী প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনির দৈবী প্রতিভা, গ্যারিবল্ডীর স্বদেশ উদ্ধারকল্পে অদ্ভুত কর্মচেষ্টা, যুব ইটালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের ও নব্য আয়ারল্যাণ্ডের (New Ireland) আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্যা, এ সকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ দেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণ কবিকল্পনা ও পৌরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহাই এখন স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যোপেত ও বস্তুগত হইয়া উঠিল।"

যুব জনচিত্তে এই সব বক্তৃতার প্রভাব সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র তাঁর ইংরেজী *আত্মজীবনীতে আরও অনেকে কথা বলেছেন। তার কতকাংশের স্থূল মর্ম এই :

"আমরা অষ্ট্রিয়ার অধীন ইটালিয়ানদের অবস্থা ও ব্রিটিশ আমলে আমাদের নিজেদের অবস্থার মধ্যে বহুলাংশে সমতা দেখতে পেলাম। আমাদেরও মফস্বল অঞ্চলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হলে ভারতীয়েরা কোনরূপ ন্যায়বিচারই পায় না। একই সিবিল সার্বিসের ভারতীয় ও ইউরোপীয় অংশের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য আমাদের হৃদয়ে জ্বালা বাড়িয়ে দিত। আসাম চা বাগানের কুলিদের দুর্দশা তখন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে ব্যক্ত হতে আরম্ভ হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা ম্যাজিস্ট্রেটী জুলুমের কাহিনী প্রায়ই প্রকাশ করতেন। এই সকল ব্যাপারে ম্যাট্‌সিনী পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ আমাদের তিক্ত মনকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেলল। আমরা ম্যাট্‌সিনীর লেখা ও যুব ইটালীর আন্দোলনের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করলাম। আমরা ক্রমে ইটালীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি, বিশেষ 'কার্বোনারি' প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ম্যাট্‌সিনী প্রথমে কার্বোনারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে ইটালীতে যেসব গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তারই নাম এক কথায় কার্বোনারি। কার্বোনারির গুপ্তপদ্ধতি সভ্যদের মধ্যে প্রকারান্তরে ভীরুতারই প্রশ্রয় দিত। এজন্য ম্যাট্‌সিনী এর সম্পর্ক ত্যাগ করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ম্যাট্‌সিনী সম্পর্কীয় বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠায় লেগে গেলাম। কিন্তু তখনই কোনরূপ বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা আমরা চালিত হইনি বা স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্য কোনরূপ গুপ্ত হত্যার কথাও ভাবিনি। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এইরূপ বহু গুপ্ত যুব-সমিতির অধিনায়ক ছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনরূপ নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম যুবকদের ছিল না বটে, কিন্তু তারা আদর্শে খুবই নিষ্ঠাবান ছিলেন। আমি একটি সমিতির কথা জানি—

*Memories of My Life and Times. vol. 1.

আমি অবশ্য এর সভ্য ছিলাম না—যার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল ছিন্ন করে রক্ত বার করতেন ও সেই রক্ত দিয়ে অঙ্গীকার পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন।”

সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি অন্তত এইরূপ পঞ্চাশটি গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সভাপতিরূপে যুক্ত হন। এ সময়ে গুপ্ত সমিতি স্থাপনের ধূম পড়ে যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঞ্জীবনী সভাও এইরূপ একটি গুপ্ত সমিতি। এ সভার সভাপতি বর্ষীয়ান রাজনারায়ণ বসু এবং সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্র স্বয়ং। কিশোর রবীন্দ্রনাথ থেকে বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা পর্যন্ত এর সদস্য হয়েছিলেন। সাধারণ লোকেরা যেমন, কামার কুমার প্রভৃতিরাও এতে যোগ দিতেন। গোপনীয়তা কঠোরভাবে পালন করা হত। স্বদেশের উন্নতিই ছিল সভার মূল উদ্দেশ্য। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।” কার্যত যদিও বিশেষ কিছু ঘটেনি তথাপি সভ্যদের, বিশেষতঃ বয়স্ক সভ্যদের আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি থেকে এর খানিকটা আঁচ্ আমরা পাই। সঞ্জীবনী সভায় কিশোর বৃদ্ধ সকলে মিলে সমস্বরে যে একটি গান করতেন তার দুটি কলি এই :

> “এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
> এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।”

জীবন স্মৃতি, সুলভ সং পৃ. ৭৭-৮২)।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও এই সময়ে স্বাধীনতা মন্ত্রে উজ্জীবিত। ভারত সভার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর নিকট থেকেও এক দল ব্রাহ্ম যুবক স্বাধীনতার প্রেরণালাভ করেন। তবে তাদেরও একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই সমিতির পক্ষে তাঁরা যে স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাক্য গ্রহণ করেন শিবনাথ এবং বিপিনচন্দ্র উভয়েই সে সম্বন্ধে লিখেছেন। এই যুবকদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, তারাকিশোর রায় চৌধুরী (সন্তদাস বাবাজী), কালীশঙ্কর শুকুল, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। বিপিনচন্দ্রের মতে—সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত এ সময়কার অন্যান্য সমিতির সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্ম ও

সমাজ সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল মতবাদ পোষণ ও পালন এ সমিতির উদ্দেশ্য হ'ল। সভা প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে একদিন মধ্য রাত্রে শিবনাথের নেতৃত্বে অগ্নিকুণ্ড জেলে তা প্রদক্ষিণ করতে করতে তাঁরা সমাজ ও ধর্ম বিষয়ক আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতারও অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। একটি অঙ্গীকারে স্পষ্ট এই নির্দেশ ছিল যে, জীবন গেলেও কেউ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব করবেন না। কারণ, তাঁদের মতে ব্রিটিশ জাতি বলপ্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষ জয় করেছে। তবে তাঁরা সরকারী আইন ভঙ্গ করবেন না স্থির করেন। শিবনাথ তখনও সরকারী চাকুরে। তিনি সেদিন অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে পারেন নি। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "যখন ইঁহারা ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন তখন এক আশ্চর্য বল ও আশ্চর্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল।" পরে শিবনাথ সরকারী কর্ম পরিত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে (১৮৭৮ জানুয়ারি) শিবনাথের পৌরোহিত্যে গগনচন্দ্র হোম এবং উমাপদ রায় বরাহনগরে গঙ্গাতীরে অনুরূপ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। গগনচন্দ্র তাঁর জীবন স্মৃতিতে (পৃ. ২৫-৬) প্রতিজ্ঞাপত্র সমেত এই ব্যাপারটির বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। গগনচন্দ্র লেখেন :

"ব্রাহ্ম সমাজের কার্যে আমি বহুদিন হইতেই শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সুপরিচিত হইলাম। তাঁহার নিকটেই আমি অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করি। সে এক অপূর্ব অনুষ্ঠান। আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশঙ্কর শুকুল, শরৎচন্দ্র রায়, তারা কিশোর [রায়] চৌধুরী, বিপিন চন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাস তাঁহার নিকট পূর্বেই এই মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আমার দীক্ষার দিনে বরাহনগরের গঙ্গাতীরে এক বাগানে, গভীর রাত্রে, তাঁহারা সকলে দীক্ষার্থী উমাপদ রায় ও আমাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন; সমুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হইল। আমরা বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া বটপত্রে লিখিয়া নিজেদের প্রবৃত্তির মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ধর্মবিশ্বাসে প্রতিমা পূজা, সমাজে জাতিভেদ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরাধীনতা অগ্নিতে আহুতি দিলাম, তাহার পর বটপত্রগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সমুখে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম :

(১) প্রতিমা পূজা করিব না, প্রতিমা পূজার সহিত কোনরূপ যোগ রাখিব না।

(২) জাতিভেদ মানিব না, কোনপ্রকারই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জাতিভেদকে প্রশ্রয় দিব না।

(৩) স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া সমাজে তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিব।

(৪) বাল্য বিবাহ অশেষ অকল্যাণের আকর জানিয়া নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্বে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইব না। ষোড়শ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালিকার পাণিগ্রহণ করিব না; এবং যে বিবাহের পাত্রের বয়স একুশের এবং পাত্রীর বয়স ষোল বৎসরের কম, তেমন বিবাহে যোগদান হইতে বিরত থাকিব।

(৫) নিজেদের ও স্বদেশবাসীর শক্তি ও শৌর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা ও তাহার প্রচার করিব; নিজেরা অশ্বারোহন এবং আগ্নেয়াস্ত্র চালনা অভ্যাস করিব; এবং সমস্ত দেশে যাহাতে অশ্বারোহণ ও বন্দুক ছুড়িবার অভ্যাস প্রচলিত হয় তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিব।

(৬) একমাত্র স্বায়ত্ত শাসনই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন ব্যবস্থা; কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশীয় শাসনকে স্বীকার করিব, কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য-দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কদাপি এই গবর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব করিব না।"

এই সময়ে, শুধু এই সময়ে কেন, পরবর্তী দশকেও বিখ্যাত ছাত্র সভায় প্রদত্ত সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাবলী থেকে যুব-ছাত্র সমাজ স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কল্পে সবিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ না করলে প্রত্যবায় হয়। নবজাগ্রত যুব-শক্তিকে সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করার দায়িত্বও গ্রহণ করলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গীগণ। ইণ্ডিয়ান লীগের সঙ্গে তাঁরা পূর্বেই মতানৈক্য হেতু সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। গণতন্ত্রের পূজারী ছিলেন নেতৃবৃন্দ। লীগ পরিচালনায় গণতন্ত্রের অপহ্নব দেখে তারা এ থেকে দূরে সরে গেলেন। কিন্তু আদৌ নিশ্চেষ্ট রইলেন না। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যুব সমাজ 'উত্তেজনার আগুন'

পোহাচ্ছিলেন। কিন্তু এই উত্তেজনাকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রূপ দিয়ে তাকে স্বদেশের সকল প্রকার উন্নতির বাহন করার প্রয়োজন ছিল। লীগ পরিত্যাগ করার পর একটি কেন্দ্রীয় সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমেই এটা সম্ভবপর। তাই তাঁরা নূতন একটি সংস্থা গড়ে তুলতে তৎপর হলেন। শিশির কুমারের বন্ধু আনন্দমোহনও এদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। আনন্দমোহন, শিবনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথ এই ত্রয়ীর ঐকান্তিক যত্নে নূতন সংগঠনের জন্ম। এই সংস্থা মারফত আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-ভাবনা ক্রমে বস্তুগত হয়ে উঠল। এই কথাই এখন একটু বিশদ করে বলি।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা
প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম—প্রথম পর্ব

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইতিপূর্বেই বলেছিলেন, ভাবী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া যেতে পারে বেঙ্গল এসোসিয়েশন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রেরও ছিল এই মত। সুরেন্দ্রনাথের সম্মুখে তখন ইউনাইটেড ইটালি বা ঐক্যবদ্ধ ইটালির আদর্শ। তিনি অনুরূপ ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্নকে একটি সুষ্ঠু রূপ দিলেন ভারত সভার ভেতর দিয়ে। আনন্দমোহন, শিবনাথ প্রমুখ সঙ্গীগণ এতে সমর্থন জানালেন। বৎসরখানেক আগেই ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপিত হয়েছে। লীগের এই ইণ্ডিয়ান কথাটি গ্রহণ করে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হ'ল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা।

প্রারম্ভিক উদ্যোগ আয়োজনের পর সভা জন্ম নিল ১৮৭৬ সনের ২৬শে জুলাই দিবসে। কলকাতার এলবার্ট হলে সভার অনুষ্ঠান হ'ল। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সভায় যোগ দেন। এমন কি ভারতবর্ষীয় সভার সহকারী সভাপতি রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং সম্পাদক হিন্দু পেট্রিয়টের কৃষ্ণদাস পাল উপস্থিত থেকে নিজেদের সমর্থন জানালেন। সভাপতি হলেন ব্যবস্থাদর্পণ প্রণেতা ঠাকুর আইন অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্যামাচরণ শর্মা সরকার। প্রথমেই আঁচ করা গিয়েছিল যে, ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষ থেকে সভা প্রতিষ্ঠায় আপত্তি হতে পারে। হলোও তাই। এইরূপ সম্ভাবনার কথা ভেবে উদ্যোক্তারা খানিকটা প্রস্তুতই হয়ে এসেছিলেন।

সভার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী কয়েকটি প্রস্তাবের আকারে গৃহীত হয়। দুঃখের বিষয় এই প্রস্তাবগুলি এখন আর আমাদের পাবার উপায় নেই। এ সবের সার মর্ম সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (A Nation in Making) থেকে আমরা কতকটা জানতে পারি। সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করে বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ

হওয়া মাত্র ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষে রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এরূপ একটি নূতন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন এবং লীগ দ্বারাই এ কার্য সুসম্পাদিত হতে পারে এইরূপ কথা বলেন। সভার অল্প পূর্বে ঐ দিনেই সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র শিশুপুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু কর্তব্যবোধে এবং ভাবী সম্ভাবনার কথা অনুমান করে তিনি সভায় এসে যোগ না দিয়ে পারলেন না। সুরেন্দ্রনাথ জোরালো ভাষায় যুক্তি প্রমাণসহ উক্ত আপত্তির জবাব দিলেন। উপস্থিত সকলেই একবাক্যে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন ; এবং এতে তাঁদের আন্তরিক সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাগত জানিয়ে উদ্যোক্তাদের একখানি পত্র লেখেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভায় এখানি পাঠ করেন। পত্রের শেষাংশের এই কথা ক'টি প্রণিধান যোগ্য ঃ

"ভরসা করি এতদিন পরে এরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা উপযুক্তরূপে দেশীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ হইবে।" (সাধারণী, ১৬ শ্রাবণ ১২৮৩)।

সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে ভারত সভা স্থাপনের মূল চারিটি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখেছেন ঃ ১. দেশাভ্যন্তরে প্রবল জনমত গঠন, ২. রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সমুদয় শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বিধান, ৩. হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি স্থাপন এবং ৪. সমকালীন গণআন্দোলনের সঙ্গে জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তি। ভারত সভার মূল উদ্দেশ্যগুলি সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি থেকে এইরূপ লিখলেও এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে দ্বিমত থাকবার কারণ নেই। একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের স্বতঃই দৃষ্টি পড়ে। তখনই, গত শতাব্দীর শেষ পাদে চিন্তানায়কেরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ভেতরে সম্প্রীতি স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন। এর কারণও যে না ছিল তা নয়। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান সংখ্যার দিক থেকে দু'টি গরিষ্ঠ সম্প্রদায়। এদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যথোচিত উন্নতি হওয়া সম্ভব। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংখ্যাল্পতা হেতুই হয়তো এখানে তাদের কথা উল্লিখিত হয়নি, উহ্য রয়েছে। আর একটি প্রশ্নও আজিকার পাঠকের মনে জাগতে পারে। হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি স্থাপনের কথা বিশেষ করে কেন বলা হ'ল?

তবে কি তখনই সম্প্রীতির অভাব ঘটেছিল? ঐ সময়ই হয়তো বাহ্যত এরূপ লক্ষণ কিছু দেখা দেয়নি। কিন্তু সরকারের প্রশাসনিক কার্যপদ্ধতি দেখেই এরূপ ব্যাপারের যে একদা উদ্ভব হতে পারে তার কথাও নেতৃবৃন্দের চিন্তায় এসেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে আরও একটির প্রতি আমি এখানে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এ থেকেই ভারতবর্ষীয় সভা এবং ভারত সভার প্রকৃতিগত পার্থক্য বুঝা যাবে। প্রথমোক্ত সভা পার্লামেণ্টে স্মারকলিপি পাঠিয়ে নিজেদের তথা জনসাধারণের অভাব অভিযোগের কথা জ্ঞাপন করতেন। জনমত গঠনের দিকে নেতৃস্থানীয়েরা মনঃসংযোগ করা থেকে প্রায় বিরত ছিলেন। ভারত সভা জনগণের মধ্যেই অভাব অভিযোগ নিরসন-কল্পে প্রধানত আন্দোলন উপস্থিত করেন। এইরূপ জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণের কাজে সভা প্রথম থেকেই হাত দিলেন। উপরওয়ালাদের নিকট স্মারকলিপি পাঠানোর ভেতরেই তাদের কার্য সীমিত থাকে নি। এইরূপে জনসাধারণের নিকট সভার নেতৃবৃন্দ সুপরিচিত হলেন। বিভিন্ন কাজে এদের ভেতর থেকে সমর্থন ও সহানুভূতিও মিল্‌লো আশাতীতরূপ। অচিরে বঙ্কিমচন্দ্রের আশাও ফলবতী হতে চল্‌লো। ভারত সভা অখণ্ড ভারতের তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ উভয়েরই কল্যাণের দিকে গোড়া থেকেই অবহিত হন।

প্রথম অধিবেশনে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হয়। নাম থেকে বোঝা যাবে, তৎকালীন খ্যাতনামা নবীন প্রবীণ বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি ভারত সভার সঙ্গে যোগ দেন। তাঁরা যথাক্রমে—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেশ্বর মালিয়া, ক্ষেত্রচন্দ্র গুপ্ত, চন্দ্রনাথ বসু, মনোমোহন ঘোষ সারদাচরণ মিত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, নবগোপাল মিত্র, নীলকমল মিত্র (এলাহাবাদ), রাজনারায়ণ বসু, সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, কেদারনাথ চৌধুরী, প্রসাদদাস মল্লিক, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ভোলানাথ চন্দ্র, অঘোরকুমার নাথ, শ্রীনাথ দত্ত, জয়গোবিন্দ সোম। সম্পাদক—আনন্দমোহন বসু, এবং

সহকারী সম্পাদকদ্বয়—অক্ষয়চন্দ্র সরকার (সম্পাদক, সাধারণী) ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (সম্পাদক, আর্য্য দর্শন)। প্রথমেই আর একটি বিষয়ের কথা বলে নিই। সভ্যদের বার্ষিক চাঁদা স্থির হ'ল অন্যূন পাঁচ টাকা। বিশেষত্ব এই যে, আরম্ভ থেকেই কৃষক ও শিল্পীক শ্রেণীর নিমিত্ত বার্ষিক চাঁদা ধার্য হয়েছিল মাত্র এক টাকা করে।

উল্লেখ্য, পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান লীগের বার্ষিক চাঁদাও ধার্য হয়েছিল পাঁচ টাকা। পাঠকের হয়তো স্মরণ থাকবে ভারতবর্ষীয় সভার চাঁদা বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা থেকে কমিয়ে পাঁচ টাকা করার প্রস্তাব করেছিলেন শিশির কুমার ঘোষ। ভারত সভা শুধু বার্ষিক চাঁদা অন্যূন পাঁচ টাকা করেই ক্ষান্ত হন নি। কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য এই অঙ্ক কমিয়ে এক টাকা করার মধ্যে জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ সাধনের প্রয়াসও আমরা লক্ষ্য করি। কার্যনির্বাহক সমিতিতে সভাপতিত্ব করতেন ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ। ১৮৭৮, জানুয়ারি মাসে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মনোমোহন সভাপতির কাজ করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারত সভা বিবিধ জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু সভার সমগ্র ভারতের মুখপাত্ররূপে কাজ করার শীঘ্রই সুযোগ ঘটল। এই বিষয়টি নিয়ে এখন আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। ভারত সভা নিখিল ভারতের সমস্যাদি নিয়ে স্বতঃই চিন্তা করতে থাকেন। কার্যে তা রূপ পায় অনতিকাল মধ্যেই। এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলতে গেলে একটু পুরানো কথার দিকে আমাদের যেতে হবে। আর এর ফলে ভারত সভার প্রধান উদ্দেশ্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব। সিবিল সার্বিস নিয়ে আমাদের দেশে কত আলোচনা পর্যালোচনা ও বিতর্কই না উপস্থিত হয়। বিভিন্ন সময়ে আমরা এ সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ বিষয়টির ধারাবাহিকতা রক্ষার নিমিত্ত এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি উপলব্ধির জন্য এখানে পুনরায় কিছু বলা দরকার। আরও দরকার এই জন্য যে, এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিষ্ঠার কিছু কাল পরেই ভারত সভা দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন।

সিবিল সার্বিস ও সমপর্যায়ের পরীক্ষাগুলি প্রতিযোগিতামূলক করা হয় ১৮৫৩ সনের পর থেকে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ সব পরীক্ষা পরিচালনার জন্য

একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের প্রথম সভাপতি হন টমাস বেবিংটঙ্ মেকলে। তখন তিনি লর্ড উপাধিতে ভূষিত হয়ে লর্ড মেকলে হয়েছেন। প্রাচ্য ভাষা-সাহিত্যের প্রতি মেকলের বিরাগ সুবিদিত। তিনি ক্লাসিক্‌স্-এর নম্বর এইরূপ ঠিক করে দেন: লাটিন বা গ্রীকের জন্য ৭৫০, সংস্কৃত বা আরবীর জন্য ৩৭৫। প্রথমাবধি পরীক্ষার্থীদের বয়স স্থির করা হয় অনূর্ধ্ব তেইশ বৎসর এবং শিক্ষানবিশীর কাল দুই বৎসর। ১৮৫৯ সনে কমিশন এই বয়স কমিয়ে করলেন বাইশ বৎসর এবং শিক্ষানবিশীর কাল এক বৎসর। দুই বৎসর পরে ১৮৬১ সনে পরীক্ষার্থীদের বয়স পুনরায় হ্রাস করা হ'ল একুশ বৎসরে। শিক্ষানবিশীর কাল প্রথম বারের মত দুই বৎসর করা হ'ল। প্রাচ্য ভাষাগুলির নম্বরে তারতম্যের দিকেও কমিশনের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। মেকলের মৃত্যুর পরে উক্ত ১৮৫৯ সনেই সংস্কৃত বা আরবীর নম্বর বাড়িয়ে পাঁচশ' করলেন তাঁরা। লাটিন গ্রীকের নম্বর পূর্ববৎই থেকে যায়। এ দেশে লণ্ডনের মত একই কালে ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজের কথা ভারতবর্ষীয় সভা এর আগে বহুবার বলেছেন। ১৮৬০ সনে দেখি কমিশন এই প্রস্তাবের অনুকূলে এ দেশেও পরীক্ষা গ্রহণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করেন। এ সুপারিশ কিন্তু গ্রাহ্য হয়নি। উপরন্তু ১৮৬৩ সনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাফল্যের পর পুনরায় প্রাচ্য ভাষা সাহিত্যের (সংস্কৃত/আরবী) নম্বর কমিয়ে পূর্ববৎ ৩৭৫ই করা হ'ল। এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে একেবারেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না তা বলা যায় না। কারণ পার্লামেণ্ট ১৮৭০ সনে এই মর্মে এক আইন পাস করলেন যে, ভারত সরকার ভারতে বসেই যোগ্য ভারতীয়দের সিবিলিয়ানীর অনুরূপ পদে নিযুক্ত করতে পারবেন। এ হেতু ভারত সচিবের অনুমোদন সাপেক্ষ তারা যেন নিয়ম পত্র রচনা করেন। মোট সিবিলিয়ানী পদের এক পঞ্চমাংশ ভারতবাসীর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখারও কথা হ'ল আইনে। নিয়মপত্রের মধ্যে এই শ্রেণীর সিবিলিয়ান কর্মীর ক্ষমতা ও বেতনাদি সম্বন্ধেও কথা থাকে। এদের কোন ক্রমেই বিলাতে পাস করা সিবিলিয়ানদের বেতনের দুই তৃতীয়াংশের বেশী হবে না। তাঁরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনার এবং উচ্চতম পদে নিয়োগের অধিকারীও নন। কর্তৃপক্ষ এইরূপে একটি নূতন সিবিলিয়ান

কর্মীমণ্ডলী সৃষ্টি করতে চাইলেন। কিন্তু এই আদেশনামা বহু বৎসর যাবৎ কার্যকরী করা হ'ল না। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি বিলাতে ঘোর রক্ষণশীল দল প্রবল হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেলি রক্ষণশীল, ভারতসচিব স্যলসব্যুরি রক্ষণশীল এবং ভারতের বড়লাট রক্ষণশীল লিটন (ঔপন্যাসিক লিটনের পুত্র)—তাঁরা লোকমত অগ্রাহ্য করে নির্বিচারে কাজ করতে লেগে যান। ডিজ্‌রেলি ঘোষণা করেন যে, রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী ("Empress of India") উপাধি দেওয়া হবে। এই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হ'ল ১৮৭৭, ১ জানুয়ারিতে। এই দিনে বহুশ্রুত দিল্লীর দরবার অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের রাজন্যবর্গও নানা উপাধিতে ভূষিত হলেন। এই দু'টি ব্যাপার নিয়েই তখন পত্র পত্রিকায় বিশেষ আলোচনা আরম্ভ হয়। ব্রিটেনে রাজা বা রাণীর অধিকার যখন একেবারেই সীমিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে তখন ভারতে বসে রাণী ভিক্টোরিয়াকে সম্রাজ্ঞী বলে আখ্যাত করার কোন সার্থকতাই নেই। আবার রাজন্যবর্গ পূর্ব পূর্ব চুক্তিমত ব্রিটিশ রাজেরই সম পর্যায় ভুক্ত, কাজেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লর্ড লিটনের এরূপ উপাধি দেওয়ারও কোন ক্ষমতা নাই। এ সব বাদ প্রতিবাদে যে কোন ফলোদয় হয়নি তা তো সকলেরই জানা। ব্রিটিশের চক্ষে রাজন্য-ভারত এবং খাস ব্রিটিশ শাসিত ভারত দুইই যে এতদিনে এক স্তরে অবনমিত হয়েছিল! হিন্দু মেলায় পঠিত দিল্লীর দরবার শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি। রাজন্যবর্গও যে তখনই দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছেন কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের চক্ষেও তা ধরা পড়তে এতটুকু বিলম্ব হয়নি। এ হেন রক্ষণশীল দল যে প্রশাসন ব্যাপারে বিষম পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

হ'লও তাই। ১৮৭৬ সনে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ভারত সচিব কলমের খোঁচায় সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স একুশ থেকে কমিয়ে উনিশ বৎসর করে দিলেন! এর ফলে ভারত সন্তানদের পক্ষে এ দেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে বিলাতে গিয়ে আই. সি. এস পরীক্ষাদান অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই সময়ে উচ্চ রাজপদে ভারতীয় নিয়োগ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কিরূপ অনভিপ্রেত ছিল ভারত সচিবকে প্রেরিত লর্ড লিটনের একটি গোপনীয় পত্রে তা পরিষ্কার উল্লিখিত হয়। তিনি

লেখেন : "ভারতবাসীদের সিবিল সার্বিসে নিয়োগের দাবি পূরণ করা আদবে সম্ভব নয়। কাজেই, তাদের এ দাবি অস্বীকার করা বা তাদের প্রবঞ্চনা করা—এ দুটির একটি পথ বেছে নিতে হবে। আমরা দ্বিতীয়টিই বেছে নিয়েছি। বিলাতে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগীদের বয়স হ্রাস করা আইনকে অকেজো করবারই কৌশল মাত্র।—এ পত্রখানি গোপনীয়, সুতরাং বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি ভারত গভর্ণমেণ্ট কেউই এ অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবেন না যে, আমরা মুখে যা অঙ্গীকার করেছি, কাজে তা ষোল আনাই ভঙ্গ করছি।"

ভারত সভা সরকারী নির্দেশ জানতে পারলেন। নেতৃবর্গ কালবিলম্ব না করে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও শুরু করে দেন। ভারত সভা সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে অবশ্যই কিছু সময় লেগে যায়। সভার পক্ষে কলকাতা টাউন হলে একটি জনসভার আয়োজন হ'ল ১৮৭৭, ২৪ মার্চ তারিখে। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত থেকে উদ্দেশ্যের প্রতি নিজ নিজ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। পেট্রিয়ট সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল, সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, পুরাতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ব্রাহ্মনেতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন সভায় যোগদান করেছিলেন। এখানে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে একটি ছিল এই মর্মে যে, সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীর বয়স ১৯ বৎসর তো ধার্য হওয়া কোন ক্রমেই চলবে না। বয়স বাড়িয়ে ২২ বৎসর করা হোক। শুধু ভারতীয়দের সুবিধাই নয়, সিবিল সার্বিসকে যথাযোগ্য কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম করে তোলার জন্যও এটা দরকার। আর লণ্ডনের মত ভারতের বিভিন্ন প্রধান শহরেও এই পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সভায় আরও স্থির হ'ল এইরূপ একটি নিখিল ভারতীয় ব্যাপারকে ভিত্তি করে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থলে কার্য পরিচালনার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষ প্রতিনিধি করে পাঠানো হোক। এর পূর্বে যাতে সিবিল সার্বিস সম্পর্কীয় বিষয়াদি নিয়ে একখানি স্মারকলিপি অচিরে প্রস্তুত করা যায় সে জন্য একটি সাব-কমিটি এই

সভায় গঠিত হ'ল। কমিটিতে ছিলেন: মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, নবাব মীর মহম্মদ আলী, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রলাল সরকার, মনোমোহন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দ-মোহন বসু (সম্পাদক)।

এখানে একটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। অবশ্য ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধেও কিছু কিছু বলেছি। ভারতের রাজধানী কলকাতা বিধায় এটি হয়ে দাঁড়ালো সমগ্র ভারতের প্রশাসনিক প্রাণ-কেন্দ্র। সিবিল সার্বিসের মত একটি ব্যাপার নিয়ে তাই এখানেই প্রথম আন্দোলন হয়। কারণ এটি যে ছিল সমগ্র ভারতেরই স্বার্থ ঘটিত বিষয়। ভারত সভা অবিলম্বে সত্যসত্যই একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার সুযোগ পেলেন এই বিষয়টির মাধ্যমে। ভারত সভা যে শুধু বঙ্গ প্রদেশের নিমিত্তই নয়, সমগ্র ভারতের কল্যাণ সাধন ও স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তই আয়োজিত এ কথাও অল্প সময়ের মধ্যে সকলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। আজিকার দিনে হয়তো কৌতুককর ঠেকবে তথাপি এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলি।

কলকাতা, শাসনের কেন্দ্রস্থল—রাজধানী। এ কারণ লাহোরই বলুন, দিল্লীই বলুন বা বোম্বাই মাদ্রাজই বলুন, সকল অঞ্চলই ছিল আমাদের পক্ষে মফস্বল। রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও বহুকাল ধরে অন্তত একটি ক্ষেত্রে এই মফস্বল কথাটির প্রচলন দেখতে পেয়েছি। কলকাতা ব্যতীত দূরদূরান্তের যাবতীয় পত্রপত্রিকাকে "মফস্বল পেপারস্" বা মফস্বলের কাগজ বলা হত। আজিকার পাঠক হয়তো এখন বুঝতে পারবেন কলকাতা ছিল সমগ্র ভারতের প্রাণ-কেন্দ্র। আর এ হেতুই বিবিধ জাতীয় উদ্যোগের মূলও ছিল এই কলকাতায়।

ভারত সভার প্রস্তাব অনুযায়ী মে মাসের শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সিবিল সার্বিস সম্পর্কে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে উত্তর ভারত পরিক্রমায় বার হলেন। ইতিমধ্যে সিবিল সার্বিস বিষয়ে ঐতিহাসিক স্মারকলিপিখানিও তৈরি হয়ে গেছে।

সুরেন্দ্রনাথ এখানি সঙ্গে করে নিলেন। তিনি প্রথমে আগ্রায় কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য স্মারকলিপিখানির উর্দু

অনুবাদ ছাপিয়ে নেন। উত্তর ভারতের যেখানেই গেলেন পূর্ব থেকেই এই স্মারকলিপিখানি বিলি করে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের অবহিত করান। জাতির স্বার্থ রক্ষায় এবং হিতসাধনকল্পে স্মারকলিপিখানি রচিত। সুরেন্দ্রনাথ যেখানেই গেলেন সেখানেই নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ কর্তৃক বিশেষভাবে অভিনন্দিত হন। ইতিপূর্বে কেশবচন্দ্র সেন উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করেছিলেন। তবে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার। সুরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের ঐহিক কল্যাণের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করায় তিনি যে জনচিত্তে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান করে নিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুরেন্দ্রনাথের উত্তর ভারত পরিক্রমা প্রকৃত প্রস্তাবে শুরু হ'ল লাহোর থেকে। লাহোরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং জনসভার আয়োজন করে স্মারকলিপির উদ্দেশ্য প্রচারের সুযোগ করে দিলেন। আগেই বলেছি, তিনি যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানেই সভানুষ্ঠানের পূর্বে স্মারকলিপির উর্দু অনুবাদ শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করেন। এ কারণ তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁরা আগের থেকেই পরিচিত হওয়ায় সোৎসাহে সাধারণ সভায় যোগ দিতে থাকেন। লাহোর থেকে সুরেন্দ্রনাথ গেলেন অমৃতসরে। সেখানকার সর্বজনমান্য নেতা সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করলেন। সভায় বিস্তর জনসমাগম হয়েছিল। দয়াল সিং মাজিথিয়া বিবিধ জনহিতকর উদ্যোগের ছিলেন প্রধান সহায়। পরে তিনি 'ট্রিবিউন' নামক বিখ্যাত সংবাদ পত্রেরও প্রতিষ্ঠা করেন। অমৃতসর থেকে সুরেন্দ্রনাথ এলেন দিল্লীতে এবং সেখানেও অনুরূপ জনসভার আয়োজন হয়েছিল। দিল্লী থেকে মীরাট, মীরাট থেকে আগ্রা এবং আগ্রা থেকে তিনি আলীগড়ে যান। বলা বাহুল্য, প্রতিটি স্থলেই হিন্দু ও মুসলমান প্রধানেরা জনসভা অনুষ্ঠানে তাঁকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। আলীগড়ে স্যর সৈয়দ আহ্‌মেদ খাঁ সুরেন্দ্রনাথকে সাদরে গ্রহণ করেন। এ স্থলে যে জনসভা হ'ল তার সভাপতিত্বও করলেন স্যর সৈয়দ। লক্ষ্ণৌ এবং কানপুরেও পর পর জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পূর্ব স্থলের মত এখানেও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার বিষয় তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেন। কানপুরে জনসভার সভাপতিত্ব করেন অযোধ্যা তালুকদার সভার সহ-সভাপতি রাজা আমির

হোসেন খাঁ। 'আউধ আকবর' সম্পাদক মুন্সী নবল কিষেণ এই ব্যাপারে খুবই উদ্যোগী হয়েছিলেন। কানপুর থেকে সুরেন্দ্রনাথের গন্তব্যস্থল হ'ল এলাহবাদ। এখানে তিনি স্যর সৈয়দের পুত্র ব্যারিস্টার সৈয়দ মহম্মদ এবং পণ্ডিত অযোধ্যানাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাঁরা জনসভার আয়োজন করে এই উদ্দেশ্যকে শুধু সাধুবাদই নয়, আন্তরিক সমর্থন জানান। এলাহবাদ থেকে সুরেন্দ্রনাথ যান বারাণসীতে। এখানে তিনি বিখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের বিশেষ সহায়তা ও সমর্থন লাভ করেন। বলা বাহুল্য, জনসভার আয়োজনেও তাঁরা সাহায্য করলেন প্রচুর। সুরেন্দ্রনাথ জুলাই মাসের প্রথমে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ঐ মাসের শেষে বাঁকিপুর যান। সেখানেও অনুরূপ জনসভার আয়োজন হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভার শাখা সমিতি—এবং কোথায়ও কোথায়ও কমিটি—উত্তর ভারতের বহু স্থলে এ সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ লাহোর, অমৃতসর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহবাদ, বারাণসী ও বাঁকিপুরের নাম করা যেতে পারে।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৭, নভেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারত পর্যটনে বা'র হন ঐ একই উদ্দেশ্যে। তিনি প্রথমে যান বোম্বাই-এ। সেখানকার নেতৃবৃন্দও এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সুরেন্দ্রনাথকে এবং সাধারণ ভাবে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ভারত সভাকে অভিনন্দন জানান। এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ, স্যর ফিরোজ শা মেহ্‌তা এবং বিষ্ণুনারায়ণ মাণ্ডলিক। এখানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সরকারী রীতি পদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ জানানো হ'ল। সিবিল সার্বিস সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থহানির বিষয়ও তিনি বিজ্ঞাপিত করেন। এখানে শিক্ষিত জনের মনে এ নিয়ে বেশ আলোড়ন উপস্থিত হয়। বোম্বাই থেকে সুরেন্দ্রনাথ যান গুজরাটের আহ্‌মদাবাদে এবং সুরাটে। সেখানে পূর্ববৎ জনসভার অধিবেশন হ'ল। এবং বক্তৃতার দ্বারা উদ্দিষ্ট বিষয়ে তিনি সাধারণের মনে উৎসাহ উদ্দীপনার উদ্রেক করতে সমর্থ হন। পুণায় গিয়ে সুবিখ্যাত মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এখানেও জনসভার অনুষ্ঠান ব্যাপারে রাণাড়ে মহোদয় সবিশেষ উদ্যোগী হন। বোম্বাই থেকে ফেরার পথে সুরেন্দ্রনাথ যান মাদ্রাজে। সেখানে

সাধারণ সভা না হলেও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি এ সম্পর্কে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন এবং তাদের সমর্থন লাভ করলেন। কলকাতার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারত সভা পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের দিকেও তারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হলেন। দক্ষিণ-ভারতে নেতৃস্থানীয়েরা কেহ কেহ পরে কলকাতায় এলেন স্থানীয় সভা এবং তার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের নিমিত্ত। সর্দার মাজিথিয়াও এই সময় একবার কলকাতায় এলেন। এঁরা সকলেই সভার দ্বারা সম্বর্ধিত হন। বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যেমন যশোহর, নদীয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজসাহী প্রভৃতি স্থলেও সভার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার।

দেখতে দেখতে আমরা ১৮৭৮ সনে এসে পৌছোলাম। কিন্তু এর পূর্বেই কি আভ্যন্তরিক কি বৈদেশিক সকল ক্ষেত্রেই ঘনঘটা দেখা গেল। মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে বিস্তর প্রাণহানি এবং সাধারণ মানুষের অশেষ দুর্গতি কারো দৃষ্টি এড়ায় নি। দুর্গতদের সাহায্যদানের সরকারী কার্পণ্য সহজেই বুঝা গেল। অর্থের অভাব এক দিকে এই অজুহাত, অপরদিকে কিন্তু সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ভারতীয় কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় আরম্ভ হ'ল প্রচুর। এ সময়কার সাম্রাজ্যিক প্রয়োজন বলতে আমরা কি বুঝি সে বিষয় আগে থেকেই আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। ডিজ্‌রেলি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের রাজা খেদিবের নিকট হতে সুয়েজ খালের এক বিরাট অংশ ক্রয় করে নেন। এর ফলে সুয়েজের উপর ব্রিটিশের আধিপত্য পাকা হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে জলপথে সমগ্র পূর্ব মহাদেশে যাতায়াতের অবাধ সুযোগ ঘটল। ওদিকে তুরস্ক-রুশ যুদ্ধে রুশিয়া বিজয়ী হলেও কুটনৈতিক কারসাজিতে পূর্বলব্ধ জলপথের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হ'ল। প্রথম রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে (১৮৫৬) ব্রিটেন রুশিয়ার পক্ষ নেয়। রুশিয়া জয়লাভ করে এবং ভূমধ্য সাগরের উপর তার আধিপত্য স্থাপিত হয়। কিন্তু এই দশকের দ্বিতীয় তুরস্ক-রুশ যুদ্ধে রুশিয়া জয়লাভ করলেও জয়ের ফল অতি সামান্যই তার ভাগ্যে জোটে। এবারে কিন্তু ব্রিটেন রুশিয়ার পক্ষ নেয় নি। উপরন্তু বার্লিনে ব্রিটেন, জার্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয় তার দরুন রুশিয়াকে ভূমধ্য সাগরে আধিপত্য ছেড়ে দিতে হ'ল। এই বিষয়ে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ডিজ্‌রেলি এবং জারমানির প্রধান রাষ্ট্রনায়ক

বিসমার্কের কূটকৌশল ছিল সর্বপ্রকারে দায়ী। রুশিয়া অগত্যা স্থল পথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দিকে নজর ফেরায়। এই থেকেই শুরু হ'ল ব্রিটেনের রুশ ভীতি। আমরা দেখেছি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেও আনন্দমোহন বসু বিখ্যাত ব্রাইটন বক্তৃতায় ভারতের অনতিদূরে রুশিয়ার অবস্থিতি এবং তজ্জনিত ব্রিটেনের আতঙ্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই দশকের মাঝামাঝি নাগাদ এই আতঙ্ক আরও বেড়ে চলে। রুশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে আফগানিস্থানকে তাঁবে না আনতে পারলে ব্রিটেনের সমূহ বিপদ। তাই আফগানিস্থানকে স্বমতে আনবার জন্য তাকে শেষে যুদ্ধে পর্যন্ত লিপ্ত হতে হয়। এখন বুঝা গেল, সাম্রাজ্যিক প্রয়োজন কি! বাৎসরিক একটা মোটা টাকার বিনিময়ে ক্রমে এই রাজ্যটি রুশিয়ার বদলে ইংরেজরই একেবারে বশম্বদ হয়ে ওঠে।

মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ, দুর্গতি নিরাকরণে সরকারের অর্থ কার্পণ্য অথচ আফগান যুদ্ধে ভারতীয় কোষাগার থেকে অজস্র অর্থ ব্যয়, অবশ্য উদ্দেশ্য রুশ শক্তিকে ঠেকানো,—ঐ সকল বিষয় নবজাগ্রত ভারতীয় মানসকে বিপুলভাবে ধাক্কা দিল। আন্দোলন আলোচনার প্রধান বাহন সংবাদপত্র। শাসন কেন্দ্র কলকাতায় বাঙলা ও ইংরেজী পত্রপত্রিকায় ব্রিটিশ নীতির তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। রক্ষনশীল সরকার নিরস্ত তো হলেনই না, উপরন্তু তারা প্রতিশোধ নেবার আয়োজন করলেন। সন্দেহ হ'ল সরকার বুঝি সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণে নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ১৮৭৮ সনের প্রথমেই ভারত সভা শাসন কেন্দ্র কলকাতা এবং মফস্বলের পত্রপত্রিকার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সম্মেলন করলেন (১৭ জানুয়ারি ১৮৭৮)। যতদূর মনে হয়, সংবাদপত্র তথা সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের এ দেশে এই প্রথম সম্মেলন। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করলেন। তখন কিন্তু তাঁরা এতটুকুও আঁচ করতে পারেন নি যে, সরকার পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেও একটা বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়নে উদ্যত।

ব্যাপারটা কিন্তু ক্রমে ঐরূপই দাঁড়াল। সরকার পক্ষে ছোটলাট এ্যাশ্‌লি ইডেন সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদক এবং প্রতিনিধিদের ডেকে তাদের মনোভাব জেনে নিলেন। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যনীতির বিরুদ্ধে তারা যে ভূমিকা গ্রহণ

করেছেন তা সরকার আর সহ্য করতে পারেন নি। বুঝা গেল, ইডেন তথা সরকারের কোপ দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়েছে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' উপর। ছোটলাট ইডেনের সঙ্গে সম্পাদক শিশির কুমারের কথাবার্তায় এটা সম্যক উপলব্ধি হয়। সাধারণের অগোচরে, পত্রপত্রিকা মারফত পূর্বাহ্নে কোন কিছু না জানিয়ে এক দিনের অধিবেশনেই দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাস করিয়ে নিলেন। এই কুখ্যাত অধিবেশন হয় ১৮৭৮ সনের ১৮ই মার্চ। বলাবাহুল্য এইরূপ বৈষম্যমূলক আইনের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ফাঁপরে পড়লেন। 'সোমপ্রকাশ' ও 'সহচর' বন্ধ হয়ে গেল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাঙলা ইংরেজী দ্বি-ভাষিক কাগজ। এর উপরই সরকারের কোপ বেশী। ১৪ই মার্চ দ্বি-ভাষিক পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যা বার হয়। এর পর সপ্তাহে ২১শে মার্চ সম্পূর্ণ ইংরেজী কলেবরে এখানি প্রকাশিত হতে দেখে কি সরকার কি দেশবাসী সকলেই অবাক হয়ে যান। একটি ভুল ধারণা এখানে শোধরানো দরকার। বর্তমানে পত্রিকা দৈনিক বলে স্বতঃই মনে হতে পারে আইন প্রণয়নের পরেই রাতারাতি এখানা ইংরেজী রূপ নিয়েছিল। 'রাতারাতি' 'কথাটা ভুল। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দু' দিন সময় পেয়েছিলেন। অবশ্য তখনকার দিনে দু'দিনের মধ্যে ছাপাখানার টাইপ পত্র ও সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল। নেতৃবৃন্দ এরূপ একটা বৈষম্যমূলক আইনের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। ভারত সভা পূর্ববৎ এরূপ আইনের বিরুদ্ধেও প্রথমে এ দেশে এবং পরে বিলাতে জোর আন্দোলন শুরু করে দেন। এই কথাই এখন বলছি।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের মত একটি বৈষম্যমূলক বিধি দেশের অভ্যন্তরে ভীষণ বিক্ষোভের কারণ হয়ে উঠল। ভারত সভা বাঙলার এবং বঙ্গেতর অঞ্চল সমূহের শাখা সভার মাধ্যমে এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের শাখা বোম্বাই স্থিত প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন, পুণার সার্বজনিক সভা এবং মাদ্রাজের মহাজন সভার সম্মতি নিয়ে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করলেন (১৮৭৮, ১৭ই এপ্রিল) কলকাতা টাউন হলে। পাদ্রী ডক্টর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে ১৮৭৮ জানুয়ারি থেকে ভারত সভার সভাপতি পদে বৃত হয়েছেন। তাঁরই পৌরোহিত্যে এই জনসভার অনুষ্ঠান। জনমানসে

এমন আলোড়ন উপস্থিত হয় যে, এবারকার সভায় পাঁচ সহস্রাধিক ব্যক্তি যোগ দিলেন। সভায় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়ে উক্ত আইনের বিরুদ্ধে সভার প্রচেষ্টাকে আন্তরিক সমর্থন জানান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ সভায় ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন না। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, যেমন, 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' থেকে জানা যায় যে, তারা সভায় উপস্থিত না হয়ে প্রকারান্তরে সরকারী বিধির সমর্থনই করেছিলেন। এই সময় থেকেই ভারত সভা এবং ভারতবর্ষীয় সভার কর্ম পন্থায় বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হতে থাকে। উক্ত সাধারণ সভায় কয়েকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হ'ল। এগুলির মূল কথা ছিল দীর্ঘকাল পোষিত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপর ব্যাপক হস্তক্ষেপের দরুন দেশবাসীর অশেষ অকল্যাণ। শুধু সংবাদপত্রই নয় বিবিধ বিষয়ক পুস্তক পুস্তিকা মুদ্রণেও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটবে। আর এইরূপে জ্ঞান প্রসারের পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই এরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কোন কোন সংবাদপত্রের প্রকাশ যেমন বন্ধ হয়েছে তেমনি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশও ব্যাহত হচ্ছে। একটি কমিটির উপর প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতে একখানি স্মারকলিপি প্রণয়নেরও ভার দেওয়া হ'ল।

ভারত সভা এই ব্যাপার নিয়ে এমন আর একটি পন্থা অবলম্বন করলেন তা ছিল আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব, এবং বলতে গেলে বিলাতের পার্লামেন্টের পক্ষেও। স্মারকলিপি প্রণয়নের পর সভা কর্তৃপক্ষ সব কথা জানিয়ে বিলাতে উইলিয়ম এওয়ার্ট গ্লাডস্টোনকে এখানি পাঠালেন। গ্লাডস্টোন তখন ছিলেন পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষের নেতা। প্রশাসনিক স্বৈরনীতির পরিচয় পেয়ে তিনি স্মারকলিপিতে বর্ণিত বিষয়াদির যৌক্তিকতা সম্যক বুঝতে পারলেন এবং পার্লামেন্টে এ বিষয়ে উত্থাপনেরও ভার নিলেন ১৮৭৮, জুলাইয়ের প্রথমে। আলোচনার জন্য দিন ধার্য হয় পরবর্তী ২৩শে জুলাই। গ্লাডস্টোন এবং বিরোধী পক্ষের অপরাপর সভ্য তো বটেই সরকার পক্ষেরও কেহ কেহ এরূপ আইনের বিশেষ ধারার বিরূপ সমালোচনা করতে ক্ষান্ত হন নি। ভারতবর্ষীয় শাসন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে ইতিপূর্বে পার্লামেন্টে আলোচনার জন্য বিরোধী পক্ষের চাপ গ্রাহ্য হয়নি। এবারে তা' ঘটল। এই দিক দিয়েই অভিনব—একথা একটু আগে বলেছি। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র

আইন নিয়েই মূলত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ভোট নেওয়ার পর দেখা গেল ৩৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১৫৬ জনই গ্লাডস্টোনের প্রস্তাবেরর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। ভোটে হেরে গেলেও বিরোধী পক্ষের প্রস্তাবকে সরকার একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। বিধিবদ্ধ আইনের কোন কোন ধারার সামান্য রদ বদল করে নিলেন। এতে কিন্তু মূল আইনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হ'ল না। জমানত প্রদান, জমানত বাজেয়াপ্তি প্রভৃতি কঠোর ধারাগুলি পূর্ববৎই রয়ে গেল। তবে পার্লামেন্টীয় আলোচনার ফলে ভারতের রক্ষণশীল স্বৈর শাসনের দিকে ব্রিটিশ জনসাধরণের দৃষ্টি পড়ল বেশী করে। এর ফলশ্রুতি আমরা একটু পরেই দেখতে পাব।

ভারতসভা গ্লাডস্টোনের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনকল্পে ১৮৭৮, ৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতা টাউন হলে আর একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করলেন। আর এ ব্যাপারে সমর্থন পেলেন উত্তর ভারতের এবং দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক সভাগুলি থেকে। সভার কার্যকলাপ এইরূপে যেমন স্বদেশে তেমনি বিদেশে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পেল অবিলম্বে।

সভাকর্তৃপক্ষ আরও কতকগুলি প্রশাসনিক ব্যাপার নিয়ে এই বৎসরেই জনসাধারণের পক্ষে প্রতিবাদ জানালেন। সুতী বস্ত্রের আমদানির উপর যে শুল্ক ধার্য ছিল, এই বৎসরের শেষ নাগাদ তা অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে সরকারী রাজস্বের এক মোটা অংশ হ্রাস পেল। এখানে আরও উল্লেখ করা দরকার যে এর দ্বারা ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতিরাই বেশী করে উপকৃত হতে থাকে। সভাকর্তৃপক্ষ সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। উপরন্তু এই সময় সরকারী কোষাগারের উপর টান পড়ে আর একটি কারণে। সরকার এতদিন আফগানিস্থানকে নিজের তাঁবে রাখতে সবিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। যখন দেখলেন রুশিয়ার দিকেই এর বেশী ঝোঁক তখন একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পূর্বেই বলেছি, সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ভারতীয় কোষাগার থেকে যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করা হত। এবারে তার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেল। সরকার রক্ষণশীল নীতি পুরাদমে অনুশীলন করে চলেন এ সময়। তারা মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের মত আরও কোন কোন আইন বিধিবদ্ধ করলেন। এর মধ্যে

উল্লেখযোগ্য একটি 'লাইসেন্সিং আইন'। আফগানিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরই সম্ভবত অস্ত্র আইনও নূতন করে পাস করিয়া দেওয়া হয়। বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, কলকাতা বা বোম্বাইয়ে যে কোন বিদেশী—সে জুলুই হোক বা হটেনটট্ই হোক স্বেচ্ছামত অস্ত্র নিয়ে চলা ফেরা করতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রকৃত অধিবাসীদের অস্ত্র ব্যবহার ও প্রয়োগের অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত করা হয় এই আইন বলে।

দেশবাসীর মুখপাত্র স্বরূপ ভারত সভা এ সব 'বে-আইনী' আইনের বিরুদ্ধে, আমরা দেখেছি, শুধু আন্দোলন করেই বা প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা বিলাতে পর্যন্ত এগুলির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাবার উপায় গ্রহণ করলেন। পার্লামেণ্টে গ্লাডস্টোনের সরকারী নীতির প্রতিবাদ-প্রস্তাবের কথা একটু আগে বলেছি। এবারে সভা কর্তৃপক্ষ এক নূতন উপায় অবলম্বন করলেন। আর এ থেকে ভারতবর্ষীয় সভা ও ভারত সভার কর্মধারার পার্থক্য বুঝা গেল। ১৮৭৯, ২৪ ফেব্রুয়ারি ভারত সভার বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হ'ল যে তাদের পক্ষে ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে বিলাতে পাঠানো হবে। উদ্দেশ্য—ভারতে রক্ষণশীল স্বৈরাচারী শাসনের রীতি পদ্ধতি তাদের প্রত্যক্ষ গোচরে আনা। সভার তহবিলে এত অর্থ ছিল না যাতে করে এইরূপ একজন প্রতিনিধিকে অন্তত কিছুদিনের জন্যও বিলাতে পাঠানো যায়। সভা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য অনুরোধ করে একখানি পত্র দেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বহরমপুরে যান। স্বর্ণময়ী পত্র পেয়ে তাঁদের থোক টাকা প্রদান করেন। আর এর ফলে বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হ'ল। লালমোহন সিবিল সার্বিস সম্পর্কিত স্মারকলিপি এবং অন্যান্য আইনের প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র নিয়ে বিলাত যান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লণ্ডন ইণ্ডিয়া সোসাইটির সম্পাদক প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু লাল মোহনকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন।

লালমোহন বিলাতে পৌছেই কাল বিলম্ব না করে পার্লামেণ্টের বিরোধী নেতা গ্লাডস্টোন ও প্রসিদ্ধ উদারনৈতিক বক্তা জন ব্রাইট এবং এমন কি রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেলির (তখন আর্ল অব বেকনস্‌ফিল্ড) সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রত্যেককে সবিস্তারে জ্ঞাত করান। উইলিস রুমে পার্লামেণ্ট সদস্যদের সম্মুখে লালমোহন বক্তৃতা দিলেন ১৮৭৯, ২৩শে জুলাই। সভায় সভাপতিত্ব করেন জন ব্রাইট। লালমোহনের বক্তৃতা এবং ব্রাইটের মন্তব্য উপস্থিত সকলকেই বিশেষ বিচলিত করে। এখানে অন্তরাল থেকে প্রমথনাথের ভূমিকার কথাও স্মরণীয়। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন—লালমোহনের বক্তৃতার প্রস্তুতিপর্ব থেকে উক্ত সভার আয়োজন, লালমোহনকে পার্লামেণ্টে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কার্যে তিনি তাঁর সহযোগিতা করেন। প্রমথনাথ আরও লিখেছেন, লালমোহন প্রথমে বক্তৃতাটি লিখে একেবারে মুখস্থ করেন এবং যথাযোগ্য স্থানে বিরাম, যতি এবং জোর দিয়ে অনর্গল বক্তৃতা করে যান। প্রমথনাথ এ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেন নি।

লালমোহনের বক্তৃতায় আশ্চর্য রকম ফল হ'ল। এই সভানুষ্ঠানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল ভারতসচিব স্তলস্‌বেরি প্রায় দশ বৎসর পূর্বেকার—১৮৭০ সনের দেশীয়, পরে স্ট্যাটুটারি সিবিল সার্বিস সম্পর্কিত নিয়মাবলী পার্লামেণ্টে সদস্যদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপিত করলেন। ভারত সরকারকেও তিনি এই মর্মে আদেশ দিলেন যে, উক্ত ১৮৭০ সনে স্থিরীকৃত নিয়মাবলীর ভিত্তিতে যেন অবিলম্বে এই শ্রেণীতে ভারতবাসীদের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। বলাবাহুল্য কাজেও তাই হ'ল। এই শ্রেণী বা পদের সরকারী ভাবে নাম দেওয়া হ'ল স্ট্যাটুটারি সিবিল সার্বিস। ছাত্র সভার প্রথম সম্পাদক প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত ছাত্র নন্দকিশোর বসু সর্বপ্রথম এই সার্বিসের অন্তর্ভুক্ত হলেন। কিন্তু ভারত সভা যে এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। তাদের মূল দাবি : বিলাতে সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা-কালেই এ দেশে প্রধান প্রধান শহরে এই পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হোক। ভারতবর্ষীয় সভারও বরাবর ছিল এই দাবি। এ নিয়ে পরে কত কমিটি কমিশনই না গঠিত হয়। কিন্তু ভারতবাসীদের এ প্রস্তাব দীর্ঘকাল পরেও দেখি গ্রাহ্য হয় নি।

লালমোহন আরও কিছু দিন বিলাতে থেকে ভারতবাসীদের তৎকালীন অবস্থার বিষয় ব্রিটিশ জনসাধারণকে অবহিত করাতে প্রয়াসী হন। এই উপলক্ষে অন্তত দুটি সভায় তাঁর বক্তৃতাদানের কথা আমরা জানতে পেরেছি

—ল্যাম্বেরেথ এবং বার্মিংহামে। বার্মিংহাম শহরের বণিক সভার সম্মুখে তিনি বক্তৃতা দেন। প্রবাসকালে লালমোহন স্বদেশের হিতার্থে যে ধরনের কার্যে লিপ্ত হন তাকে স্বীকৃতি দিয়ে লালমোহনকে ফিরে আসার পর ভারত সভা একটি জনসভায় বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করলেন।

ভারত সভার কার্যকলাপ ঃ দ্বিতীয় পর্ব

স্ট্যাটুটারি সিবিল সার্বিস প্রবর্তিত হওয়ার বিষয় এই মাত্র উল্লেখ করা হ'ল। ভারতসভার অসন্তুষ্টির কথাও আমরা জানতে পেরেছি। সভা কিন্তু এবারেও নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে রইলেন না। ১৮৭৯, ৩ সেপ্টেম্বর ভারত সভার স্থায়ী সভাপতি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে এক বিশেষ জনসভা হ'ল। বিভিন্ন প্রস্তাবে এই বিষয়টি ঘোষিত হ'ল যে, স্ট্যাটুটারি সিবিল সার্বিস ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের আশা আকাঙ্ক্ষা কোনরূপেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। বিলাতে এইটি এবং অন্যান্য বিষয়ের আন্দোলন পরিচালনার জন্য একজন প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাবও গৃহীত হয় এই সভায়। সুরেন্দ্রনাথ মূল সিবিল সার্বিস সম্পর্কে আন্দোলন পরিচালনার জন্য দ্বিতীয় বার উত্তর ভারত পরিক্রমায় বার হন ১৮৭৯, ১২ ডিসেম্বর তারিখে। এ সময়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কালীশঙ্কর শুকুল। কৃষ্ণকুমার আত্মজীবনীতে এবারকার উত্তর ভারত পরিক্রমার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধু জনমত গঠনই নয়, স্থায়ীভাবে আন্দোলন পরিচালনার নিমিত্ত উত্তর ভারতে এবং বঙ্গের অভ্যন্তরে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই দশকের (১৮৭১-১৮৮০) বিবিধ অনুষ্ঠানের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। রাজনৈতিক এবং অ-রাজনৈতিক নানা গঠনমূলক প্রচেষ্টা এর মধ্যে পড়ে। একটি অধ্যায়ে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজসেবা মূলক বহু প্রযত্নের বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। কেশবচন্দ্র ধর্মনেতারূপে সাধারণ্যে পরিচিত হলেও গঠনমূলক কার্য সমূহে তাঁর উদ্যোগ ছিল অনন্যসাধারণ। ঠিক রাজনীতি এর আওতায় না পড়লেও জাতিকে সুস্থ সংহত ও বলীয়ান করার পক্ষে এগুলি ছিল অত্যন্ত হিতকারী। কেশবচন্দ্র মূলতঃ ধর্মনেতা। তিনি ঐ সময়কার আরও কয়েকজন ধর্মনেতাকে সাধারণের সমক্ষে এনে ধরলেন, যাঁদের দ্বারাও আমরা সমধিক শক্তিমান হয়ে উঠি।

এই সময়ে কিন্তু আর একটি বিষয়ের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায়ের জাতিগঠনমূলক বহুমুখী প্রয়াস সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ লোকে, এমন কি শিক্ষিত সাধারণেও তাঁর কথা প্রায় ভুলতে বসেছিলেন। এই দশকের শেষ দিকে রামমোহন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আবার আলোচনা পর্যালোচনা শুরু হয়। কিছু পূর্ব থেকে রামমোহনের গ্রন্থাবলী প্রথমে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও রাজনারায়ণ বসুর যুগ্ম সম্পাদনায় এবং আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর একক রাজনারায়ণের সম্পাদনায় বের হতে শুরু হয়। ভারত সভার অন্যতম প্রধান সভ্য ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহন জীবনী লিখলেন। দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্ম সমাজ এবং কেশব বিরোধী ব্রাহ্মগণ এই সময়ে সভা সমিতির মাধ্যমে রামমোহনের কীর্তিকলাপ স্মরণ মননে প্রবৃত্ত হন। এর ফলে রামমোহন পুনরায় সাধারণের গোচরে এলেন, একে পুনরাবিষ্কারও বলা যেতে পারে। এই যুগের এবং পরবর্তী কালের রামমোহনের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাতিগঠনমূলক বিবিধ প্রচেষ্টা নানা দিক থেকেই আমাদের দিগ্‌দর্শন হয়ে ওঠে। কোন কোন মনীষীর মতে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন রামমোহনের প্রকৃত উত্তর সাধক।

যে দু' জন মহামনা ব্যক্তিকে কেশবচন্দ্র সেন এই সময়ে বঙ্গের শিক্ষিত সাধারণের গোচরে আনেন তাঁদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-১৮৮৩) নাম। কাথিয়াওয়াড়ে তাঁর জন্ম। কিন্তু তিনি কর্মস্থল করে নেন পঞ্জাব তথা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে।

দয়ানন্দ ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতেন। উর্দুকেও ক্রমে তিনি প্রচারের মাধ্যম করে নেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ আর্য-সমাজ নামে সুবিখ্যাত। হিন্দু ধর্মের মূল সত্য সাধারণের সমক্ষে ধরলেন তিনি। হিন্দু ধর্ম ও সমাজের মধ্যে যতবিধ অনাচার অবিচার ও গলদ প্রবেশ করে এবং তার ফলে নব্য শিক্ষিতদের নিকট এর বিস্তর নিন্দামন্দ হয়। দয়ানন্দ দৃঢ়ভাবে এ সবের বিদূরণে সচেষ্ট হলেন, আর হিন্দু ধর্মের সার ও চিরন্তন সত্যকে তাদের সম্মুখে যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত করলেন। ঐ অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজ ক্রমে তাঁর অনুবর্তী হয়ে ওঠেন।

দয়ানন্দ বেদকে অভ্রান্ত বলে গণ্য করতেন। দয়ানন্দের ধর্ম প্রচারের মূল ভিত্তিই ছিল বেদ। এইজন্য সাধারণ শিক্ষিতদের মত জনসাধারণও তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ব্যাখ্যার দিকে আকৃষ্ট হলেন। আজ হয়তো অনেকের নিকট আশ্চর্য ঠেকবে, কিন্তু ঐ যুগেও তিনি আদৌ ইংরেজী শেখেন নি। সংস্কৃত ও উর্দু ভাষাই তাঁর ধর্ম ব্যাখ্যার বাহন ছিল। আর দয়ানন্দের এই নব প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজের সর্ব ভারতীয় রূপ পেতেও বেশী বিলম্ব হল না। দয়ানন্দ মূলতঃ ধর্ম নেতা, কিন্তু তাঁর যাবতীয় প্রচেষ্টার মূলেই জাতীয় উন্নতির সূত্র লক্ষ্য করি। আর তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ শীঘ্র তাঁর উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। রাজদ্বার তখন নব্য শিক্ষিতদের নিকট ছিল প্রায় রুদ্ধ। তাঁরা দয়ানন্দের মত এক ধর্মনেতার শিক্ষাগুণে আত্মোন্নতির প্রয়াসে স্বাবলম্বনকেই প্রধান উপায় বলে গ্রহণ করলেন। যে আত্মবিশ্বাস এতদিনে প্রায় শূন্যে গিয়ে পৌঁছেছিল তা আবার তাঁরা ফিরে পেলেন, এক-ভ্রাতৃত্ব ও এক-জাতীয়ত্ব সূত্রে পরস্পর গ্রথিত হলেন। দয়ানন্দ তথা আর্য-সমাজের প্রভাবে লালা হংসরাজ, লালা লজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (পূর্ব নাম লালা মুন্সীরাম) প্রমুখ নেতৃবর্গ ভারতে নবজাতিগঠনে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন। উত্তর ভারতের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম—সকল বিভাগেই দয়ানন্দের শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র এমন কি বহির্ভারতের নানাস্থানে আর্য-সমাজ কেন্দ্র সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায়।

কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে (১৮৩৬-৮৬) শিক্ষিত জনগণের সমক্ষে আনয়ন। কেশবচন্দ্র না থাকলেও যে এমনটি হত না তা হলফ্ করে বলা যায় না। তথাপি আমরা যতদূর জানি, কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই কার্যে ব্রতী হন। 'ইণ্ডিয়ান মীরর' এবং 'সুলভ সমাচারে' প্রায় সমসময়ে দক্ষিণেশ্বরের সাধক পরমহংসদেব সম্বন্ধে লেখা প্রকাশ করেন। তদবধি শিক্ষিত মানুষ তাঁর দিকে ক্রমে আকৃষ্ট হতে থাকেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট এ সময় বাঙালী তার মনের কথা নিবেদন করতে ব্যস্ত। উচ্চশিক্ষিত হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান তাঁর অমৃত মধুর বাণী শোনবার জন্য শহরের কর্মকোলাহল থেকে দক্ষিণেশ্বরের আম্র কাননে নিরালায় ছুটে চলেছে। যে পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় শিক্ষিত বাঙালীর নিকট প্রায়

অর্ধ-শতাব্দী যাবৎ হয়ে রয়েছে অবজ্ঞেয় তাঁদেরই একজন এই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁরই কাছে শিক্ষিত সমাজের ধরনা দেওয়া কম বিস্ময়ের বিষয় নয়। কিন্তু এ-ই তখন ঘটেছিল। বাঙালীকে রামকৃষ্ণদেব আশার কথা শোনালেন। নব্য শিক্ষিতদের নিকট তখন পৌত্তলিকতা আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না। নানা কারণে এটিকে একটি কুসংস্কার বলে তাদের ধারণা হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা রামকৃষ্ণদেবের আচরণের মধ্যে এর সার্থকতা ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন। হিন্দু, খ্রীষ্টান বা মুসলমান—সকল ধর্মই সমাজ পূজ্য, সকল ধর্মেই সার সত্য নিহিত, তিনি 'নিজে আচরি ধর্ম' পরকে এ কথা শেখালেন। সকলের প্রতি সকলের, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের প্রেমপূর্ণ ভ্রাতৃভাব প্রদর্শনে ধর্মের দিক দিয়েও কোন বাধা নেই—পরমহংসদেবের এই বাণী ধর্ম বাহুল্য পীড়িত ভারতবাসীর দেহে বিদ্যুৎ-বেগে শক্তি সঞ্চার করল। জাতির জীবনে ঐক্যবোধ সৃষ্টিকল্পে শিক্ষিত জনের মহৎ প্রচেষ্টা পরমহংসদেবের মঙ্গল হস্ত স্পর্শে শুদ্ধসত্তা লাভ করল। আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী রামকৃষ্ণের গৃহদ্বার সকলের নিকট মুক্ত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত সে যুগের গুণীমানী সকলেই তাঁর শক্তিতে মুগ্ধ। রাজদ্বারে লাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষাপূরণে অসমর্থ শিক্ষিত সমাজ এই নিরক্ষর গ্রাম্য পুরোহিতের নিকট শক্তির সন্ধান পেলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, পূর্ব নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩-১৯০২), পরমহংসদেবের শিক্ষা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ধর্মে রূপান্তরিত করেছেন। আজ কিন্তু উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের হৃদয়েই পরমহংসদেবের স্থান দৃঢ়নিবদ্ধ।

নরেন্দ্রনাথ ব্যতীত ঐ যুগের বহু কিশোর ও যুব-ছাত্রও পরমহংসদেবের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এর একটি বড় রকমের দৃষ্টান্ত মেলে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউর' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে। তিনিই, যতদূর জানা যায়, প্রথম রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী 'ব্রহ্ম বন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত করেছিলেন। এর অন্যূন দশ বৎসর পরে তৎ সম্পাদিত 'প্রদীপ' মাসিক পত্রে শ্রীম লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রথম অংশত বার হয়েছিল।

এ সময়কার আর এক জন মহীয়সী নারীর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। তিনি হলেন হেলেনা পেট্রনভা ব্লাভাট্‌স্কি (১৮৩১-৯১)। জাতিতে জার্মান হলেও তাঁর পিতৃপুরুষেরা বহু পূর্বে রুশিয়ায় বসতি স্থাপন করেন এবং নানা বিষয়ে রুশ বনিয়া যান। ব্লাভাট্‌স্কি নামটিতেও এর যাথার্থ্য সুপ্রকাশ। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি নানা দেশ পর্যটন করেন। শেষে, জনশ্রুতি, তিনি তিব্বতী সাধুর নিকট দীক্ষা নেন। ব্লাভাট্‌স্কি থিওসফি বা অধ্যাত্ম বিদ্যার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। শোনা যায় তিব্বতী সাধু মাদাম ব্লাভাট্‌স্কিকে ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম বিদ্যার কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেন। এরই ফলে ব্লাভাট্‌স্কি মাদ্রাজস্থ আডিয়ারে বিশ্ব থিওসফিকাল সোসাইটি নামে অধ্যাত্ম বিদ্যা অনুশীলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৯)। এই সোসাইটি কোন বিশেষ ধর্ম প্রচার না করে সদস্যগণকে তাদের নিজ নিজ ধর্মে আস্থাবান হবার জন্য উপদেশ দিতেন। সোসাইটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষে বিশেষ সচেষ্ট হন। একদিকে যেমন স্বামী দয়ানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অন্যদিকে তেমন মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির উপদেশ ও শিক্ষা এই সময়ে বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী ভারতবাসীদের মনে এক জাতীয়ত্ব বোধের শুধু উন্মেষই নয়—এর মূলও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। রাজনৈতিক দিক দিয়েও এর সার্থকতা যথেষ্ট। আর এই সময়ে জাতীয় আন্দোলনের মূলে এ সব বিশেষ রসদ যোগায়। আশির দশকের প্রথম দিকে এই আডিয়ারে সম্মিলিত হয়েই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভাবী কংগ্রেসের পরিকল্পনা করেছিলেন। এলান অক্টাভিয়ান হিউম প্রস্তাবিত ও পরিপোষিত জাতীয় কংগ্রেসের ঐখানেই জন্ম হয় বলা চলে।

সুবিখ্যাত অ্যানি বেসাণ্ট মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির নিকট অধ্যাত্ম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁরই অনুপ্রাণনায় বেসাণ্ট ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারতবাসীর কল্যাণ কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দেন। তিনি পরে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হয়েছিলেন। আমাদের মুক্তি আন্দোলনে বেসাণ্টের কৃতিত্ব কতখানি তা পরে বিশদভাবে জানা যাবে।

ব্লাভাট্‌স্কি প্রসঙ্গে আরও কিছু এখানে বলা প্রয়োজন। বঙ্গদেশে বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীদের নিয়ে অধ্যাত্ম বিদ্যা অনুশীলনেরও সূচনা হল থিওসফিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসময়ে। এখানে এর একটি শাখা কেন্দ্র স্থাপিত

হ'ল। এই কেন্দ্রের সভাপতি হলেন ডিরোজিও শিষ্য বিবিধ কল্যাণ কর্মে রত সাহিত্য সাধক বর্ষীয়ান প্যারীচাঁদ মিত্র। এবং এর সম্পাদকের কার্যভার ন্যস্ত হল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর। আর একটি ব্যাপারও লক্ষনীয়। ব্লাভাট্স্কি নারী, তাই মহিলা সমাজের মধ্যেও তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত করে এবং তাঁরা জাতি গঠনমূলক নানা কার্যে ব্রতী হন। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় দেবেন্দ্রনাথ কন্যা সাহিত্য কর্ম রত এবং পরে "সাহিত্য সম্রাজ্ঞী" বলে আখ্যাত স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম। উক্ত আশির দশকের মাঝামাঝি নাগাদ ব্লাভাট্স্কির সঙ্গে কোন কোন নারী পুরুষের অনেক বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটে। ভিন্ন মতাবলম্বী মহিলাদের নিয়ে স্বর্ণকুমারী সখী সমিতি স্থাপন করলেন। সেবার মূল উৎস ও অনুপ্রেরণা আসে কিন্তু ব্লাভাট্স্কির নিকট থেকে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর এই দশকের শেষ নাগাদ যে ক'জন মহিলা দর্শক বা প্রতিনিধিরূপে এতে যোগ দেন তাঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী ছিলেন অন্যতমা।

স্বামী দয়ানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং সঙ্গে সঙ্গে মাদাম ব্লাভাট্স্কির ব্যক্তিগত উপদেশ ও শিক্ষায় আশাহত ভারতবাসী যখন আশান্বিত—এই কল্যাণ মুহূর্তে ভারত সভা নূতন কর্মধারা জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করলেন। এতদিন সভার প্রচেষ্টা ব্রিটিশের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল—বলাবাহুল্য ব্রিটিশ ছলাকলা এর দ্বারা তেমন প্রতিহত হতে পারেনি। ভারত সভা এ সময় থেকে গঠনমূলক কাজে অভিনিবিষ্ট হলেন। আশির দশকে এর সুযোগও মিল্‌লো যথেষ্ট। এই বিষয়টিই এখন একটু বলি।

রাজনৈতিক কার্য ব্যতিরেকে অপরাপর কোন কোন দিকেও সভা আলোচ্য দশকের শেষ দিকেই মন দিয়েছেন দেখতে পাই। এর একটির কথা এখানে আগে উল্লেখ করি। সভার পক্ষে কালীশঙ্কর শুকুল প্রমুখ ভারত সভার কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন অঞ্চলে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগলেন। সুরেন্দ্রনাথ একে গঠনমূলক বিষয় বলে অভিনন্দিত করেন। উচ্চতর শিক্ষার দ্বার সাধারণের নিকট তখনও প্রায় অর্গলবদ্ধ। ভারত সভার প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ-মোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একযোগে সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। দুই বৎসর পরে ১৮৮১ সনে এটি

কলেজ বিভাগে উন্নীত হয়। অতঃপর এর নামও হয় সিটি কলেজ। সুরেন্দ্রনাথ এই বিদ্যায়তনের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত হন প্রতিষ্ঠাবধি। তিনি এ সময়ে মেট্রোপলিটন কলেজের সঙ্গে সংস্রবও ত্যাগ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এককভাবে প্রেসিডেন্সি স্কুল বা ইনস্টিটিউশান নামে আর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার নেন ১৮৮২ সন থেকে। বড়লাট রিপনের ভারত ত্যাগের পর ১৮৮৪, ডিসেম্বর মাসে এটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয় এবং তিনি এর নাম দেন বড়লাট রিপনের নামে রিপন কলেজ। এখানে আর একটি কথাও বলে রাখি। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্ব নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে এর পরিচালনা ও সম্পাদনা ভারও নিজে গ্রহণ করলেন। এ কাগজখানি অবিলম্বে ভারত সভার মুখপত্র হয়ে উঠল। শিক্ষামূলক কার্যাদির সঙ্গে এখানে আর একটি কথাও উল্লেখ করা ভাল। ভারত সভার কোন কোন সভ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা জনশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছেন ইতিপূর্বেই। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বিষয়ক অনুসন্ধানের নিমিত্ত সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এর সভাপতি হন স্যর ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার (বিখ্যাত দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্ গ্রন্থ প্রণেতা)। এই কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হলেন আনন্দমোহন বসু এবং স্যর সৈয়দ আহ্‌মেদ খাঁ। কমিশনের নির্দেশাবলী এদেশের জন-শিক্ষার নূতন পথ নির্ধারণ করে দিল।

আমরা কথা প্রসঙ্গে আশির দশকেই এসে পড়েছি। বস্তুত এই দশকের প্রথম দিক্‌কার কার্যকলাপই এখন আলোচ্য। রক্ষণশীল দল বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির জন্য ব্রিটেনেই বিশেষ ভাবে ভর্ৎসিত হতে থাকেন। আর এ বিষয়ে সরকার বিরোধী উদারনৈতিক দল হয়ে উঠলেন খুবই সোচ্চার। ভারতবর্ষে প্রশাসনিক স্বৈরাচার এই দলের অন্যতম প্রধান নিন্দার কারণ হয়ে উঠেছিল। এ জন্য মুখ্যত দায়ী করা হয় ডিজরেলি পরিচালিত রক্ষণশীল দলকে। গ্লাডস্টোনের নেতৃত্বে উদারনৈতিক দল এইবারই প্রথম ভারতবর্ষকেও তাদের দলীয় বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। বলতে কি এমনটি ইতিপূর্বে আর কখন ঘটে নি। আমরা দেখেছি, লালমোহন ঘোষের সার্থক প্রচেষ্টার মূলেও উদারনৈতিক দলের সাহায্য ছিল অনেকখানি।

পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই বিলাতে সাধারণ নির্বাচনের সাড়া পড়ে যায়। ভারতের হিতকারী উদারনৈতিক দলের সপক্ষে নির্বাচন কালে সাহায্যের জন্য ভারত সভা লালমোহন ঘোষকে বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। লালমোহন নির্বাচনী বক্তৃতা দিতে লাগলেন। গ্লাডস্টোন তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রে ভারতবর্ষের প্রশাসনিক স্বৈরাচার নিয়ে এক প্রস্ত বক্তৃতা দিলেন। মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন, শিল্প ও বাণিজ্য নীতি, আফগান যুদ্ধ তথা ভারত-কেন্দ্রিক বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি ছিল এই সমুদয় বক্তৃতার বিষয়ীভূত। ইতিপূর্বে ব্রিটেনের কোন রাজনৈতিক দলকেই এমন বিপুল ভাবে ভারতবর্ষের সপক্ষতা করতে দেখা যায় নি। নির্বাচনে উদারনৈতিক দলের জয় হ'ল। গ্লাডস্টোন প্রধান মন্ত্রীরূপে মন্ত্রীসভা গঠন করলেন (জুন, ১৮৮০)। এর অব্যবহিত পরেই তিনি ভারত শাসনে মৌলিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে উদারচেতা লর্ড রিপনকে ভারতবর্ষে বড়লাট করে পাঠালেন। এদেশে এসে রিপনের প্রথম কার্য হ'ল দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন তুলে দেওয়া।

প্রতিষ্ঠাবধি ভারত সভাকে রক্ষণশীল দলের ভারত সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাদির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকতে হয়। এই নিমিত্ত সাধারণ ও বিশেষ সভা, বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ, ভারতে প্রশাসনিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা ইত্যাদি কার্যে সভা কর্তৃপক্ষ লিপ্ত ছিলেন। বিলাতে উদারনৈতিক দলের নির্বাচনে জয়লাভ এবং উদারনৈতিক মন্ত্রীসভা গঠন ভারতে রিপনের উপস্থিতি প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে ভারত সভার নেতৃবৃন্দ গঠনমূলক অত্যাবশ্যক বিবিধ কার্যে হস্তক্ষেপ করলেন। ভারত সভার মূল দাবি : এ দেশে শাসন সৌকর্যার্থে প্রতিনিধি সভা—যার মাধ্যমে পার্লামেন্টীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে জন প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় পৌরসভা এবং জেলা বোর্ড প্রভৃতির কার্য পরিচালনের অভিজ্ঞতা অর্জিত হওয়া আবশ্যক। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় স্বায়ত্ত শাসন। এই ছিল তখনকার দিনে কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন। রিপন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে এই প্রাথমিক উদ্যোগের সারবত্তার কথা ঘোষণা করলেন। ভারত সভাও বসে রইলেন না। মূল

উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে ভিত্তি স্বরূপ স্বায়ত্ত শাসনকেই, যা তখন সামান্য মাত্র জন প্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত ছিল, তাকে সম্প্রসারিত করে এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে সচেষ্ট হলেন। নেতৃবৃন্দ প্রথমাবধিই জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয়ে সভা সমিতি বক্তৃতা ও পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশের দ্বারা রাজনৈতিক বিষয়ে অবহিত করতে যত্ন নিয়েছিলেন। এবারেও তারা বিভিন্ন মফস্বল শহরে ও গঞ্জে সাধারণ সভার অধিবেশনাদি করে রিপন ঘোষিত স্বায়ত্ত শাসন সম্প্রসারণের প্রস্তাবটি সাগ্রহে সমর্থন জানালেন। ভারত সভা প্রথমাবধিই বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে যে সকল আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন তার সপক্ষে জনমত গঠনে বিশেষ ভাবে মন দেন। সিবিল সার্বিস প্রশ্ন সম্পর্কে ভারত ব্যাপী জনমত গঠন প্রয়াস ইতিপূর্বে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি। সর্বভারতীয়ই হোক অথবা স্থানীয় বা প্রাদেশিকই হোক এইরূপ জনমত গঠন ছিল সভা কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান কার্য। এবারেও দেখি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ক প্রস্তাবের সপক্ষে তাঁরা জনমত গঠনে বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারত সভার নেতৃস্থানীয় কর্মীবৃন্দ বঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করেন এবং স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার আশু এবং পরবর্তী সুফল সম্বন্ধে সভা সমিতির মাধ্যমে সাধারণের নিকট এর কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেন। এই উদ্দেশ্যে তারা যে সব স্থলে যান তার মধ্যে ছিল বর্ধমান, কালনা, কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া, আড়িয়াদহ, বারাকপুর, হালিশহর, কোন্নগর, বৈদ্যবাটী, গোরিফা, রিষড়া প্রভৃতি। জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ফলে জনমত গঠনই শুধু নয়, জনমত নিয়ন্ত্রণও বিশেষ সম্ভব হয়েছিল এর দ্বারা। এইরূপ আন্দোলন ও আলোচনার দরুন রিপন প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুযায়ী জেলাবোর্ড, ও মিউনিসিপ্যালিটি গঠনে নির্বাচন প্রথা বহুল পরিমাণে চালু হয়।

অল্পকালের মধ্যেই সম্প্রসারিত নির্বাচন প্রথায় মিউনিসপ্যালিটি গঠিত হতে শুরু হয়। এর সদস্যবর্গ যেমন মুখ্যত করদাতাদের ভোটে নির্বাচিত হতে থাকেন তেমনি নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটে চেয়ারম্যান বা সভাপতিও হতেন। রিপনের প্রস্তাব সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথা বহুল পরিমাণে চালু হ'ল। ডিষ্ট্রিক্ট বা জেলা বোর্ড গঠনে পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হ'ল।

জেলার প্রতিটি মহকুমায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে লোকাল বোর্ড গঠিত হয়, যদিও ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। লোকাল বোর্ড গঠনের পর তার সদস্যগণ জেলা বোর্ডের নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য মনোনয়ন করে পাঠাতেন। এইরূপে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হ'ল স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনে। এখানে জেলা বোর্ড গঠন সম্পর্কে আর একটু বিশদ করে বলি। ধরুণ, একটি জেলায় চারটি মহকুমা। মহকুমা পিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যকে জেলা বোর্ডে পাঠানো হ'ত। এ ছাড়া সরকারও কতক সদস্য মনোনীত করতেন। এই দুই প্রকার সদস্যের দ্বারাই জেলা বোর্ড পুরাপুরি গঠিত হতে লাগল। কিন্তু একটি বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জেলা বোর্ডের গঠনতন্ত্র ছিল আলাদা। সরকার বরাবর জেলা বোর্ডের সভাপতি মনোনয়ন করতেন। এই প্রথা ১৯১৮ সনের পূর্ব পর্যন্ত চালু ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন যখন কার্যকরী হ'ল তখন কিন্তু বড়লাট রিপন কার্যভার ছেড়ে স্বদেশে ফিরে গিয়েছেন।

একটু আগেই বলেছি ভারত সভা গঠমমূলক প্রতিটি কার্যে সাধারণের মধ্যে সভা সমিতির মাধ্যমে সমর্থন সংগ্রহে উদ্যোগী হতেন। জনসাধারণ যাতে প্রতিটি ব্যাপারে সম্যক অবহিত হন এ জন্য সভা কর্তৃপক্ষের প্রয়াস ছিল অপরিসীম। এইরূপে জনমতের উপরে যেমন তারা ছিলেন নির্ভরশীল তেমনি জনমত গঠনেও ছিলেন সর্বদা সচেষ্ট। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, তথা জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি ছিল শুধু বঙ্গ প্রদেশের জন্য উদ্দিষ্ট। ভারতসভা যেমন নিখিল ভারতীয় বিবিধ বিষয় নিয়ে আন্দোলনে ব্যাপৃত ছিলেন তেমনি স্থানীয় ব্যাপারগুলি নিয়েও তাদের প্রচেষ্টা চলে সমান তালে। স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ক আন্দোলনকালে ভারত সভা কিন্তু মূল বিষয়টির কথা সর্ব সমক্ষে ধরে দিতেন। ভারতবর্ষের পার্লামেন্টীয় তথা প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন ছিল এই মূল বিষয়। স্বায়ত্ত শাসনের মাধ্যমে প্রতিনিধি মূলক শাসন ব্যবস্থার গোড়া পত্তন হতে থাকে। দৃঢ় ভিত্তির উপর যাতে উক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই সভা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারটিকে মনে প্রাণে সমর্থন করেছিলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যে মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনায় তারা লিপ্ত হয়েছিলেন, পরে তা আমরা দেখতে পাব।

এই দশকের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর একটি বিষয়ের দিকেও সরকার মন দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এ বিষয়টিতেও বড়লাট রিপনের আগ্রহ ও তৎপরতা ছিল যথেষ্ট। এটি হ'ল ভূমিতে প্রজাস্বত্ব নিরূপণ। রিপনের ভারত ত্যাগের অব্যবহিত পরে পূর্বেকার আন্দোলন আলোচনা পর্যালোচনার ফলশ্রুতি : বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। ভূমিতে প্রজার তথা সাধারণ লোকের স্বত্ব নির্ণয় কল্পে প্রচেষ্টা চলে যুগ যুগ ধরে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার তথা ভূস্বামীগণের বেশী করে উপকার হয়েছে, ভূমিতে যাদের সত্য সত্য অধিকার তারা প্রায় বঞ্চিতই রয়ে গেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভূস্বামী ও প্রজার যে অবস্থা দাঁড়ায় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই রামমোহন এইরূপ উক্তি করেছিলেন। এর পর পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে জমিদার ও প্রজার ভিতরকার ভূমি সম্পৃক্ত সম্বন্ধ নির্ণয়ের একাধিক প্রয়াস লক্ষ্য করি। বড়লাট ক্যানিং-এর দশম আইন (১৮৫৯) দ্বারা প্রজার উপর জমিদারের অধিকারগুলি কিছু কিছু খর্ব করা হয়। সরকার পাট্টা ও কবুলিয়তের ব্যবস্থা করে প্রজার খানিকটা হিতসাধন করলেন। কিন্তু এতেও প্রজার দুঃখ কষ্ট বিশেষ নিবারিত হয়নি। বঙ্গের ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্বেলও ১৮৭২ সালে কৃষকের অবস্থা পর্যালোচনা করে গবর্ণমেণ্টে এক মন্তব্যলিপি পেশ করেন।

বৎসর খানেকের মধ্যেই পাবনায় প্রজা বিদ্রোহ ঘটে। তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি প্রজার অবস্থার দিকে বিশেষ ভাবে পড়ল। ভূমিতে কৃষকের স্বত্ব নির্ধারণের মৌল বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার কৃষক নিবন্ধাবলীতে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তও এ বিষয়টি নিয়ে লেখনী ধারণ করেন। পূর্বেই আমরা এ সব কথা উল্লেখ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র পরে এ কথাও লিখেছেন যে, প্রধানত তারই আলোচনার ফলে সরকার কৃষকদের সম্পর্কে আইন করতে অগ্রসর হন। বড়লাট রিপন ১৮৮০ সনে সরকারী স্তরে ভূমিস্বত্ব নিরূপণকে ভিত্তি করে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক নির্ণয়কল্পে উদ্যোগী হলেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। বঙ্গ প্রদেশ এবং মাদ্রাজের কোন কোন অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ছিল।

বিশেষ করে বঙ্গ প্রদেশে, অর্থাৎ, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার ভূমি ব্যবস্থা নিয়েই আইন প্রবর্তিত হয়। তাই এর নাম করণ হয় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বা "Bengal Tenancy Act."

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের আলোচনাকালে ভারতসভার কর্মীবৃন্দ এর সপক্ষে বাঙলার বিভিন্ন শহরে ও গঞ্জে জনসভা অনুষ্ঠান করেছিলেন। রিপন প্রস্তাবিত ভূমি সংস্কার আইনের সপক্ষেও তাঁরা জোর আন্দোলন উপস্থিত করলেন। উদ্দেশ্য ছিল দু'টি—প্রজাসাধারণ তথা কৃষক সমাজকে নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা। এবং দ্বিতীয়ত, জনসংযোগ স্থাপন করা। আগেই বলেছি ভারত সভা জনসাধারণের সঙ্গে বিভিন্ন হিতকারী বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। এর ফলে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণও সম্ভব হয়েছিল খুবই। সভা কর্তৃপক্ষ সরকারী প্রস্তাবটিকেও প্রজা সাধারণের অধিকতর উপযোগী করার জন্যও সচেষ্ট হলেন। যে যে উপায় এ নিমিত্ত তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন তার মধ্যে একটি হল সরকারী খসড়া বিলের ধারাওয়ারী আলোচনা। এই আলোচনা সম্বলিত একটি স্মারকলিপি রচনায় তারা অবিলম্বে মন দিলেন। স্মারকলিপি সম্বন্ধে একটু পরে বলছি।

ভারত সভা কর্তৃক জন সংযোগ স্থাপনের দৃষ্টান্ত আগেই আমরা পেয়েছি। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যাপারটি নিয়ে সভার নেতৃবর্গ এবং কর্মীবৃন্দ বঙ্গের নানা স্থানে—শহরে ও মফস্বলে সাধারণ সভাদি অনুষ্ঠান করেন এবং জনসাধারণ এতে বিশেষ উৎসাহ দেখান। আলোচ্য ভূমি সংস্কার বিষয়টি নিয়েও তাঁরা সভাসমিতির মাধ্যমে জনসংযোগ স্থাপনে অগ্রণী হন। এই উদ্দেশ্য সরকারী অভিপ্রায় ঘোষিত হওয়ার পর (জুলাই ১৮৮০) কর্মীবৃন্দ একদিকে যেমন তাঁরা সভার সুচিন্তিত অভিমত একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে সরকারকে জানাতে অগ্রসর হলেন অন্যদিকে তেমনি কাল বিলম্ব না করে নানাস্থলে কৃষক-সভা প্রতিষ্ঠায়ও মন দিলেন। শেষোক্ত বিষয়ে, অর্থাৎ কৃষক সভার মাধ্যমে জনমত গঠনেও সবিশেষ তৎপর হন। কলকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) বিভিন্ন জেলার কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হয়। এর পর থেকে বিভিন্ন জেলায় গ্রামে গঞ্জে কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। এই সভায় কলকাতার সন্নিকটস্থ ও দূরবর্তী

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক প্রতিনিধিগণ সাগ্রহে ও সোৎসাহে যোগদান করেন। ভারত সভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক আয়োজিত এই সভায় কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। এরপর তাঁরা মফস্বলে গিয়ে বিভিন্ন জেলার গ্রামে ও গঞ্জে কৃষক সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায়ও নেতৃবর্গের অনেকে উপস্থিত হন এবং কৃষকদের উন্নতির উপায় নিয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা করতে থাকেন। কৃষকদের মধ্যে এত উদ্দীপনা দেখা দেয় যে সভাগুলিতে দশ হাজার থেকে বিশ হাজার পর্যন্ত কৃষক গ্রামবাসীরাও যোগ দেন। এই সকল সভা অনুষ্ঠানে ভারত সভার সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সবিশেষে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কালীশঙ্কর শুকুল, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নিকটে ও দূরে বহু কৃষক সমাবেশে বক্তৃতা দেন। কোন কোন স্থলে আনন্দ মোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়ে প্রজাকুলের সমস্যাদির সম্বন্ধে বক্তৃতাদানে লিপ্ত হতেন। এইরূপে পল্লীর কৃষক তথা জনসমাজের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। শুধু কৃষক শ্রেণীর আর্থিক উন্নতিই নয়, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিষয়ের কথা বক্তারা ঐ সকল সভা সমিতিতে উত্থাপন করতেন।

ইদানীং "দাবি" কথাটির বড় চল। তখন বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকল্পে দাবির ধুয়া ওঠে নি। ব্যক্তিগতই হোক বা শ্রেণীগতই হোক প্রত্যেকেরই দাবি দাওয়ার মধ্যে যে কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনও নিহিত রয়েছে সভা কর্মী-বৃন্দের বক্তৃতাদিতে ঐ যুগেও এ সকল বিষয়ের দিকে জনসাধারণের তথা কৃষক সমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাতির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে বিবিধ উপায়ে ভূমির মালিকানা সমস্যার সমাধানও যে একান্ত আবশ্যক এ কথাও সরল ভাষায় তাঁরা ব্যক্ত করলেন। ভূমি কেন্দ্রিক আন্দোলনের প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেই সূচনা। ভূমি বণ্টন বর্তমান কালে একটি বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। ভারত সভা প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তখন ভূমিতে প্রজার স্বত্বস্বামিত্ব নিরূপণই ছিল এ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। সরকারী প্রস্তাব এ বিষয়ে নেতাদের বিশেষভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল তা অবশ্যই স্বীকার

করতে হয়। সরকারী প্রস্তাব প্রকাশের পর এর উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা পর্যালোচনা শুরু হয়। আশ্চর্যের বিষয় এক সময়ে যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা শ্রেণী সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর মুখপাত্ররূপে কার্য করেছিলেন তারা এবারে প্রজাসাধারণের হিতকারী ঐ প্রস্তাবটির প্রতি স্তরে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বিরোধিতা করতে উদ্যত হন। ফল কি দাঁড়ায় তা আমরা একটু পরেই দেখতে পাব।

ভারত সভার নিকট থেকেও সরকার উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত যাজ্ঞা করেছিলেন। সভা কর্তৃপক্ষ একটি স্মারকলিপিতে নিজ মতামত গ্রথিত করে সরকারের নিকট পাঠান। সরকার এই প্রস্তাব সম্পর্কে জনমত সংগ্রহ করে এর ভিত্তিতে আইন প্রণয়নে ইচ্ছুক ছিলেন। একটি বিষয়ে তার কতকটা প্রমাণও পাওয়া যায়। আর এর দ্বারা বুঝা যায় ভারত সভার অভিমতের উপরে তারা বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন সভার অভিমত প্রেরণে বিলম্ব হওয়ায় সরকার পক্ষে আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী (পরে বঙ্গের ছোট লাট) এক সন্ধ্যায় সভা কার্যালয়ে গমন করেন এবং তাদের স্মারকলিপি মুদ্রণের অপেক্ষা না রেখে এর একটি কাটা প্রুফ নিয়ে গেলেন। ভারত সভার মুদ্রিত স্মারকলিপি পাঠান হয় ১৮৮১ সনের ২৭শে জুন তারিখে। এই স্মারকলিপিতে যে ভূমি সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ভূমিতে প্রজার স্বত্বাধিকার স্থায়ী হলে দেশ ও দেশবাসীর সর্ববিধ উন্নতি এবং বিপরীত ক্ষেত্রে ভূমির উন্নতি তথা কৃষক সাধারণের উন্নতিও যে অসম্ভব নানা তথ্যের দ্বারা স্মারকলিপিতে তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। চট্টগ্রামের কোন কোন অঞ্চলে ভূমিতে প্রজার স্থায়ী স্বত্ব থাকায় সেখানকার কৃষকগণ তুলনায় স্বচ্ছল। ভূমির উৎকর্ষ সাধনের দিকে তাদের দৃষ্টি রয়েছে সর্বাধিক। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। যেমন কৃষক শ্রেণীর তেমনি জনসাধারণের, এক কথায় সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোও সুদৃঢ় হয়। ভূমির স্থায়ী স্বত্ব কোন কোন স্থলে যে কতখানি আবশ্যক তারও উল্লেখ করা হয় এই স্মারকলিপিতে। বাখরগঞ্জ জেলায় শুপারীর চাষ ব্যাপক। কিন্তু এক একটি শুপারী গাছের ফলবান হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় আবশ্যক। ভূমিতে স্থায়ী

স্বত্ব না জন্মালে কারো পক্ষেই অনিশ্চিৎ অবস্থায় এই অর্থকরী চাষেও প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। সভা বলেন, এ কারণে কৃষক বা প্রজার ভূমিতে স্থায়ী স্বত্ব থাকা দরকার। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কৃষকের ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার থাকা চাই। এ বিষয়টির উপর স্মারকলিপিতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়—সকল অবস্থায় কৃষক তার জমিদারের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই জমি ক্রয় বিক্রয় করবার অধিকারী হবেন। জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকারকে খর্ব করার অনুকূলেও এই স্মারকলিপিতে জোরালো মত প্রকাশ করা হয়।

ভারত সভার মত অপরাপর প্রতিষ্ঠান যেমন, ভারতবর্ষীয় সভা অনুরুদ্ধ হয়ে সরকারের নিকট নিজ নিজ অভিমত লিখিতভাবে পেশ করেন। এই সমুদয় বিচার-বিবেচনার জন্য সরকারী স্তরে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হল। এতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করা হয়। যে সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা গিয়েছিল তা হয় নি। কমিটির কার্য নানা বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। ইতিমধ্যে বড়লাট রিপন ১৮৮৪ সনে কর্মত্যাগ করে বিলাতে চলে যান। কমিটির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আইন বিধিবদ্ধ করতে আরও কিছু সময় লাগে। ১৮৮৫ সন নাগাদ আইন পাস হল। এ অহৈনের নামকরণ হয় বেঙ্গল টেনানসি এ্যাকট (Bengal Tenancy Act) বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। ভূমি স্বত্ব আইন প্রগতি পন্থীরা যেরূপ আশা করেছিলেন তেমনটি হয়নি। তবে এটিকে এই দিক দিয়ে মন্দের ভাল বলা যায় যে, ভূমিতে প্রজার স্বত্ব-স্বামিত্ব অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করে। আগে বলেছি রিপন ভারতবর্ষে এসেই সর্বপ্রথম বহু-নিন্দিত দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন প্রত্যাহার করে নেন। অস্ত্র আইন সম্পর্কে তিনি প্রথমে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। অল্পকাল মধ্যেই রিপন কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। এও যেমন, তেমনি অন্য কোন কোন ব্যাপার নিয়ে এতটা বিতর্কের ঝড় ওঠে যে তার জন্য রিপনকে বেশ বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। একথা পরে বলছি। রিপনের আর একটি প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা দরকার। যে সব কারণে সিবিল সার্বিস সম্পর্কিত বিধি নিষেধ শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে এতদিন বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত করে তার নিরসন কল্পে তিনি ভারত সচিবকে কতকগুলি সুপারিশ করেছিলেন।

এই সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল প্রথমতঃ, সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স উনিশ থেকে পূর্বেকার একুশ বৎসরে বর্ধিত করা এবং বিলাতে ও ভারতবর্ষে একই সময়ে এই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা অবলম্বন। ভারতবাসীরা যে এতে বিশেষ সন্তোষলাভ করেন তা বলাই বাহুল্য। রিপনের পদত্যাগ ত্বরান্বিত হওয়ায় এই সব সুপারিশ অনুযায়ী আদৌ কার্য হয় নি। এ সম্বন্ধে ১৮৮৮ সনে গঠিত পাবলিক সার্বিস কমিশনের উপর বিচার আলোচনার ভার অর্পিত হয়।

বিলাতের রক্ষণশীল দল সরকার পরিচালনার ভার গ্রহণ করায় উদার-নৈতিকদের আমলে ভারতবাসীদের মনে যেরূপ আশা আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করেছিল তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার অতঃপর সুযোগ বহুলাংশে সংকুচিত হ'ল। ভারতবর্ষের সরকারী ও বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ সমাজ প্রথমাবধিই রিপনের উপর মনে মনে অসন্তোষ পোষণ করছিলেন॥ তাদের এই অসন্তোষ ক্রমে বিদ্বেষ ও শত্রুতায় আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু তাদের আসল লক্ষ্য ছিল ভারতবাসী তথা ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়। ভারতবাসীদের উপর এই সমাজের বিদ্বেষবহ্নি অল্পকাল মধ্যে ধূমায়িত হয়ে উঠল। রিপনের সময়েই বহুলাংশে এটা আত্মপ্রকাশ করে। এই সব কথাই আমরা এখন বলব।

ইলবার্ট বিল ঃ সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ ঃ প্রথম ন্যাশনাল কনফারেন্স

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ইলবার্ট বিল একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রিপনের সময়ে এর উদ্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন এটি কার্যকরী হতে পারে নি। ইলবার্ট বিল প্রসঙ্গে পুরানো কথায় ফেরা যাক। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবহার বৈষম্য বহু দিনের। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে উভয়ের ভিতরকার এই ব্যবহার বৈষম্য স্থান পেয়েছিল। ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিচারেই শুধু এই বৈষম্য নয়। ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারের অধিকারেও শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হত। দণ্ডবিধির বৈষম্যমূলক ধারাগুলি তুলে দিতে সত্তরের দশকে সরকার মনস্থ করলেন। এর ফলে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিচারকদের শাসন ক্ষমতার তারতম্যও তুলে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল ১৮৭২ সন নাগাদ। কিন্তু এ প্রস্তাব তখন সরকারী স্তরে গৃহীত হয়নি। এখানে মনে রাখা দরকার যে, এই দশকে ইউরোপীয়দের মত ভারতবাসীরা ক্রমে সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসনে সম মর্যাদা লাভ করেন। কাজেই স্বভাবতই সমান অধিকার সম্বন্ধেও প্রতিবন্ধকতার অবকাশ আর রইল না। কিন্তু কার্যত এমনটি হয়নি। এমনটি হতে হলে দণ্ডবিধি আইনের তো সংস্কার হওয়া দরকার। ওদিকে ১৮৭৭ সনে স্থির হল সম মর্যাদা সম্পন্ন ইউরোপীয় ও ভারতীয় সিবিলিয়ানরা প্রেসিডেন্সি টাউন সমূহে অর্থাৎ কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারের অধিকারী। মফস্বলের ভারতীয়েরা এতদিনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা জজের পদে নিযুক্ত হতে চলেছেন এ কারণ প্রেসিডেন্সি শহরগুলির মত মফস্বলেও ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে যাতে এই ব্যবহার বৈষম্য বিলুপ্ত হয় সে দিকে কারো কারো দৃষ্টি পড়ে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সিবিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্ত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে একটি মন্তব্যলিপি সরকারে পেশ করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এ ধরনের

বৈসাদৃশ্য দূর করার পক্ষে ফৌজদারি দণ্ডবিধি সংশোধন। তখন বঙ্গের ছোটলাট ছিলেন স্যর এ্যাশলি ইডেন। ইডেনের কথা আমরা পূর্বে একাধিক স্থলে পেয়েছি। নীল চাষী প্রসঙ্গে তার উদার কার্যপদ্ধতির সঙ্গে আমরা পরিচিত। আবার দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কে তার বিরূপ মনোভাবের কথাও আমরা জানতে পেরেছি। বিহারীলাল গুপ্তের উক্ত মন্তব্যলিপি পাঠ করে ইডেন বিষয়টির যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হলেন এবং এটি সরকারের গোচরে আনলেন। তখন উদারনৈতিক দল সর্বেসর্বা। উদারনৈতিক বড়লাট রিপনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি অবিলম্বে এই বিসদৃশ ব্যবস্থা সম্বলিত আইনের সংশোধনকল্পে ব্যবস্থা সচিব স্যর কোর্টনে ইলবার্টের উপরে একটি খসড়া রচনার ভার দিলেন। ইলবার্ট আদিষ্ট হয়ে এই আইনের খসড়াটি রচনা করলেন। তিনি রচয়িতা বলে খসড়াটির নাম দেওয়া হল ইলবার্ট বিল। ইডেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেই অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর পদে ছোটলাট নিযুক্ত হয়ে আসেন স্যর রিভার্স অগস্টাস্ টমসন্। টমসন্ ইলবার্ট বিল বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। একটু পরেই আমরা তা দেখতে পাব।

আইন প্রণয়নে কয়েকটি ধাপ—প্রথমতঃ, খসড়া রচনা; দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মতামত যাচ্ঞা; তৃতীয়তঃ, গেজেটে বিল বা আইনের খসড়া প্রকাশ, চতুর্থতঃ, ব্যবস্থাপক সভার আলোচনার জন্য দিন নির্ধারণ। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই এই সকল স্তরে ক্রমান্বয়ে কার্য শুরু হয়েছিল। বিলের আসল ব্যাপারটি জানাজানি হতে বিলম্ব হ'ল না। এর মূল কথা ছিল ফৌজদারি দণ্ডবিধির বৈষম্যমূলক ধারাগুলির সংশোধন বা পরিবর্জন। আমরা পূর্বে বহুবার দেখেছি ইউরোপীয়দের স্বার্থ কণামাত্র সংকোচনের সম্ভাবনা ঘটলেই তারা জোটবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে লড়তে আরম্ভ করত। এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা সফলকামও হত। এবারেও তারা বসে রইল না। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন উপস্থিত করল। একটি নতুন বিষয় কিন্তু এবারে বেশী করে ধরা পড়ল। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা ফিরিঙ্গিরা এতদিনে ভাবতে শিখেছে তারা ব্রিটন জাতির সমতুল। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট ফিরিঙ্গি সাদারল্যাণ্ডের আচরণ এর একটি দৃষ্টান্ত। অর্ধ-

শতাব্দী পূর্বেকার ফিরিঙ্গি তথা ইউরোপীয় ডিরোজিওর সঙ্গে এ সময়ের ফিরিঙ্গিদের কতই না প্রভেদ লক্ষ্য করি! এতদিনে তারা এই শিখেছে যে, ভারতবর্ষ নয়, ব্রিটেনই তাদের তথাকথিত মাতৃভূমি! তাই দেখি উক্ত আইনের খসড়া প্রচারের অব্যবহিত পরেই এই ফিরিঙ্গি পুঙ্গবেরাও ইউরোপীয়দের মত এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে কোমর বেঁধে লেগে যায়। এ যেন 'একে রামে রক্ষা নাই তায় সুগ্রীব দোসর'!

এই মাত্র বলেছি ইলবার্ট আইনের খসড়া প্রচারিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপীয়েরা এর বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করে দেয়। কত সভা সমিতি হ'ল। কত বক্তৃতা, ভারতীয়দের প্রতি কি ভীষণ বিষোদ্গার! উপলক্ষ—উক্ত আইনের খসড়া, কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না যে, তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতবাসী তথা মুখর উচ্চ শিক্ষিত ভারতীয়রা। নিজ স্বার্থ ও 'অধিকার' রক্ষার নিমিত্ত ইউরোপীয়েরা এবার জোটও বাঁধল। প্রতিষ্ঠিত হ'ল ডিফেন্স এসোসিয়েশন, অর্থাৎ আত্মরক্ষা সভা। ভাবটা এই,—এ অধিকার লোপ পেলে তাদের সবই যেন চলে যাবে। এসোসিয়েশনের পক্ষে ইউরোপীয়েরা শুরুতেই দেড় লক্ষ টাকা তুল্‌ল, যাতে করে এ আন্দোলনকে একটি স্থায়ী রূপ দেওয়া যায়। ফিরিঙ্গি ব্যারিস্টার ব্রান্‌সন এবং তার জাত ভাইয়েরাও আসরে নামলেন। আসলে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি যে আলাদা তা যেন তারা ভুলতেই বসল এ সময়। ঢাকায় একটি জনসভায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ব্রান্‌সন ভারতীয়দের উপর বিষোদ্গারে ইউরোপীয়দেরও ছাড়িয়ে গেলেন। এর তুড়ুক জবাব দিলেন ব্যারিস্টার লাল মোহন ঘোষ ঐ সহরেই আর একটি জনসভায়। ব্রান্‌সন বক্তৃতায় যত না প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে বলেছিলেন তার শতগুণ বলেন হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে। বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার লাল মোহনের বক্তৃতায় ভারতীয়েরা যেন অথৈ জলে থৈ পেলেন। এই বক্তৃতার ফলে সমাজ মধ্যে অনেকটা আত্মসম্বিৎ ফিরে এল। একশ্রেণীর লোকে হিন্দু সমাজে যা কিছু রয়েছে তারই গুণকীর্তন শুরু করে দিলেন কোনরূপ বিচার বিবেচনার তোয়াক্কা না রেখে। এ সময়কার সংস্কার পন্থী বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন—এর ফলে হিন্দু ধর্মের সবই ভাল এমন একটা সংস্কার শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে

নতুন করে জন্মাতে লাগল। প্রস্তাবিত আইনে শ্বেতাঙ্গ মহলে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় তা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতার মাধ্যমে অমর করে গেছেন। তখনকার দিনের ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি সমাজের মনোবৃত্তি সম্যক অনুধাবন করতে হলে এটিও আমাদের জেনে রাখা দরকার। এ কারণ কবিতাটির মূল অংশ এখানে দিলাম।

গেল রাজ্য, গেল মান, হাঁকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌সন, কেস্থয়িক মিলার—
"নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার-নেভার !"
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের "জানানা !"
বিবিজান ! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না ॥
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হ্যাট্ কোট্ বুট্ পরে
সরা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে ?—নেভার নেভার ! !
নেভার—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা"।
দেহে প্রাণ, বিবিজান। কখনো তা হবে না।
কাঁপিল মেদিনীতল, ধরা যায় রসাতল,
অস্ত্রফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ভলেণ্টিয়ার ছুটেছে,
কাগজ কলম ধরে কামিনীরা উঠেছে ! !
হুরে হিপ্—হুরে হো, শিঙে বাজে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা—"ফ্রীডম এভার।"
বিলাতি বৃষের রব কামিনী খেপিল সব
বল্লভের কাছে গিয়া কানে দিল পাক্,
পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দ ভরে
ডাকিল বৃটিশ বৃষ গাঁক্ গাঁক্ ডাক

হুরে হিপ্—হুরে হো, শিঙে বাজে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা—"ফ্রীডম—এভার"।
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান",
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা"।
দেহে প্রাণ বিবিজান, কখনো তা হবে না॥
আয়রে ফিরিঙ্গি ভাই সিন্ধু পারে চলে যাই
সেখানে "লিবার্টি হল" আমাদেরই সভা।
পাত্র মিত্র যতজন সকলেই গবা!—
বুঝাইব খাঁটি হাল্ আছিলাম এতকাল
হিন্দু দেশে ভালবেশে হিন্দুর সন্তানে
সিংহ যেন মৃগ কোলে স্বর্গের উদ্যানে!!
লাথি কিল পটাপট জুতাবড় চটাচট
"লিভর" পীলে ফটাফট আপনি যেতো ফেটে
আমরাই করুণার মলম মাখায়ে গায়
রাখিতাম কোলে করে হিন্দুর সন্তানে।
সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের বাগানে!
হুরে হিপ্-হুরে হো—শিঙে বাজে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম-এভার"।
হুসিয়ার ইলবার্ট দেখো হে রিপণ লাট
সাহেব-রক্ষিণী সভা সংগঠিত হয়েছে।
ছুপোঁচ তে-পোঁচ মিলে লক্ষ টাকা দেছে তুলে
চামড়া কটা কতগুলো "এন্ফিবিয়াস" যুটেছে।
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হ্যাট কোট্ বুট পরে,
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা?
আয়রে ফিরিঙ্গি ভাই সবরঙ্গা ডাকে সবাই—
সিন্ধু পারে দেখে আসি ইংরেজের সভা।

পালে ঢুকে মিশে যাব আণ্ডু পিণ্ডু নাহি রব
সিংহ দলে স্থান পাব বেছে নেবে কেবা !
হুরে হিপ্—হুরে হো—শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
এ দিশী "বৃটন" মোরা গোরাদের ব্যাটা ! !

* * *

হঠাৎ পড়িল ডাক সামাল সামাল
বলি শোন, ওরে ভাই ইংরেজ ছাবাল।
এ রাজত্ব ছেড়ে আর কোথা যাবি বল ?
চির শিক্ষা বৃটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাবো—টুট্ টুট্ টুট ! !
ধূপছায়া ভায়ারা সবে শোন তবে বলি,
আরমেনিয়া যাও হে কেহ—কেহ চুনাগলি ॥
স্পষ্ট কথা বলা ভাল বিঘ্ন বড় ভারি—
"মিলচ্ কাউ" ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি !
সবাই মিলে "অ্যা হেম" বলে পকেট পানে চায়।
উচ্চতানে ধীরে ধীরে হাল্কা সুরে গায়—
হুরে হিপ্—হুরে হো—শিঙে বাজে
ভোঁ-ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা-হেথা "ফরেভার" ॥
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে, হেথা ছেড়ে যাব ফিরে ?
ড্যাম দি নেটিব বিল "নেভার নেভার" !

সম্বৎসর ধরে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের আন্দোলন চল্‌ল। বিলের উপরে প্রাদেশিক সরকারগুলির অভিমত চাওয়া হল। বড়লাট রিপন যথারীতি সিমলায় গ্রীষ্মাবাসে চলে যান। সেখানে বড়লাটগণ কয়েক মাসকাল অবস্থান করতেন এবং সেখান থেকে শাসনকার্য নির্বাহ করতেন। রিপনের অনুপস্থিতিতে কলকাতায় আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠল। পদস্থ সরকারী কর্মীরাও পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করলেন। তাদের অনেকেই যে এই বিলের ভীষণ বিরোধী ছিলেন তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। কলকাতা হাইকোর্টের

বিচারপতি নরিস ছিলেন এইরূপ একজন ইউরোপীয়। শোনা যায়, বঙ্গের ছোটলাট রিভার্স অগস্টাস্ টমসনও এই বিলের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বড়লাট রিপন কলকাতায় ফিরে এলে তাঁকে জোর করে চাঁদপাল ঘাট থেকে জাহাজে চাপিয়ে বিলেতে ফেরত পাঠানো হবে এরূপ একটি ষড়যন্ত্র করেছিল ইউরোপীয়েরা। বঙ্গের ছোটলাট টমসন এতাদৃশ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও বিষয়টি যে তিনি জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রিপনের স্বদেশবাসীরা ইলবার্ট বিল নিয়ে তাঁর ঘোরতর বিরোধী হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু এই ইলবার্ট বিলের সপক্ষতা করায় ভারতবাসীরা তাঁর প্রতি সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন। সিমলা থেকে ফিরে এলে তাঁকে এদেশবাসীরা বিপুল সম্বর্ধনা জানান। এর একটি পরিচয় পাই ঐ সময়কার ছাত্রী সরলা দেবী চৌধুরাণীর লেখা থেকে। সরলা দেবী বলেন: "লর্ড রিপনের বিরাট অভ্যর্থনায় স্টেশনে সারবন্দি "flower girls"দের মধ্যে আমায় একজন মনোনীত করা হল। অভ্যর্থনা কমিটির দেওয়া একই রকমের শাড়ি জামা পরে, হাতে ফুলের সাঁজি নিয়ে প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম ট্রেন আসার প্রতীক্ষায়। যেমন গাড়ি এসে থামল, লর্ড রিপন নামলেন, তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করলে ফুলকুমারীরা।" (জীবনের ঝরা পাতা—পৃঃ ২৯)। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্যারিস্টার গিরিজা শঙ্কর সেন। তিনি হলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী মোহিনী-দেবীর ভাই।

বড়লাটের অর্থসচিব পদে এই সময় নিযুক্ত হলেন ঝানু সিবিলিয়ান স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন। এইরূপ বাদ প্রতিবাদের, দ্বন্দ্ব কলহের অবসান ঘটাতে তিনি উদ্যোগী হন। তাঁর উদ্যোগের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় একটি আপোস রফার প্রস্তাব। মূল খসড়ায় ছিল, প্রেসিডেন্সি সহরগুলির মত মফস্বলেও শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার ক্ষমতা প্রদান। অবশ্য এই সিবিলিয়ান কর্মীরা হবেন জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উভয়েরই সমশ্রেণীর। আপোস প্রস্তাবে এদেশবাসীরা ইউরোপীয়দের বিচার ক্ষমতা পেলেন বটে, কিন্তু তার বদলে অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এই প্রস্তাবানুযায়ী স্থির হয় যে, ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারকালে তারা

চাইলেই জুরীর সাহায্য নিতে হবে। জুরিতে অর্ধেক থাকবেন ইউরোপীয়, আমেরিকান বা উভয়েই। যে স্থলে এইরূপ অর্ধেক জুরি পাওয়া যাবে না সেখান থেকে মামলা তুলে নিয়ে যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জুরি পাওয়া যাবে সেইখানেই বিচার কার্য চালাতে হবে। পূর্বে আইন ছিল শ্বেতাঙ্গরা যে কোন স্থলেই ইউরোপীয় অপরাধীদের জুরি ব্যতিরেকেই দণ্ড দেবার অধিকারী। বর্তমান আপোস প্রস্তাবে এই অধিকার তো সংকুচিত হলোই উপরন্তু, বিচার ব্যাপদেশে অপরাধীদের অনেক সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হ'ল। বড়লাট রিপন ভারত সচিবের পরামর্শ ক্রমে এই আপোস প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং পর বৎসর, ১৮৮৪ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারি এই মর্মে আইন পাস হয়ে গেল। আইনটির নাম হল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সত্য সত্যই বলেছেন এই আপোস প্রস্তাবে কোন সুবিধাই একরূপ পাওয়া গেল না। অপর পক্ষে, বিচারে ইউরোপীয় অপরাধীদের ঢের সুযোগ করে দেওয়া হ'ল। বৎসরাধিককাল ধরে এত হৈ চৈ এত আন্দোলন বিতর্ক ও বিষোদ্গার সবই একরূপ বরবাদে যায়! কয়েক বৎসর পরে "ইণ্ডিয়া ১৮৯৪" গ্রন্থে স্যর জন স্ট্যাচি এই আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন—১৮৮৪ সনের তিন আইনে প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্বেকার ব্যবস্থাই বহাল রাখা হয়। বরং এতে ইউরোপীয়েরা আগেকার মতই নিরঙ্কুশ রয়ে গেল। দেশীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সাধারণ ভাবে কোন ক্ষমতাই বাড়ল না, এদের মধ্যে যারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা জজ হবেন তারাই মাত্র ইউরোপীয়দের বিচার সম্পর্কে ইউরোপীয় জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সমান ক্ষমতা পাবেন। এটুকু অধিকারও তাদের একটা গুরুতর শর্ত সাপেক্ষে দেওয়া হয়েছে। যত সামান্যই অপরাধ হোক না কেন, যে কোন ইউরোপীয় আসামী জুরির বিচার দাবি করলেই জেলা জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট তা দিতে বাধ্য থাকবেন। আর এই জুরির অর্ধেক হবেন ইউরোপীয় আমেরিকান বা উভয়েই। এদেশীয় কোন অপরাধীর এ সুবিধা নেই। কোন ইংরেজ স্বদেশে এ সুবিধা দাবি করতে পারে না। ইউরোপীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের ইউরোপীয়দের সরাসরি বিচারে যে অধিকার আগে ছিল তা এই আইনে হরণ করা হয়েছে।

এর কারণ এ নয় যে, এটা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। দেশীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর এরূপ সরাসরি বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করা যায় না বলেই এরূপ করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের (অবশ্য তাদের জাষ্টিস্ অব দি পীস হতে হবে) ক্ষমতা কিন্তু পূর্ববৎই আছে, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হলে তারা আগের মত ইউরোপীয় আসামীদের বিচার করতে পারবেন; কিন্তু সমশ্রেণীর কোন দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটর সে ক্ষমতা নেই।

১৮৮৩ সনটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আর এক কারণেও বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। এ হ'ল হাইকোর্ট অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড। যে ব্যাপার নিয়ে এই দণ্ডদান, সে বিষয়ে আগে একটু বলা আবশ্যক, বিচারপতি নরিসের কথা ইলবার্ট বিল আন্দোলন সম্পর্কে আমরা একবার পেয়েছি। তিনি স্বদেশবাসী ব্রিটনদের ছিলেন একান্ত সপক্ষে। সপক্ষতায় কোন দোষ নেই, কিন্তু শাসিত ভারতবাসীর প্রতি তাঁর আপত্তিকর ও বিরূপ মনোভাব তখন আমাদের খুবই বিচলিত করে। একটি মামলার বিচারে সাক্ষ্য স্বরূপ আদালতে শালগ্রাম শিলা আনতে নরিস একটি পক্ষকে বাধ্য করেন। এই সংবাদটি 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনীয়নে' মন্তব্য সহ প্রথম প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ নিজ 'বেঙ্গলী' সাপ্তাহিকে এই ব্যাপারটির উপর তীব্র ভাষায় মন্তব্য করেন। তিনি এই মর্মে লিখলেন যে, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এতদিন আমাদের সম্মানভাজন ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁরা ভুল করেছেন, কর্তব্য পালনে শোচনীয় ত্রুটিরও পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু কখনও চাঞ্চল্যবশে বা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে তাঁরা এরূপ করেছেন বলে জানি না। সম্প্রতি এমন একজন বিচারপতি এসেছেন যাঁর কার্যকাল স্বল্পদিন হলেও ইতিমধ্যে সাধারণের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে, তিনি আমাদের উচ্চতম বিচারলয়ের বিচারপতির আসনে বসবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষে এতাদৃশ বিরূপ মন্তব্য খুবই অযশস্কর বিবেচিত হয়। প্রতিষেধকল্পে কলকাতা হাইকোর্ট সুরেন্দ্রনাথকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করলেন অবিলম্বে। হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে ১৮৮৩, ৫ই মে সুরেন্দ্রনাথের বিচার হয়। কৌঁশুলি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র-

বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি) পরামর্শে সুরেন্দ্রনাথ বিচারপতি মণ্ডলীর সম্মুখে অপরাধ স্বীকার করলেন, কিন্তু এই মণ্ডলীর একজন ব্যতীত আর সকলেই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। তারা সুরেন্দ্রনাথকে অপরাধী সাব্যস্ত করে দু'মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। একমাত্র দেশীয় বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র পূর্ব নজীর দেখিয়ে সামান্য কিছু জরিমানা নিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে মুক্তি দেবার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। এই মামলার সময় কলকাতায় কি চাঞ্চল্যই না উপস্থিত হয়! ছাত্র সমাজ সুরেন্দ্রনাথকে কতখানি তখন শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং তাদের চিত্তে তিনি কি উচ্চ স্থানই না অধিকার করেছিলেন, বিচারের সময় তার প্রমাণ মিললো। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এইরূপ ব্যবহার তারা বরদাস্ত করতে পারলেন না। এই সময়কার ছাত্র সমাজের নেতা পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে পুরোভাগে রেখে তাঁরা দলে দলে হাইকোর্টের সম্মুখে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত হলেন। সংযমের বাঁধ আর রইল না। যুবকগণ ইট পাটকেল ছুড়ে হাইকোর্টের দরজা জানালার কাঁচ ভেঙ্গে দিলেন। শুধু ছাত্রসমাজই নয়, ছাত্রীরা তখন সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সরকারের এতাদৃশ আচরণে ব্যথিত না হয়ে পারেন নি। তাঁরা এর প্রতিবাদ জানালেন একটি বিশেষ উপায়ে। ঐ সময় বেথুন বিদ্যালয়ের (স্কুল ও কলেজ) অবলা দাস পরে লেডি অবলা বসু, কামিনী সেন, পরে কবি কামিনী রায় প্রমুখ উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রীরা নেতৃত্ব করেছিলেন। তখনকার ছাত্রী সরলা দেবী চৌধুরানী এ বিষয়টির কথা পরবর্তীকালে এরূপ লিখেছেন, "এদিকে স্কুলে উপর ক্লাসের কতকগুলি মেয়েদের নেতৃত্ব প্রভাবে আমার জাতীয়তার ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম নেত্রী ছিলেন—কামিনী দিদি ও অবলা দিদি—কবি কামিনী রায় ও লেডি অবলা বসু। তাঁদের নির্দেশগুলি আমাদের কাছে প্রবহমান হয়ে আসত আমার দিদি ও তাঁর সহপাঠিনীদের মধ্য দিয়ে।......সুরেন বাড়ুজ্জে যখন জেলে যান, তখন সবাই একটা কালরঙের ফিতে আস্তিনে বাঁধলুম। কেন তা ঠিক জানতুম না। কিন্তু রাস্তায় স্কুল যাত্রী অনেক ছেলেদের হাতেও সেই রকম ফিতে দেখে একটা সহবেদনার বৈদ্যুতী খেলতে লাগল মনে।" (জীবনের ঝরা পাতা,

পৃ. ২৮) শুধু ছাত্র সমাজই নয়, উত্তর ভারতের সর্বত্র এবং দক্ষিণ ভারতের বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে সুরেন্দ্রনাথের নাম সুপরিচিত। তাঁর এতাদৃশ কারাদণ্ডে দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। একদিকে ইলবার্ট বিল আন্দোলন এবং অপরদিকে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড এই দুইয়ে মিলে নিজেদের করুণ অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসী যে রূপ সচেতন হয়ে উঠল পূর্বে এমনটি ঘটতে কখনও দেখা যায় নি। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, তিনি নিজে সনাতন পন্থী না হয়েও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নিকট থেকেও এ ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেছিলেন। প্রগতিবাদী, রক্ষণশীল—সকলেরই মুখে তখন সুরেন্দ্রনাথের নাম। দু'মাস কারাভোগের পর ১৮৮৩, ৪ জুলাই সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া পেলেন। ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। জনমানসে এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে। এই জন্য এ দিনটিতে সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তি স্বদেশবাসীদের চিত্তে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করল।

সুরেন্দ্রনাথের দণ্ডকালের মধ্যেই চিন্তাশীল নেতৃবর্গ শুধু ক্ষোভ প্রকাশেই নিরস্ত হলেন না; তাঁরা স্বদেশের উন্নতিকল্পে এবং জাগ্রত চেতনাকে সুষ্ঠু পথে চালনার উদ্দেশ্যে অগ্রণী হলেন। প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপীনিয়ন' (২১ জুন, ১৮৮৩) একটি জাতীয় ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখলেন। কৃষ্ণনগরের জননায়ক উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে, সুরেন্দ্রনাথ কারাগারে থাকতেই এবং অপরাপর নেতৃবৃন্দকে পত্রের দ্বারা একটি সুন্দর প্রস্তাব করে পাঠালেন। ১৮৮৩, ৪ জুলাই তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মীরর' পত্রিকায়ও এই প্রস্তাব সম্বলিত তাঁর একখানি পত্রও প্রকাশিত হ'ল। পত্রের স্থূল মর্ম এই: প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালানো আবশ্যক। সে জন্য দুটি উপায় অবলম্বন প্রয়োজন—প্রথম, একটি ন্যাশনাল এসেম্বলি বা নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও দ্বিতীয়, আন্দোলন সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য একটি ন্যাশনাল ফাণ্ড বা জাতীয় ধন ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা। তারাপদ এ দুটিকে অভিন্ন জ্ঞান করে প্রথমটিকে পুরুষ এবং দ্বিতীয়টিকে প্রকৃতি আখ্যা দেন। পত্রে একটি পরিকল্পনাও সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হয়। ইংলণ্ডবাসীদের ভারতবর্ষের অবস্থা জানাবার জন্য ইংলণ্ডে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি রাখা, ভারতবাসীদের রাজনৈতিক মিশনারী নিয়োগ

(তাঁদের কাজ হবে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নানা স্থানে রাষ্ট্রীয় সংঘ, বিপণি সংঘ, ও অনুরূপ সংঘ প্রতিষ্ঠা), জাতীয় ব্যবসায় ও শিল্পে উৎসাহদান, কার্যকরী শিল্পযন্ত্রের উদ্ভাবক ও নির্মাতাদের এবং শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক পুস্তিকা লেখকদের পদক, পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা, আর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাবসৃষ্টির চেষ্টা—এ সব উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত ন্যাশনাল এসেম্বলি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যও শীঘ্র শুরু হ'ল। প্রস্তাবিত ধনভাণ্ডারে অল্পদিনের মধ্যেই কুড়ি হাজার টাকা জমা পড়ল। কারামুক্তির পর সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবর্গ এই পরিকল্পনায় উত্থাপিত অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলাপ আলোচনা আরম্ভ করলেন। আর এর কেন্দ্রবিন্দু হ'ল ভারত সভা।

আগেই আমরা দেখেছি সমগ্র উত্তর ভারতে লাহোর থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত এবং বঙ্গ প্রদেশে বিভিন্ন প্রধান প্রধান শহরে ভারত সভার শাখা সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। ঐ সময় বঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন জেলা শহরে এবং বড় বড় গঞ্জে ও গ্রামে এর শাখা স্থাপিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ভারত সভার মাধ্যমে কারামুক্তির পরে এদের সঙ্গে উক্ত মূল বিষয় দু'টি—জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন এবং প্রতিনিধি সভা গঠন—নিয়ে পত্রালাপ শুরু করে দিলেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজে নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও এ নিয়ে পত্র ব্যবহার হয়। এই প্রস্তাবে সর্বত্রই বেশ সাড়া পাওয়া গেল। বিভিন্ন প্রদেশবাসীর সহযোগে একটি জাতীয় সম্মেলনের কথাও তখন নেতৃবৃন্দের মনে জাগরূক হয়েছিল। ভারত সভার সম্পাদক আনন্দমোহন বসু ১৮৮৩ সনে বার্ষিক রিপোর্টে সত্যই লিখেছেন, অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণকে লক্ষ্য করেই মূলত তিনি এই মর্মে লিখেছিলেন :

অশুভ থেকে শুভের উদ্ভব—বাক্যটির যাথার্থ্য এ ঘটনায় যেরূপ সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হ'ল এমনটি পূর্বে কখনো হয় নি। এ ব্যাপারটিতে সর্বত্র যতখানি গভীর ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রদেশের জনগণ পরস্পরের জন্য বেদনাবোধ করতে শিখেছে এবং ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে। এই ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করে ১৮৮৩ সনের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের মধ্যে। এই কথাই এখন বলছি।

ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলনের ভাবনা নেতৃবৃন্দের মনকে কিছু কাল যাবৎই আন্দোলিত করছিল। কিন্তু এই সনের আর একটি ঘটনা এরূপ একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানকে ত্বরান্বিত করে। এ বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় সরকারী আনুকূল্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে স্বভাবতঃই জনসমাগম হয়েছিল। সভার নেতৃবৃন্দ এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য উদ্যোগী হলেন। তারা ডিসেম্বরের শেষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠান করলেন। পূর্ব থেকেই এর আয়োজন অবশ্য চলে। প্রদর্শনীর সূত্র ধরে একে বাস্তবরূপ দেওয়া এ সময় সম্ভব হ'ল। ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স কলকাতায় দু' দুবার অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৩ এবং ১৮৮৫ সনে। দ্বিতীয়বারের উদ্বোধনী বক্তৃতায় এইরূপ একটি জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতার বিষয় পূর্বের কোন কোন ঘটনা উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন : জাতীয় সম্মেলনের কথা ১৮৭৭ সনেই তাঁদের মনে উদয় হয়। দিল্লীতে দরবার চলছিল। রাজা মহারাজারা সেখানে সমবেত। তখন জন-প্রতিনিধিদের অনেকেরই মনে এই কথা উদিত হয় যে, জাতীয় সমস্যাদি নিয়ে আলোচনার জন্য এরূপ একটি সম্মেলনের আয়োজন করলে মন্দ হয় না। পূর্বে এ উদ্দেশ্যে কোন কাজ হয় নি। এই বৎসর ভারত সভা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সুযোগ নিয়ে প্রথম জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। এরূপ সম্মেলনের প্রয়োজনীতা এখন সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে। বোম্বাই, এলাহবাদ মাদ্রাজ এবং এমন কি আজমীড়েও এরূপ জনসমাবেশ ঘটছে। বাস্তবিক সমগ্র ভারতবর্ষই যেন জাতীয় উন্নতির জন্যে কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে। জাতীয় সম্মেলন কোন বিশেষ একটি সমস্যা বা প্রশ্নের আলোচনার জন্য নয়। সমুদয় প্রশ্ন বা সমস্যা অথবা এক কথায় ভারতবাসীর সামগ্রিক উন্নতির জন্যই এর অনুষ্ঠান। প্রথম সম্মেলনেই সুরেন্দ্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য বেশ অনুভূত হয়। দ্বিতীয় সম্মেলনের কথা পরে আসবে। এখন প্রথম সম্মেলনের বিষয় কিছু বলি।

সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল ২৮, ২৯, ও ৩০ ডিসেম্বর, তারিখে। প্রায় একশত হিন্দু মুসলমান প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেছিলেন। লাহোর, দিল্লি, মীরাট, এলাহবাদ, মজঃফরপুর, দেওঘর, বাঁকীপুর, ভাগলপুর, কটক, শ্রীহট্ট আমেদাবাদ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে এসেছিলেন।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় এবং প্রতিনিধিদের বক্তৃতা পর্যালোচনা করলে এর গুরুত্ব যে কত তা আজিকার দিনেও বেশী করে বুঝা কঠিন হবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসকারগণ এর গুরুত্ব তেমন উপলব্ধি করতে পারেন নি। ফলে এ সম্বন্ধে খুব কমই উল্লেখ তাদের বইতে পাওয়া যায়। এ কারণেও জাতীয় সম্মেলন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

কলকাতাস্থ এলবার্ট হলে ন্যাশনাল কন্‌ফান্সেররে অধিবেশন বসল তিন দিন ব্যাপী ২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর। তিন দিনে তিন জন আলাদা আলাদা ব্যক্তি সভাপতির পদে বৃত হন। প্রথম দিনের সভাপতি ছিলেন বঙ্গবরেণ্য বর্ষীয়ান রামতনু লাহিড়ী। রামতনু ছিলেন বরাবর প্রগতিপন্থী। সেকালের হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষাব্রতীরূপে তাঁর নাম সমাজে সুপরিচিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন ডিরোজিওর অপরাপর শিষ্যদের মত একান্তই যুক্তিবাদী। স্বদেশের উন্নতিকল্পে তাঁর ছিল যুবজনোচিত আগ্রহ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তাঁর সতীর্থ পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় ভারত সভার স্থায়ী সভাপতি পদে বৃত ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষা-ব্রতীরূপে দীর্ঘকাল সমাজের সেবা করেন। ঐ সময় অবসর জীবন যাপন করতে থাকেন। স্বদেশের আহ্বান অবসর মানে না। তাই তিনি নিরালা হতে এসে একেবারে সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, শাসন, রাষ্ট্রনীতি—স্বদেশের উন্নতি করতে হলে এ সব বিষয়েরই আলোচনা প্রয়োজন। তাই দেখি প্রথম দিনের প্রথম প্রস্তাবই হ'ল শিল্প ও ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পর্কে। মাদ্রাজের ধনকোটি রাজা এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন বোম্বাই নিবাসী শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর। শ্রীপদ বাবাজী, সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, বিহারীলালের সঙ্গে একই বৎসরে সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি বোম্বাই প্রদেশে সিবিলিয়ানী কর্মে নিযুক্ত। উভয়েরই বক্তৃতায় এর আবশ্যকতা বিশদরূপে বর্ণিত হয়। পরবর্তী আলোচনা শুরু হয় সিবিল সার্বিস, এবং পরিবর্তিত স্ট্যাটুটারি সিবিল সার্বিস সম্পর্কে। এ বিষয়ে প্রস্তাব

উত্থাপন করেন সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। কিন্তু আলোচনা শেষ হবার পূর্বেই এ দিনকার অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল ও রাজনৈতিক নেতা কালীমোহন দাশ। ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠতাত। কালীমোহন স্বদেশের নানা উন্নতি প্রচেষ্টায় একান্তভাবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি শিশিরকুমার ঘোষের ইণ্ডিয়ান লীগের প্রথম সম্পাদকরূপে তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজে সাক্ষাৎভাবে যোগ দেন। পরে ভারত সভার সঙ্গে মিলিত হন। কালীমোহনের সভাপতিত্বে এই দিন সুরেন্দ্রনাথ উত্থাপিত সিবিল সার্বিস সম্পর্কিত প্রস্তাবটি নানা দিক থেকে আলোচিত হ'ল। বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই আলোচনায় যোগ দেন। এ দিনকার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ সম্পর্কে। এই সমস্যা বহুদিনের। কংগ্রেস যুগে এবং আজকের দিনেও এই সমস্যার নিরসন হয়েছে এরূপ কথা এখনও বলতে পারা যায় না। মনোমোহন ঘোষ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে এ ক্ষতিকর বিষয়টি লক্ষ্য করেন। শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগ আলাদা করার জন্য আশির দশকেই জোর আন্দোলন আরম্ভ হয়। আর ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ এ বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে এ সম্বন্ধে উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে মনোমোহন ঘোষ একটি যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে একখানি "ব্লুক বুক" রচনার পরামর্শ দেন। একখানি পুস্তিকা পরে মনোমোহন প্রকাশিত করেন।

সম্মেলনের শেষ অর্থাৎ তৃতীয় দিনে সভাপতি হন ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর। তিনি ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মাতামহ। অন্নদাচরণ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকই শুধু ছিলেন না, কেশবচন্দ্র সেনের সহকর্মীরূপে —সমাজ সেবায়ও তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। স্ত্রী জাতির উন্নতি বিষয়ে সে যুগে যাঁরা সর্বাপেক্ষা কর্মতৎপর ছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যেও একজন। অন্নদাচরণের সভাপতিত্বে সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয়। এগুলির মধ্যে প্রথম স্থান দিতে

হয় "প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা" শীর্ষক আলোচনা। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বড়লাট রিপন ঘোষিত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের উদ্দেশ্যে এবং তার পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছি। স্বায়ত্ত শাসনে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন হেতু প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের প্রাথমিক স্তর দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐরূপ শাসন ব্যবস্থা আশু প্রবর্তিত হলেই তবে ভারতবর্ষে প্রকৃত প্রগতি সম্ভব। এই জন্যই দেখা যায় উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই পার্লামেন্টীয় বা সংসদীয় নির্বাচন ভিত্তিক সরকার গঠনের আন্দোলন তথা প্রয়াস এই সময় থেকেই দানা বেঁধে ওঠে।

জনপ্রতিনিধিমূলক সরকারই ছিল তৃতীয় অধিবেশনের প্রধান প্রস্তাব। এ দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা যাতে পার্লামেন্টের অনুরূপ আইন-সভা গঠিত হয় তারই কথা উল্লিখিত হয় উক্ত প্রস্তাবে। কারণ শাসন নীতি নির্ধারণে ভারতবাসীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে স্বদেশের উন্নতি ও সুচারু শাসন ব্যবস্থা অসম্ভব। অস্ত্র আইন, ন্যাশনাল ফণ্ড প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে দু'জন ইংরেজ যোগ দিয়েছিলেন—একজন পার্লামেন্টের সদস্য সীমুর কী ও অন্যজন উইলফ্রিড স্কাওয়েল ব্লুণ্ট। ব্লুণ্ট তাঁর 'ইণ্ডিয়া আণ্ডার রিপন' পুস্তকে (পৃ. ১১৪-১৫) প্রথম দিনকার অধিবেশনের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি শিল্প শিক্ষার জন্য ফ্রান্স কি অন্যত্র ভারতীয় যুবকদের প্রেরণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের বিশেষ প্রশংসা করেন। সিবিল সার্বিস বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা সম্বন্ধে বলেন যে, এরূপ সুন্দর বক্তৃতা তিনি জীবনে খুব কমই শুনেছেন। বক্তৃতায় তিনি যে মত ব্যক্ত করেন ব্লুণ্ট তাঁর গ্রন্থে সে বিষয়েও ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। ব্লুণ্ট আনন্দমোহন বসুর উদ্বোধনী বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন—'এ সম্মেলন ছিল ন্যাশনাল পার্লামেন্টের প্রথম ধাপ।'

এতদিন শিক্ষিত ভারতবাসীরা প্রায় সর্বত্র জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এ চেতনাকে স্থায়ী করার পক্ষে বহুবিধ প্রচেষ্টা শুরু হয় এই দশকেরই প্রথম দিকে। বলা নিষ্প্রয়োজন এ সময়কার উদারনৈতিক শাসন পদ্ধতিও এর মূলে কম রসদ যোগায়নি। আর একদিক থেকেও নব-চেতনাকে সার্থক করার আয়োজন চলে। আমরা জাতি-বৈর বা জাতি

বৈরিতা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত জেনে নিয়েছি। পাছে আমরা জাতি বৈরিতাকে অবাঞ্ছনীয় মনে করি এই জন্য তিনি পূর্ব দশকেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এই দশকে শুধু নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক পন্থারও তিনি নির্দেশ দিলেন বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে। এ সমূহের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আনন্দমঠ শীর্ষক গ্রন্থের। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে আত্ম শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার যে স্থায়ী উপায় নির্দেশ করলেন তার মধ্যে দেখি ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ ও অনুশীলন দ্বারা নিজেদের সবল সংহত করার ঐকান্তিক প্রযত্ন। শাসক ব্রিটিশ জাতি যে সব গুণের অধিকারী হয়ে এত শক্তিমান হয়েছে তার অনুসরণের নির্দেশও আমরা এর মধ্যে পেলাম। স্বদেশকে মাতৃরূপে জ্ঞান করার মধ্যে প্রকৃত দেশকল্যাণ শক্তি নিহিত। স্বদেশের জন্য আমাদের সর্বস্ব পণ করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—জীবনদান অতিতুচ্ছ—এ সকলেরই সাধ্য। কিন্তু আসল কথা হ'ল দেশভক্তি। আমরা যদি দেশমাতৃকাকে ভক্তি করি তা হলে আমরা অনায়াসেই সর্বস্ব পণ করতে সক্ষম হব। "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতের মধ্যে এই দেশমাতৃকা রূপ বিধৃত। বহু পূর্বেই তিনি এ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই সময় দেশমাতৃকা ঐ রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। এক দিকে সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহন প্রবর্তিত ভারতব্যাপী জাতীয় আন্দোলন অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী প্রভৃতি রচনার মধ্যে শুনতে পাই এক নূতন যুগের পদধ্বনি। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি এই :

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥

সপ্তকোটীকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে !
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্ ॥”

আশির দশকে প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যেকার বিবিধ প্রচেষ্টার কথা আমরা অবগত হয়েছি। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। বঙ্গের নেতৃবৃন্দ আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখকে পুরোভাগে রেখে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করতে তখন ব্রতী। এই আন্দোলন শুধু তথাকথিত শিক্ষিত বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি অথবা শ্রেণী বিশেষের মধ্যেই নিবদ্ধ রইল না। স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এ সময়কার প্রচেষ্টা সমূহ ব্যাপ্তিলাভ করতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষের উন্নতি, তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক যে কোন প্রকারেই হোক—তাকে আমরা সর্ব সাধারণের উন্নতি বলতেই শিখি। এই সময়কার বিবিধ আন্দোলনের মধ্যে এই ভাবটি ক্রমশ সুপ্রকট হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় ন্যাশনাল কনফারেন্স
ও
ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্ব

প্রথম ন্যাশনাল কনফারেন্সের কথা এইমাত্র খানিকটা বিস্তৃতভাবে বল্‌লাম। সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথম, নিয়মিতরূপে সর্বত্র জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার গঠন। দ্বিতীয়, এদেশে প্রতিনিধি মূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

সুরেন্দ্রনাথ এই দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিতীয় বার ভারত পরিক্রমায় বার হলেন ১৮৮৪ সনের প্রথমেই। অন্যান্যবারে যেমন এবারেও তেমনি তিনি সর্বত্র সমাদৃত হলেন। বিভিন্ন স্থলে তিনি উক্ত উদ্দেশ্য দুটি নিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় ব্যাপৃত হন এবং জনসভার মাধ্যমে সাধারণের নিকট এর মর্ম ব্যাখ্যা করেন। প্রতিটি জায়গায় তিনি আশাতীত সাড়া পেলেন। নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ভারতবাসী তখন খানিকটা আত্ম সচেতন হয়ে উঠেছেন, কাজেই সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় তারা যে সাড়া দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

পর বৎসর, ১৮৮৫ সনের মাঝামাঝি সিবিলিয়ান হেনরি জন স্টেডম্যান কটন 'নিউ ইণ্ডিয়া' বা নূতন ভারত নামে একখানি বই লেখেন। সুরেন্দ্রনাথের সার্থক ভারত পরিক্রমা সম্বন্ধে তিনি উক্ত বইখানিতে এই মর্মে লিখেছেন:

"শিক্ষিত সমাজ দেশের কণ্ঠ ও মস্তিষ্ক। শিক্ষিত বাঙালীরা এখন পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জনমত নিয়ন্ত্রিত করছেন। যদিও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীরা বাঙালীদের চেয়ে শিক্ষায় ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে অনগ্রসর তথাপি বাঙালীর মতই তারা শিক্ষিত জনের আদেশ ও নেতৃত্ব মান্য করতে সমান তৎপর। পঁচিশ বৎসর পূর্বে এর কোন লক্ষণই দৃষ্টি গোচর হ'ত না। পঞ্জাবে বাঙালী প্রভাব—লর্ড লরেন্স, মণ্টগোমারি, ম্যাকলাউড কখন কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমনই যে, গত বৎসর একজন বাঙালী বক্তা ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে করতে যখন উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করেন তখন তা কোন বীর পুরুষের দিগ্বিজয় অভিযান বলেই ভ্রম

হয়েছিল! এখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঢাকা থেকে মুলতান পর্যন্ত যুবক সম্প্রদায়ের মনে সমান প্রেরণা জাগায়।"

কটন নিজে সিবিলিয়ান কিন্তু বইখানিতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন নি। আমরা জেনেছি বইখানি সুরেন্দ্রনাথের ভারত পরিক্রমার (১৮৮৪) এক বৎসর পরের লেখা। তথাপি এ দেশে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে কটন ঐ সময়ে যে মতামত ব্যক্ত করেন তাতে সরকারী বে-সরকারী উভয় মহলেই বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বইখানিতে এই সকল বিষয়ে আলোচনা ছিল : ভারতবাসীর প্রতি ইউরোপীয়দের বিষম ব্যবহার, সরকারী শোষণ নীতি, অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের দুরবস্থা, ভারতীয় রাজস্ব, সরকারী ঋণ ইত্যাদি।

ইলবার্ট বিল আন্দোলনের ছেদ পড়ল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে। এতে যে ভারতীয়দের বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি তা আগে আমরা দেখেছি। বড়লাট রিপন ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবহার সাম্য এবং সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছিলেন, এ জন্য ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁকে খুবই নাজেহাল হতে হয়। ভারতবাসীরা তাঁর শুভ প্রচেষ্টার দরুন কিন্তু তাঁকে নিতান্তই আপন করে ভাবতে শিখলেন। এর প্রমাণও মাঝে মাঝে পাওয়া যেতে লাগল। আমরা এ সম্বন্ধে কিছু কিছু পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষে রিপন কার্যভার পরিত্যাগ করে স্বদেশে চলে যান। এই সময়কার স্বতোৎসারিত বিদায় অভিনন্দন সপক্ষ প্রতিপক্ষ উভয়েরই মনে ভীষণ দোলা দিয়েছিল। রিপন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে ট্রেন যোগে বোম্বাই গমন করেন। প্রতিটি স্টশনে তাঁর যে বিপুল সম্বর্ধনা হয়েছিল তাতে বুঝা গেল তিনি ভারতবাসীর চিত্ত কিরূপ জয় করেছিলেন। এই সময়ে ভারতবাসীর মনে যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয় তা দেখে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র হকচকিয়ে গেল। ঝানু সিবিলিয়ান রাজস্ব সচিব স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন একখানি পুস্তিকা লিখলেন "*If it be real what does it mean ?*" শিরোনামায়। বলাবাহুল্য তিনি ভারতবাসীরআশা আকাঙ্ক্ষাকে আদৌ ভাল চোখে দেখেন নি। তবে তিনিও এই পুস্তিকায় লিখতে বাধ্য হলেন—"বিরাট ভারতবর্ষের শুষ্ক অস্থিতে নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।"

রিপনের সময়ে প্রধান দু'টি কাজ—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন এবং প্রজাস্বত্ব আইন নিয়েও ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এ দুটি ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারত সভার নেতৃবৃন্দ তাঁর সপক্ষতা করেছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তারা অনুকূল জনমত গঠনে কতখানি প্রয়াসী হয়েছিলেন তা আজিকার দিনেও আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ—এ দুটিই ছিল তাঁদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি স্বরূপ। রিপনের ভারত ত্যাগের পর এ দু'টি আইনে পরিণত হয়েছিল। প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ভূম্যধিকারীদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সবিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিলেন এ কথারও উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। এই সময়ে মনে হয় ভারত সভার জনমত-নির্ভর কার্যকলাপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকেও খানিকটা উজ্জীবিত করেছিল। তাই দেখি ১৮৮৫ সনে দ্বিতীয় ন্যাশনাল কনফারেন্স যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এর সঙ্গে সহযোগিতা করতে উদ্যোগী হলেন। এই দ্বিতীয় কনফারেন্সের কথায় এখন আসা যাক। একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দও একটি সম্মিলিত উদ্যোগের কথা শুধু ভাবেন নি, এ জন্য সক্রিয় ভাবে কর্মতৎপর ও হয়েছিলেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং তাদের অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কংগ্রেসের মূল ভাবনা এবং প্রকৃতিগত পার্থক্যও আমাদের নিকট পরবর্তী আলোচনায় বিশেষ করে ধরা পড়বে।

প্রথম ন্যাশনাল কনফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন অপেক্ষা দ্বিতীয় ন্যাশনাল কনফারেন্স ছিল অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক। উত্তর ভারতের ত্রিশটিরও বেশী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্মেলনে নিজ নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। দক্ষিণ ভারত থেকেও প্রতিনিধিরা এসে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তবে তাদের সংখ্যা ছিল তুলনায় স্বল্প। যে সব রাজনৈতিক সভা সমিতি এখানে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন আজিকার দিনে এ সবের উল্লেখ আমাদের বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করবে। এই সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এই। একটু আগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সক্রিয় সহ-যোগিতার কথা বলেছি। মুসলমান নেতৃবৃন্দও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে

এসে এতে যোগ দেন। দেখা যায় ঐ সময়ে ভারত সভা ও ভারতবর্ষীয় সভা ব্যতিরেকে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন নামেও একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়েছে। এর কর্ণধার ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। উপস্থিত প্রতিনিধিগণের নাম থেকে দ্বিতীয় সম্মেলনের ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আঁচ্ করতে পারি। এদের মধ্যে ছিলেন :

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, নেপালের রাজদূত, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, এইচ. জে. এস. কটন, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব (ভারত সভার সভাপতি), রাজা পূর্ণেন্দু দেবরায় (বাঁশবেড়িয়া), আমীর আলি, দুর্গাচরণ লাহা, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তর পাড়া), ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যবাদী ঘোষাল, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, কালীমোহন দাশ, জওলা প্রসাদ শর্মা, বদ্রীদাস বাহাদুর, লালমাধব মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ মোহিনীমোহন বসু, জগন্নাথ খান্না, সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, চণ্ডীচরণ সেন, কিশোরীলাল গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, উমানাথ গুপ্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরী (ময়মনসিংহ), গোবিন্দচন্দ্র দাস, অভয়চন্দ্র গুহ, এস. জে. পাদ্‌শা, নলিনাক্ষ বসু (বর্ধমান), ব্রজকিশোর বসু (বহরমপুর), কালীশঙ্কর শুকুল, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউনসিলের সদস্য বিষণনারায়ণ মাণ্ডলিক। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ বাদে বঙ্গের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও গঞ্জ থেকেও অনেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন হ'ল ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৫। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভবন এর জন্য ছেড়ে দেওয়া হ'ল। প্রথম সম্মেলনের কার্যক্রম এবারেও কম বেশী অনুসৃত হয়। প্রথম দিন ২৫শে ডিসেম্বর, সভাপতির আসন গ্রহন করলেন দুর্গাচরণ লাহা। উদ্বোধন বক্তৃতায় সভাপতি দুর্গাচরণ এই মর্মে বলেন : সময়ের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। বিশ ত্রিশ এমন কি দশ বৎসর আগেও যা আমাদের উপযোগী ছিল এখন তা আর পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয় না। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি কি নূতন

ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন সে সম্বন্ধেও সকলকে ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করতে হবে। এরূপ আলাপ আলোচনা সুফলপ্রসূ না হয়েই পারে না। এর পর তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করতে আহ্বান করেন।

প্রথম প্রস্তাবটি ছিল নির্বাচনের ভিত্তিতে আইন সভা সমূহের পুনর্গঠন সম্পর্কে। পূর্ব সম্মেলনে প্রতিনিধি-মূলক শাসন সম্পর্কিত যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এ প্রস্তাব তারই অনুরূপ। সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে, ভারতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা সমূহ এমন ভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাতে জনমত প্রতিফলিত হতে পারে। নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন দ্বারাই এটা সম্ভব। তের জন প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের আলোচনায় যোগ দেন। তাদের মধ্যে কালীমোহন দাশ, ডক্টর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা), অম্বিকাচরণ মজুমদার (ফরিদপুর), এবং ভি, এন, মাণ্ডলিকের (বোম্বাই) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কটন সাহেবও এই প্রস্তাবের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এ দেশে কিরূপে আইন সভার প্রতিনিধি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারে, ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তা বিবেচনা করতে নেতৃবৃন্দকে তিনি অনুরোধ জানান। আইন সভা পুনর্গঠন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হ'ল। এতে ছিলেন :

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, দুর্গাচরণ লাহা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পূর্ণচন্দ্র সিংহ, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, আনন্দ মোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ বিশ্বাস, কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, পার্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন উত্তর পাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। দানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সে যুগে তাঁর জুড়ি খুব কমই দেখা যেত।

অস্ত্র আইন, সরকারী ব্যয় সংকোচ ও সিবিল সার্বিস ছিল এ দিনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। অস্ত্র আইন সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন আশুতোষ বিশ্বাস। তিনি বলেন ঃ ১৮৫৮ ও ১৮৬০ সনের অস্ত্র আইন অপেক্ষা ১৮৭৮ সনের অস্ত্র আইন নিরতিশয় নিকৃষ্ট এই জন্য যে, এ আইন দ্বারা শুধু ভারতবাসীদের নিরস্ত্র করা হয়েছে, কিন্তু বিদেশীর উপর এ প্রযোজ্য নয়। বিদেশীরা স্বচ্ছন্দে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। ভারতবাসীদের নিরস্ত্র করায় তাদের দুর্গতি যে কতগুণে বেড়েছে মীরাট, আসাম ও বাঙলার প্রতিনিধিরা একে একে তা বিবৃত করেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অস্ত্র আইন ভারতবাসীদের পক্ষে অযশস্কর। এই আইনের প্রয়োগে ভারতবাসীকে নির্বীর্য করে তোলা হচ্ছে। নিরস্ত্র হওয়ায় বন্য পশু ও চোর ডাকাতের উপদ্রব থেকে তারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে পড়ছে। সভাপতি আলোচনার উপসংহারে এ দুর্গতির কথা বিশদ করে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সিপাহী যুদ্ধের সময়েও তাঁরা নিজেদের এমন অসহায় মনে করতেন না। তাঁর স্বগ্রামবাসী এলাহবাদের মুন্‌সেফ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্র ব্যবহারের নৈপুণ্য হেতু একাই সিপাহী বিদ্রোহের সময় শত শত সিপাহীকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ জন্য প্যারীমোহন 'ফাইটিং মুনসেফ্' আখ্যা পান। জয়কৃষ্ণের নিজ জমিদারিতে বন্য পশুর দৌরাত্ম্যে হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত হয়ে যায়। অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় প্রতিকার করা সম্ভবপর হয়নি। কৃষকের পক্ষে অস্ত্রের লাইসেন্স পাওয়া দুর্ঘট।

এ দিনকার দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ। সভাপতি স্বয়ং এ বিষয়ক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রচুর তথ্যাদি উদ্ধৃত করে দেখান যে, সরকার অবিরত অনাবশ্যক ব্যয় বাড়িয়ে চলেছেন। হোম চার্জেস, সামরিক ব্যয়, বিভিন্ন বিভাগীয় খরচা ইচ্ছা করলে সরকার কমাতে পারেন। তিনি প্রত্যেকটি স্বদেশবাসীকে এ বিষয়ে ধীর স্থির স্থির ভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাশী সার্বজনিক সভার দামোদর দাস সহ কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়ের আলোচনায় যোগ দেন। কিন্তু কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ঐ দিন গৃহীত হয়

নি। তৃতীয় দিনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হল, সরকারী ব্যয়ের সংকোচ সাধন করা প্রয়োজন এবং এটা সম্ভব। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এ বিষয়ে ইতিমধ্যে সরকারের নিকট দাবি পেশ করেছেন জেনে এ ব্যাপারটি তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই দিনকার তৃতীয় প্রস্তাব ছিল সিবিল সার্বিস বিষয়ে। রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করে একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন। লর্ড রিপনের আমলে এ বিষয়ে ভারত সরকার যে অনুকূল ডেস্‌প্যাচ্‌ প্রেরণ করেছিলেন ভারত সচিব নানা অজুহাতে তা বাতিল করে দিতে প্রয়াসী হন। কালীচরণ বক্তৃতায় প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির উল্লেখ করে এই প্রয়াসের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কানাইপুর শাখা সমিতির পক্ষ থেকে হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং মীরাটের জনৈক প্রতিনিধিও ঐ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নেন।

তৃতীয় দিন, অর্থাৎ, ২৭শে ডিসেম্বর তারিখের অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত হন শোভাবাজার রাজ পরিবারের মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ। বিবিধ জনহিতকর প্রচেষ্টায় নরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় সভার সহকারী সভাপতির পদ ব্যতিরেকে, তিনি কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি, যা এখন ন্যাশানাল লাইব্রিরি বা জাতীয় গ্রন্থাগাররূপে পরিচিত—অধ্যক্ষ সভার সভাপতি পদে দীর্ঘকাল বৃত ছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা—সংস্কৃতি প্রসারে তাঁর সহায়তা ছিল অসামান্য। এদিনকার প্রধান আলোচ্য বিষয় শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ। প্রথম জাতীয় সম্মেলনেও এ বিষয়টি বিশেষরূপে আলোচিত হয়েছিল। মীরাট, আসাম, বাঙলা ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ শাসন ও বিচারের ভার একই লোকের হাতে থাকার জন্য তাদের এলাকায় কিরূপ অনাচার ও অবিচার ঘটছে তার বিশদ বিবরণ পেশ করে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই আলোচনায় যোগদান করেন। তিনি বলেন যে, লর্ড রিপন শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করবার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যকরী হয় নি।

পুলিশ বিভাগের সংস্কার সাধনের সপক্ষে এ দিনকার সভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন কলকাতার স্মল কজেস্‌ কোর্টের প্রাক্তন ম্যাজিষ্ট্রেট কুঞ্জলাল

বন্দোপাধ্যায়। পুলিশের অনাচারের কথা বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা তথ্যাদি সহ উল্লেখ করেন। অপর একটি প্রস্তাবে ভারত শাসন সম্পর্কে পার্লামেণ্টকে একটি অনুসন্ধান কমিশন প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বে প্রতি বৎসর জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে কিছু বলেন। এলাহবাদ মীরাট প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ সুরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করে বললেন যে প্রতিবৎসর এক স্থানেই সম্মেলনের আয়োজন না করে বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহবাদ, লাহোর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পালাক্রমে এই সম্মেলন অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে সকলে একমন হন এবং পর বৎসর কোথায় অধিবেশ হবে তা পরে ঠিক করা হবে বলে নেতৃবর্গ মত প্রকাশ করলেন।

এখানে আর একটি বিষয়ও বিশেষ লক্ষনীয়। এই সম্মেলন শেষ হওয়ার পর দিন বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের উদ্যোক্তারা কলকাতার জাতীয় সম্মেলন অথবা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা প্রভৃতি সর্বভারতীয় কোন প্রতিষ্ঠানকে কিছু জানান নি। তৎসত্ত্বেও উক্ত অধিবেশনের কথা জানতে পেরে তৃতীয় দিনের অধিবেশন থেকে জাতীয় সম্মেলন শুভ কামনা করে বোম্বাইয়ে একটি তারবার্তা পাঠালেন।

এই প্রথম আমরা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজনের কথা পেলাম। প্রায় তিন বৎসর ধরে এই প্রচেষ্টা চলতে থাকে। তবে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং নবাগত কংগ্রেসের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। কংগ্রেসের উদ্যোগ আয়োজনের কথা প্রসঙ্গে এ ব্যাপারটি আমাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই কথাই এখন বলব।

সাধারণভাবে এলান অক্টাভিয়ান হিউমকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কেহ কেহ জনকও বলে থাকেন। হিউম কিন্তু নিজেই বলেছেন জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার গৌরব তার একার প্রাপ্য নয়। আরও অনেকের মনে তখন এই ভাবনা জেগেছিল। তবে হিউম এ বিষয়ে অত্যধিক তৎপর হয়েছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়। হিউম ছিলেন, আগেকার দিনের আই, সি, এস। তখনকার অন্যান্য অনেক ইংরেজের মত তিনিও ভারতবর্ষের হিতার্থী ছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় হিউম ছিলেন

উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। এটোয়া হয়ে ওঠে তখন সিপাহী যুদ্ধের প্রধান লীলা ক্ষেত্র। হিউম স্বয়ং এর ভয়াবহতা লক্ষ্য করেন। তিনি তখনই বুঝেছিলেন ব্রিটিশ ও ভারতবাসীর মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হলেই উভয় জাতির মঙ্গল। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি জীবনভর কাজ করে যান। সত্তরের দশকের পুরোটাই ছিলেন তিনি ভারত-সরকারের সেক্রেটারি। এই দশকে ভারতবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও কিরূপ আত্মসচেতনতা দেখা দেয় তা আমরা ইতিপূর্বেই জেনে নিয়েছি। এই সময়ে যে ধরনের শাসন পদ্ধতি অনুসৃত হয় তার ফলে শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে ভীষণ মত বিরোধ এবং তজ্জনিত আন্দোলনের সূচনা হয়। সরকারের বৈদেশিক নীতি এবং তার দরুন অজস্র অর্থ ব্যয় অপরদিকে ভারতবাসীর অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশা আর দক্ষিণ ভারতের ব্যাপক দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির দরুন উভয়ের ভিতর বিচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সময় হিউম জানতে পেরেছিলেন যে, সারা দক্ষিণভারতে এমন একটি বিদ্রোহ আসন্ন যার নিকট সিপাহী যুদ্ধও ম্লান হয়ে যাবে। এর মূল কারণ ছিল জনশক্তির উত্থান। তথাকথিত শিক্ষিত, সামান্য শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনগণ পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলান একই উদ্দেশ্যে। ভারত সরকারের সেক্রেটারি রূপে হিউম এ সব বিশেষভাবে অবগত হন। তিনি আরও খোঁজ পান, সাত খণ্ড বইয়ে শাসক শ্রেণীর এমন সকল লোকের নাম লেখা ছিল যারা পরপর ভাবী বিদ্রোহের শিকার হবেন। হিউমের ভারত প্রীতি তখনকার রক্ষনশীল কর্তৃপক্ষ মোটেই ভাল চোখে দেখেন নি। পদোন্নতি দূরে থাক তাঁকে নিম্নতম পদে নিযুক্ত করে এলাহবাদে পাঠান হয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও হিউম ব্রিটিশ ও ভারতবাসীর সম্প্রতিকে সকলের চেয়ে অধিক আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞান করতেন। ১৮৮২ সনে সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পরই এই উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ভারত-বাসীদের সত্যকার মঙ্গল তখনই সম্ভব যখন তারা নিজেরাই আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবেন। তাঁর বিখ্যাত *Old Man's Hope* শীর্ষক কবিতাটিতে এই ভাবনা নিরতিশয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস কৃত এর অনুবাদ এখানে দিলাম।

১

অলস হইয়া বসি ভারত সন্তান,
সাহায্য করিছ ভিক্ষা কোন্ দেবতার ?
সাধ কার্য্য—কর সজ্জা—করহ উত্থান,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

২

তোমরা কি চিরদাস অথবা স্বাধীন—
দিশেহারা অন্ধকারে ডুবে চিরদিন ?
তোমাদের (ই) হস্তে ইহা মীমাংসার ভার,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার।

৩

এই যে বসেছে টেকস্, ব্যয়ের সময়
মতামত দিতে পার—আছে অধিকার ?
সত্যের জানিও জয়—জানিও নিশ্চয়,
ওঠ, কর প্রতিবাদ, ভয় কি তোমার ?
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৪

যদিও বিপদাপন্ন সমস্তই হায়
তবু দেশ তোমাদেরি, তোমাদেরই প্রাণ—
সর্বস্বই তোমাদের ; ক্ষমতা কোথায়
সাধিতে অহিত কিংবা করিতে কল্যাণ ?
বোবা কি তোমরা ? সবে চাহ অধিকার ;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার।

৫

ঐশ্বর্য্যে কি উপকার ? কোন্ প্রয়োজন
হেন শিক্ষা শূন্যোপাধি নীচ ব্যবসার ?
মূল্যবান ততোধিক স্বায়ত্ত-শাসন ;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার।

৬

তোমরা কি অন্ধ কিংবা শিশু সমুদয়
হামাগুড়ি দেয় যারা ভয়ে নত ভীত ?
থাকিবে কি চিরকাল শৈশব সময় ?
আপনার যত্নে জাতি হয় সংগঠিত।

৭

কানাকানি আর্ত্তনাদ চলেছে আঁধারে
হামাগুড়ি দিয়া যায় ক্ষুদ্র কীটচয়,
সাধ্য কি এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে
উপত্যকা তলে যারা লুকাইয়া রয় !
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয় !

বোঝ কি এত যে ক্লেশ সহ অবিরাম ?
অপমান অনুভব কর কি হৃদয় ?
কর অন্যায়ের সঙ্গে নির্ভয়ে সংগ্রাম,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয়।

৯

চেয়ো না সাহায্য স্বর্গ নরকের কাছে,
আত্মার ভিতরে খোঁজ সেখানেই আছে,
যে করে সাহস ইচ্ছা সর্বস্ব তাহার
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার।

ভারত সন্তান সবে হও হে জাগ্রত,
হও কার্য্যে অগ্রসর করি প্রাণপণ,
অবাধে কার্য্যের গতি কর প্রবাহিত,
প্রাণান্তে দিও না তাহা রোধিতে কখন।

দেখ পূর্বদিকে চেয়ে অরুণ উদয়,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয়!*

হিমউ ১৮৮৩, ১ মার্চ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট-গণকে সম্বোধন করে উক্ত মর্মে একখানি পত্র লেখেন। জাতীয়তার দিক থেকে এই বিখ্যাত পত্রখানি বাস্তবিকই পথনির্দেশকও বলা চলে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন ঐ সময়ে সমগ্র উত্তর ভারত—পেশওয়ার থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৮৬ সালে পঞ্জাব এবং ১৮৮৮ সনে মাত্র এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিউম উক্ত পত্রে এই মর্মে বলেন: "তাঁর মত বিদেশীরা ভারতবাসীদের কার্যে সাহায্য করতে পারেন মাত্র। কিন্তু স্বদেশ হিতকর কার্যে, শাসন ব্যাপারে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলের আগে তাদের অগ্রসর হতে হবে। যদি পঞ্চাশ জন উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসী ব্যক্তি-স্বার্থ ভুলে দেশ সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন তা হলে তারা অনেক সৎকার্য সাধন করতে পারেন। আর যদি এটুকুও সম্ভব না হয় তা হলে চিরকাল পরের দাসানুদাস হয়ে তাদের থাকতেই হবে। তারা যেন সর্বদা স্মরণ রাখেন যে, কি ব্যক্তি কি জাতি সকলেরই সুখ ও স্বাধীনতার পাথেয় হ'ল আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতা। তাদের অদৃষ্টের তারাই নিয়ামক।"

হিউম বসে রইলেন না। এই ১৮৮৩ সনেই প্রথম দিকে তার উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ইউনিয়ন গঠিত হয়। এই ইউনিয়নের উদ্দেশ্য তিনি এরূপ বিবৃত করেন। স্মরণ রাখা দরকার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে হিউমের এই ভাবধারণা দেখতে পাই। ইউনিয়নের উদ্দেশ্য তিনভাগে বিভক্ত হয়, যথা—প্রথম, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের পৃথক পৃথক অংশকে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ জাতিতে সম্মিলিত করা, দ্বিতীয়, এরূপ সম্মিলিত জাতিকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক সকল দিকেই পুনরুজ্জীবিত করা; তৃতীয়, ভারত-বর্ষের অধিবাসীদের প্রতি প্রযোজ্য যে-সব আইন নিয়ম বা বিধি অন্যায় ও ক্ষতিকর তা দূর করে ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের সখ্যভাব দৃঢ় করা। হিউমের

. * মূল ইংরেজী পরিশিষ্ট—২-এ দ্রষ্টব্য অনুলেখ্য।

নির্বন্ধাতিশয়ে করাচী, আহ্‌মদাবাদ, সুরাট, বোম্বাই, পুণা, মাদ্রাজ, কলকাতা, বারাণসী, এলাহবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা ও লাহোরে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হ'ল। তিনি ঐ বছরের শেষে পুনরায় একটি সম্মেলন আহ্বানেরও পক্ষপাতী ছিলেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার প্রথম ন্যাশানাল কনফারেন্স, আমরা দেখেছি, অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৩ সনের ডিসেম্বর মাসে। কলকাতার ভারতসভার নেতৃবৃন্দ ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। হিউমের সঙ্গে সভার নেতৃবৃন্দ বা প্রথম ন্যাশনাল কনফারেন্সের এই সময়ে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। অনুমান হয় হিউম নিজে থেকেই ঐরূপ উদ্যোগ করেছিলেন। 'হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রিডম' গ্রন্থে অ্যানি বেসান্ত লিখেছেন—মাদ্রাজের থিওসফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র আডিয়ারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থল থেকে সোসাইটির প্রধান প্রধান সভ্যরা প্রতি বৎসর ডিসেম্বরে মিলিত হতেন। এই সকল সভ্য এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কেহ কেহ ঐ সময়ে মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয় দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও-এর গৃহে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয় আলোচনা করেন। এই আলোচনা সভায় (১৮৮৪) বিভিন্ন প্রদেশের ১৭জন বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বেসান্ত কলকাতার নরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মীরর' থেকে নামগুলি এরূপ দিয়েছেন :

মাদ্রাজ : সুব্রহ্মণ্য আয়ার, রাঙ্গিয়া নাইডু, এবং আনন্দ চার্লু।

কলকাতা : নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ।

বোম্বাই : ভি. এন. মাণ্ডলিক, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, দাদাভাই নৌরজী।

পুনা : সি. ভি. মুদালিয়র, পাণ্ডুরাঙ্ গোপাল।

বারাণসী : সর্দার দয়াল সিং।

এলাহবাদ : হরিশ্চন্দ্র।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ : কাশীপ্রসাদ, পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ।

বাঙলা : চারুচন্দ্র মিত্র।

অযোধ্যা : শ্রীরাম।

ভাবী কংগ্রেসের বীজ এখানেই উপ্ত হয়, বেসান্ত উচ্ছ্বসিত ভাষায় এরূপ লিখে গেছেন। এই উপলক্ষে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে হিউমের নাম পাই না। পক্ষান্তরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃস্থানীয়দের ইতিপূর্বেই পরিচয় ঘটেছিল। কাজেই তিনি যে এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে থাকবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ দেখি না। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে বোম্বাইয়ের কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙের উল্লেখ পাই। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন তেলাঙ মহোদয় তাঁর নিকট থেকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রথম ন্যাশনাল কনফারেন্সের খসড়া কার্য বিবরণ চেয়ে নেন।

হিউমের প্রচেষ্টাও স্বতন্ত্রভাবে চলতে থাকল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন সম্পর্কে এক বিবৃতি নানা স্থানের নেতৃবর্গের নিকট প্রেরিত হয়। যে-সব কর্মী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতির উন্নতি-মূলক কার্যে নিয়োজিত তাদের পরস্পরের ভিতর ভাব বিনিময় এবং আগামী বৎসরে করণীয় রাজনীতিক বিষয়গুলির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য বলে বিজ্ঞাপিত হ'ল। হিউম অতঃপর অল্প দিনের জন্য বিলাত যান ও এ বিষয়ে লর্ড রিপন, জন ব্রাইট প্রভৃতি ভারত-বন্ধুদের পরামর্শ নেন। পার্লামেন্টে ভারতীয় পক্ষের কথা যাতে ব্যক্ত হতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করলেন। তখন হাউস অব কমন্সএ ভারত সচিবই ছিলেন ভারতবর্ষের একমাত্র মুখপাত্র। তার কথাই এতদিন পার্লামেন্টের সভ্যগণ বেদবাক্য বলে মেনে নিতেন। কিন্তু ভারতসচিবের মারফত শুধু ভারত সরকারের মতামতই ব্যক্ত হত। ভারতীয় জনসাধারণের কথা তাদের অজ্ঞাতই থেকে যেত। হিউম আর একটি ব্যবস্থা করলেন। রয়টার এবং ইলণ্ডের পত্রিকাগুলির ভারতস্থিত সংবাদদাতারা ইংরেজ পক্ষের কথাই বেশী করে সরবরাহ করতেন। হিউম 'ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন' নামে একটি ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন এবং লণ্ডনেরও প্রাদেশিক পত্রিকাগুলির সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান-প্রদত্ত সংবাদ মুদ্রণের ব্যবস্থা করলেন।

হিউম ভারতবর্ষে ফিরে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গেও এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শের ফলেই যে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাপকতর

করা হয় তার প্রমাণ আছে। হিউম প্রথমে সম্মেলনকে মূলত একটি সামাজিক অনুষ্ঠান করেই গড়তে চেয়েছিলেন। পার্লামেণ্টে যেমন একটি সরকার বিরোধী দল থাকে, এখানে জনসাধারণের মতামত অবগতির জন্য লর্ড ডাফরিন একে সেইরূপ আইনানুগ একটি সরকার বিরোধী দল হিসাবেই দেখতে চান। হিউম এ কথার সারবত্তা বুঝে বন্ধুবর্গকে এ সম্বন্ধে লিখলেন। তারা এতে সম্মতি দেওয়ায় সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাজনীতির আলোচনাকেও প্রাধান্য দেওয়া স্থির হ'ল। প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হিউম বোম্বাইয়ের গবর্ণরকে এর সভাপতি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এরূপ হ'লে প্রতিনিধিদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটবে—এজন্য লর্ড ডাফরিন হিউমকে ঐরূপ অভিপ্রায়ও ত্যাগ করতে বলেন। এই লর্ড ডাফরিনই কিন্তু তাঁর আমলের শেষের দিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। ঐ সময় লর্ড ডাফরিন হিউমকে বলেছিলেন, তাঁর ভারতবর্ষে অবস্থানকালে এ পরামর্শের কথা যেন সাধারণ্যে প্রকাশ না পায়। শেষের দিকে ডাফরিনের ব্যবহারে তিত-বিরক্ত হলেও হিউম বা তাঁর বন্ধুবর্গ কখনও এ কথা প্রকাশ করেন নি।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে কি চিন্তা কার্য করেছিল তার কতকটা আভাস আমরা এতক্ষণে পেয়েছি। হিউম চেয়েছিলেন শিক্ষিত ভারতবাসী একত্র হয়ে তাঁদের অভাব অভিযোগ, আজকালকার পরিভাষায়, দাবি দাওয়ার কথা একযোগে সরকারের নিকট উপস্থাপিত করেন। প্রথমে হিউম কোন পথে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন তাও আমরা এই মাত্র জেনে নিয়েছি। ভাবী কংগ্রেস তাদের নিকট হবে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক মিলন ক্ষেত্র আর উচ্চ শিক্ষিতেরাই এর নেতৃপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তখনকার দিনে বাঙলা তথা ভারতবর্ষে জনসাধারণের মনে যে অভূতপূর্ব চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তার সঙ্গে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের কতখানি যোগাযোগ ছিল তা এখনও ঠিক করে বলা কঠিন। ভাবী কংগ্রেসকে, তাই দেখি, কোন কোন লেখক সরকারের পক্ষে একটা সেফ্‌টি-বাল্‌ব রূপে গণ্য করেছেন। এর মানে জনসাধারণকে এড়িয়ে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত নেতৃবর্গ তাদের মনের কথা নিসংকোচে জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করবেন। তা পূরণ অংশতও হয় কি না তার দিকে তাদের লক্ষ্য একান্তভাবে নিবদ্ধ নাও হতে পারে। এই জন্যই সরকারের পক্ষে এটাকে

সেফ্‌টি-বাল্‌ব বলে আখ্যাত করা হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে কংগ্রেসই জাতীয় আদর্শ ও কর্মের প্রধান অভিব্যক্তির ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারত সভার নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা কিন্তু জনসাধারণের মধ্যেই অত্যধিক নিবদ্ধ ছিল। প্রতিষ্ঠার দশ বৎসরের মধ্যেই তখনকার দিনে শিক্ষিত সাধারণের মনে যে, আশা আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়েছিল, বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে প্রজা শক্তিকেও তার অংশী করা হয়। শুধু উচ্চ শিক্ষিতেরাই নয়, সাধারণ সামান্য শিক্ষিত, এমন কি তথাকথিত অ-শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও ভারত সভার ভাবনা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। আর এই দরুনই এক অভূতপূর্ব প্রজা শক্তির উত্থান ঘটে। হিউম প্রমুখ নেতৃবর্গ যে এই নবোদ্ভূত প্রজাশক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু তাদের মনে প্রজা সাধারণ এবং সরকার এই দুয়ের ভেতর একটি সার্থক যোগাযোগ স্থাপনের ভাবনাই বেশী করে দেখা দেয়। সেই জন্য অনেকে বলেছেন কংগ্রেস জনসাধারণ এবং সরকার এই উভয়ের ভেতরে যোগ সাধনের নিমিত্ত একটি মাধ্যমরূপে পরিগণিত করার চেষ্টা চলে প্রথমাবধি বহু বৎসর পর্যন্ত। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টার সঙ্গে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল গভীর। হয়তো এই কারণেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে যোগদানের নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে আহূত হন নি ; যদিও তারা এই উদ্যোগকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল এই উভয় উদ্যোগের পার্থক্যের কথা সুন্দর ভাবে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে গিয়েছেন। তাঁর কথায় ঃ

"ফলতঃ কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব হইতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারতসভার কর্ম-নায়কগণ একটা বিরাট জাতীয় সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা করেন। এই আদর্শের অনুসরণেই নানাস্থানে ভারত-সভার শাখা প্রতিষ্ঠা হয়। কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে চতুর রাষ্ট্রনীতিক লর্ড ডাফরিনের যে কতকটা সম্বন্ধ ছিল, ইহা এখন সকলেই জানেন। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ দেশে যে বিপুল প্রজাশক্তি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াও যে কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই একথা বলাও কঠিন। বোম্বাইয়ে গোপনে গোপনে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন হইতেছিল, সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন

ভারতসভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় একটা জাতীয় সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের সমকালেই কলিকাতার * এলবার্ট হলে সমিতি বা National Conference-এর অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের খবর রাখিতেন কি না, জানি না। কিন্তু এই কনফারেন্সে দেশের নানা স্থান হইতে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁরা যে কংগ্রেসের কথা কিছুই শুনেন নাই, ইহা জানি। ইঁহারা সকলেই এই National Conference কে ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার এবং ভবিষ্যৎ প্রজাশক্তির আধার বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভারতের জেলায় জেলায় লোকমত সংগঠনের জন্য যে সকল রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠান করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন সেগুলির শক্তি হরণ করিয়া কংগ্রেস দেশের প্রকৃত রাষ্ট্রীয় জীবনকে দুর্বল করিয়াছে ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে।" (চরিত কথা, পৃঃ ৫১—৪)।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল এখানে ভারত সভার নেতৃবৃন্দ, বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহন প্রভৃতির দ্বারা আয়োজিত ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং প্রধানত হিউমের প্রচেষ্টায় আয়োজিত ন্যাশনাল কংগ্রেসের মূল পার্থক্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। ভারত সভার দ্বারা যে প্রজাশক্তির জাগরণ সম্ভবপর হয়েছিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। এই প্রজা শক্তির পুণর্জাগরণের জন্য আমাদের পঁয়ত্রিশ বৎসরাধিককাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ভারতের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আবির্ভাব থেকে আবার প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান ঘটে।

* এলবার্ট হল ভুল করে লেখা। অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে।

পরিশিষ্ট—১

হিন্দুমেলা

কংগ্রেস পূর্ব যুগের মুক্তি আন্দোলনে হিন্দুমেলার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে "মুক্তির সন্ধানে ভারত" পুস্তকে 'জাতীয়তা-মন্ত্রে দীক্ষা/চৈত্র বা হিন্দুমেলা' শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে। এই প্রতিষ্ঠানটির আনুপূর্বিক ইতিহাস যোগেশচন্দ্র 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' পুস্তকে সংকলন করেছেন। মুক্তির সন্ধানে ভারত (কংগ্রেস পূর্বযুগ) পুনর্লিখনের সময় এই অধ্যায়টি তিনি নতুন করে লেখেন নি। 'কিন্তু এটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' পুস্তক থেকে 'জাতীয়তা-মন্ত্রে দীক্ষা/চৈত্র বা হিন্দুমেলা' অধ্যায়টি এখানে সংযোজন করে দিলাম।

—অনুলেখক।

হিন্দুমেলা

চৈত্র বা হিন্দুমেলা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করে। এজন্য এ সম্বন্ধে এখানে একটু বিস্তৃতভাবে বলতে হবে। রাজনারায়ণ বসু আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তাঁর জাতীয় গৌবব সঞ্চারিণী সভার আদর্শ ও কার্যকলাপ হ'তে "Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal", অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ-বৃদ্ধিকল্পে একটি সভার অনুষ্ঠান-পত্র রচিত হয়। এই অনুষ্ঠানপত্র-পাঠে তাঁর অন্যতম বান্ধব নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভার পান। হিন্দুমেলা-স্থাপনের পর এর অধ্যক্ষতা করবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এও তাঁর (রাজনারায়ণ বসুর) সভার আদর্শে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু 'মেলা' নামটি নবগোপালেরই দেওয়া। মেলা কথাটির সঙ্গে ভারতবাসীর যোগ প্রকৃতিগত ও ঘনিষ্ঠ।

এই চৈত্রমেলায় শিক্ষিত সমাজ সমবেতভাবে স্বদেশের কথা আলোচনা করতে শুরু করেন। এজন্য ভারতের রাজনৈতিক ইতিবৃত্তে এর স্থান স্ব-মহিমাতেই উজ্জ্বল। নবগোপাল মিত্র ছিলেন এর প্রাণ। এ কার্যে তাঁর বিশেষ সহায় হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা-যত্নে রাজনারায়ণের ভাব-বীজটি ফল-পুষ্প-ভারাবনত একটি সুন্দর মহীরুহে আত্মপ্রকাশ করে ১৭৮৮ শকে (ইংরেজী ১৮৬৭ সাল) চৈত্র সংক্রান্তিতে। নবগোপাল সহকারী সম্পাদক-রূপে চৈত্র মেলার যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করতেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৭৮৯ শক, ৩০শে চৈত্র তারিখে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন :

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। এক

দিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম-সাধন, অনেক উৎসাহবৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। **আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারত ভূমির জন্য।**

"ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর, এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে; অতএব **যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।**"

মেলার কার্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হ'ল ও প্রত্যেকটি পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক মণ্ডলী গঠিত হ'ল। মেলার উদ্দেশ্য ছিল সর্বতোমুখী। আর এর সম্পাদনে বঙ্গের গুণি-মানীরা অনেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের ভিতর রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, সালিকরাম, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাল লাল মিত্র, অম্বিকাচরণ গুহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দুমেলার কর্তৃপক্ষগণ জাতীয় জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে সজীব করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। ঐক্যবোধ-বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য—নানা বিষয়েই এঁরা দৃষ্টিক্ষেপ করেন। জাতীয় জীবনের

সকল দিকের সংগঠন ও সংস্কারকল্পে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রথম। আর এ সকল কার্যের মূল লক্ষ্য, বহু দূরবর্তী হলেও, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভ। প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় চৈত্র মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে এ কথা স্পষ্ট ক'রেই ব্যক্ত করেন। এই দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই মেলার কার্যক্রম পুরোপুরি আরম্ভ হয়। প্রায় প্রতিবারেই অধিবেশনের আরম্ভে গীত হ'ত ভারতবাসীর সুবিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'গাও ভারতের জয়'। রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে এর স্থান সুনির্দিষ্ট। ভারতীয় প্রথম সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর রচয়িতা। সঙ্গীতটি এই :

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ? কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান॥
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী, শত খনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা, কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা, অতুলনা ভারত-ললনা
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি।

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ, বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস, কবিকুল ভারত-ভূষণ
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি

বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী, অধীনতা আনিল রজনী ;
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির, দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ, পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু, আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়, যতোধর্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি।

সঙ্গীতের পর সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, সমাজ প্রভৃতি বিবরণ সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে পাঠ করতেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত বিবরণীর একস্থানে তিনি বলেন :

"আবিসিনিয়া যুদ্ধযাত্রাকে ১৭৮৯ শকের (১৮৬৭ খৃ.) ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেননা, এই যুদ্ধব্যয়ের কিয়দংশ ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হইয়াছে।"

এই সামান্য পঙক্তি কয়টিতে গবর্ণমেণ্টের নবানুসৃত সামরিক নীতির দুটি স্পষ্ট দিক প্রতিভাত। সিপাহী যুদ্ধের পর এমন কোন পল্টন আর রইল না যারা সমুদ্রপারে যেতে আপত্তি করতে পারে। আবার এ সময় থেকেই ভারতবর্ষের বাইরেও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় অর্থ ব্যয় ও ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ হতে শুরু হয়।

মেলা ক্ষেত্রে সংস্কৃত, বাঙলা কবিতা, বিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ এবং কুস্তি প্রদর্শনের পর উৎকৃষ্ট কুস্তিগীর, লেখক ও শিল্পীদের পারিতোষিক বিতরণ হ'ত। লেখক ও কবিদের মধ্যে পরবর্তী কালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রজনীকান্ত গুপ্ত। স্বদেশীয় চারু ও কারু শিল্পের সমাবেশ ও বিভিন্ন স্বদেশী কুস্তি ও কসরৎ প্রদর্শন মেলার বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। মহিলাদের হস্তনির্মিত সূচীশিল্প—আসন, জুতো, থলে, খরপোস, পশমের ও সূতীর কার্য, কৃষ্ণনগরের পুতুল, বারাণসী শাড়ী, ঢাকার স্বর্ণকারদের রূপা ও সোনার গড়ন, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, ভাস্করীয় প্রতিমূর্তি, ভারতীয় চিত্রকরদের পটচিত্র ও অন্যান্য ধরনের আঁকা ছবি প্রদর্শনী-বিভাগে স্থান পেত এবং উৎকৃষ্ট পুরুষ ও মহিলা শিল্পী নিজ নিজ দ্রব্যের গুণানুসারে পুরস্কার পেতেন। প্রদর্শনীতে হস্তশিল্প ছাড়া ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্য, বীজ প্রভৃতি উদ্ভিদ্ দ্রব্য, এবং লাঙ্গল, চরকা, তাঁত প্রভৃতি কৃষি ও শিল্পকরণ যন্ত্রাদি রাসায়নিক ক্রিয়া এবং কুস্তি, অশ্বচালন, পাইকখেলা, বাঁশবাজি প্রভৃতি খেলা দেখানো হ'ত।

চৈত্রমেলায় একজন হতেন সভাপতি। তবে সভাপতিকেই যে প্রধান বক্তা হ'তে হবে এমন কোন নিয়ম ছিল না। তৃতীয় বৎসরে মেলার সভাপতি হন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কিন্তু প্রধান বক্তা ছিলেন মনোমোহন বসু মহাশয়। ইনি

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করেন। হিন্দু-মেলার আদর্শে মফস্বলেও বারুইপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে বাঙলা ১২৭৬ সাল থেকেই কলকাতার মেলার আদর্শে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। এ মেলার তৃতীয় অধিবেশনে ১২৭৮, ৩০শে ফাল্গুন মনোমোহন বসু প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৮৭৪ ও ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মেলা হয় কলকাতার পার্শি বাগান উদ্যানে। ১৮৭৫ সালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। রাজনারায়ণ সভাপতি-রূপে বরোদা নিবাসী বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সকে সঙ্গীত ও নড়ালের জমিদার রাইচরণ রায়ের ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্য-প্রদর্শন জন্য স্বর্ণ পদক উপহার দেন। এবারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (তখন মাত্র চতুর্দশবর্ষীয় বালক) 'হিন্দুমেলায় উপহার' নামে একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলায়ও আর-একটি বিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন। তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন দিল্লীতে যে দরবার করেছিলেন তাঁকে উদ্দেশ ক'রেই এ কবিতাটি লিখিত। এর প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি এই,

"দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারই সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?" ইত্যাদি

মেলা এর পরও কয়েক বৎসর চলেছিল। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত যে এর রীতিমত অধিবেশন হয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

যে ব্যাপক আদর্শ নিয়ে বাঙলার শিক্ষিত সমাজ চৈত্রমেলা উদ্‌যাপনে অগ্রসর হয়েছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় পাই আমরা স্বদেশপ্রেমিক মনোমোহন বসুর বক্তৃতাসমূহে। মনোমোহন সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি। তিনি 'মধ্যস্থ' নামে একখানা পত্রিকারও প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে মাসিক) সম্পাদনা করেছিলেন। বাঙালী তাঁরই কাছে জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষা নিল।

তাঁর নাম ভারতবাসীর চিরস্মরণীয়। তিনি দ্বিতীয় মেলায় প্রদত্ত অভিভাষণের প্রথমেই বললেন :

"স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ-ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতিগৌরবরূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবেক, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত-ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবেক। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস নয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে স্বাধীনতা নাম দিয়া অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলন-সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এ সমাবেশ-রূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্যস্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

চৈত্রমেলা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেরই মিলনভূমি। এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মনোমোহন বলেন :

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়ানাবধি এদেশে যত কিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্তক। কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবিচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধমাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত! স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।"

তিনি তাই স্বদেশবাসিগণকে সম্বোধন করে বলেন :

"অতএব হে স্বদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! আসুন আমাদের পরম হিতের জন্য, জননী জন্মভূমির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্যেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষার জন্য শারীরিক বলাধান জন্য, মনের ঔৎকর্ষ জন্য, শিল্প-বিজ্ঞানের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, আসুন আমরা সকলে একত্র মিলিত হই! আজ ইহাকে অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছে বলিয়া অনাদর করা নির্বুদ্ধির কর্ম, আপনাদিগের দ্বারা লালিত পালিত হইলে ইহাই তখন মহামহীরুহ হইয়া উঠিবে। যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর লক্ষ্ণৌয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের, পূর্ব ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী, এবং সমবিদ্য গুণিগণ এই চৈত্রমেলার রঙ্গভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে—যখন দেখিবেন তাহারা এই প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতূল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে—যখন দেখিবেন এই মেলাকে স্বজাতীয় গৌরবভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখন জানিবেন এই নব-রোপিত বৃক্ষের ফল লাভ হইল। সেই শুভ ফল না আসা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক—ধৈর্যধারণপূর্বক সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। অতএব পুনশ্চ বলি, আসুন, আমরা মিলিত হই। জননী জন্মভূমি অধিকতর আদেশ করিতেছেন, তাঁহার দুঃখ বিমোচনে অগ্রসর হউন। চেষ্টা করিলে কখন ব্যর্থ হইবে না।"

হিন্দুমেলার তৃতীয় অধিবেশনে মনোমোহন বসু মহাশয় সামাজিকতার প্রচলিত অর্থ ছাড়া অন্য 'জাতীয়তা-বোধ' সম্বন্ধে এইরূপ বলেন:

"সামাজিকতার যে অন্য একটি মহোচ্চ ব্যুৎপত্তি আছে, দুর্ভাগ্য ক্রমে আধুনিক হিন্দুজাতি যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যুৎপত্তিবোধক সামাজিকতাই লক্ষ্য।...তাহাকে পাইবার জন্যই এত প্রয়াস। সে সামাজিকতার অভাবে কোন জাতি, জাতিপদবাচ্য হইতে পারেনা—সে সামাজিকতার অভাবে স্বাতন্ত্র্য আর অনৈক্য, যথেচ্ছাচার আর পরতন্ত্রতা, ইহারই সমাজরাজ্যের অধিপতি হইয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলার হস্তে অর্পণ করিয়াছে। অতএব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম। সেই স্বজাতিধর্ম আমাদিগের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার

কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্বপ্রযত্নে বিধেয়।"

কিন্তু তা করতে গেলে অগ্রে 'আত্মনির্ভর' নামক শাণিত অস্ত্র দ্বারা 'পরবশ্যতা' রূপ শৃঙ্খলকে ছেদন করতে হবে। সেই আত্মনির্ভর লাভ করবার জন্য এইরূপ সমাবেশই অদ্বিতীয় উপায়। তাই মনোমোহন বলেন :

"স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর সৎসম্ভাষণ, পরস্পরের মনোগত ভাব-বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কিবা উন্নতি আর কিবা অনুন্নতি হইয়াছে তদালোচনাপূর্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প-সাহিত্যাদির প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কার্য হইল, তখন এই মেলা যে স্বাবলম্বনরূপ অমূল্যনিধির আকরস্থল হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করলেই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্তব্য শেষ হয় না। মনোমোহন বসু মহাশয় অভিভাষণে তাই স্বদেশসেবার বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ ক'রে বলেন :

"[অর্থসাহায্য ব্যতীত] যাঁহার যে বিষয়ে যেমন ক্ষমতা, তিনি সেই বিষয়ে তদরূপ সহকারিতা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যিনি মান্য ব্যক্তি, তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা মেলার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা উচিত। যিনি অনুসন্ধিৎসু প্রজ্ঞাবান বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সদুপায় নির্ধারণ ও সদুপদেশ দান করা কর্তব্য। যিনি বিদ্বান্, তিনি অধ্যক্ষ শ্রেণীর বিদ্যোৎসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তাহার গুরুত্ব বিধান করুন। যিনি কবি, তিনি হিতজনক প্রসঙ্গ-পুষ্প ভাবসূত্রে গ্রন্থ করিয়া মেলার অঙ্গশোভা সম্পাদন করুন। যিনি বক্তা, তিনি সদ্বক্তৃতা দ্বারা সমাজের উৎসাহ ও কর্তব্য-জ্ঞানকে জাগরূক করিতে থাকুন। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি সুমধুর সঙ্গীতরসে মেলাভূমিকে অমৃতরসে প্লাবিত করুন। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় কৌতুকী, তাঁহারা যোদ্ধা প্রতি-যোদ্ধা আনয়ন করিয়া বল ও কৌশলের শিক্ষক হউন। যাঁহারা দৃশ্যকাব্যের রসজ্ঞ, তাঁহারা রঙ্গভূমির বিশুদ্ধ আমোদ দেখাইয়া আমোদ ও উপদেশ দান করুন। যাঁহারা উদ্ভিদ্‌ বিদ্যায় ভাবগ্রাহী, তাঁহারা নানাজাতি কুসুম, নানাজাতি ফলমূল, নানাজাতি

তরুলতা, নানাজাতি শস্য, এবং নানাজাতি জলজ শৈবালাদি আহরণ করিয়া অথবা আহরণকারীদিগকে উৎসাহ দিয়া কৃষি ও বাণিজ্যের শোভা ও ভৈষজ্যের উন্নতি সাধন করুন।"

হিন্দুমেলার পঞ্চম অধিবেশন হয় বাঙলা ১২৭৮ সালের ৩০শে মাঘ। এ অধিবেশনে মনোমোহন ধনী ও ভূস্বামীদের ঔদাসীন্যের জন্য খেদ প্রকাশ ক'রে বলেন, "রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা এবং সাধারণ ঐক্যবিধান বিষয়ে এই হিন্দুমেলা, আমাদিগের মগ্নাবস্থার তৃণাশ্রয়বৎ হইয়াছে; এই দুইটিকে প্রাণপণে ধরিয়া রাখিতে হইবেক, ভগবানের কৃপা হইলে এই উভয়ের সাহায্যেই অকূলে কূল পাইতে পারি।"

রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা মুখ্যতঃ একটি জমিদার-সভা হ'লে তখনও স্বদেশবাসীদের মুখপাত্র-রূপে কর্মে লিপ্ত ছিল। এ সভায় বাংলার ধনী মানী ভূম্যধিকারীই অধিক সংখ্যায় সমবেত হতেন। সাধারণ শিক্ষিতেরা অধিক সংখ্যায় এর আওতার ভিতরে যেতে পারতেন না। এজন্য সভার কর্মগুলিতে তাঁদের মতামত কমই গ্রাহ্য হ'ত। সপ্তম দশকের প্রারম্ভেই এ সভার বিরুদ্ধে তাই তখন নানারূপ প্রতিক্রিয়া হতে সুরু হয়। একথা পরে বলব। কিন্তু মনোমোহন বসু মহাশয় হিন্দুমেলার পক্ষ থেকে তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন অর্থ সাহায্য দ্বারা এর সুফলপ্রসূ কার্যকলাপকে সার্থক ও সাফল্য মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁদের লক্ষ্য ক'রে ভাষণটিতে বলেন :

"আয় রে সৌভাগ্যশালী প্রিয় পুত্রগণ! আয় রে আমার ধন-কুবের প্রধান সন্তানগণ! আয় রে রাজ্যাধিকারি—ভূম্যধিকারি কৃতজ্ঞ কৃতি পুত্রগণ! যদি ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সৌভ্রাত্র বন্ধনের আর একতারূপ অতুল্য একাবলিহার ধারনের সুযোগ পাইয়াছ, তবে বৎসগণ! বৃথা অভিমান, অনর্থ গর্ব, সর্বনাশক ইন্দ্রিয়াসক্তির বশীভূত আর থেকো না! স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথ-প্রদর্শক কর; তিনি অচিরে নির্মল আনন্দমন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। হায় বৎস! তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশাভরসা—মধ্যাবস্থ তোমাদের কনীয়ান্ ভ্রাতরা যেরূপ মাতৃভক্তি-পরায়ণ আর বাসনা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেরূপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি

সেরূপ সম্পত্তি, সম্ভ্রমবল, প্রভুত্ববল থাকিত, তবে বৎস ! কোন চিন্তার বিষয়ই হইত না। তোমরা সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে ? তোমরা অনুবল হইলে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে—যত্নাস্ত্রে সকল বিঘ্নের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে ! অতএব প্রাণ-প্রতিম প্রিয়তম সন্তানগণ ! আর ঔদাস্য নিদ্রায় অচেতন রহিও না ; জননীর দুঃখাবমার্জনে আর বিলম্ব করিও না ; জাগরূক হও, উত্থান কর, চক্ষুরুন্মীলন কর, পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও, স্বাবলম্বনরূপ বসন পরিধান কর, ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধর, আশারূপ গাছ তোমার করতলে লও, ভ্রান্তি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ কর্মভূমিতে অবতীর্ণ হও—চাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে—শ্রবণ কর, স্বজাতি-কুঞ্জের গৌরবশাখীকে ভর করিয়া কর্তব্য কোকিল, উৎসাহ শুক, আর উত্তেজনা সারী জয়-জয়ন্তী তানে গান করিতেছে—নববঙ্গের নবোত্তম কুসুমের যশঃ সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইতেছে—নবোদ্ভিন্ন সুশিক্ষা-রূপ সুপক্ষধারী সুপবিত্র-চেতা ছাত্রপুঞ্জ মধুকরশ্রেণীরূপে গুঞ্জরব করিয়া কুঞ্জবনে আসিতেছে—আবার বৃক্ষের অন্তরালে দৃষ্টি কর 'সৌভাগ্য অরুণ' তরুণ বেশে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছে ! তাহার শোভা দেখাইবার জন্য তোমরা তোমাদের সকল ভ্রাতাকে একত্র কর সেই অরুণের আশ্চর্য আলোক দেখিয়া পুলক পাইয়া এই ভারত-লোক-বাসী সকলই শব্দ করুক 'জয় জয় জয় !' হিমাচলের পবিত্র গিরিগুহা হইতে প্রতিধ্বনি হউক, 'জয় জয় জয় !' আকাশে শব্দ হউক 'জয় জয় জয় !'

'হিন্দু মেলার জয় !' 'হিন্দু মেলার জয় !' 'হিন্দু মেলার জয় !'

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝে নিয়েছি। 'পরবশ্যতা' দূর ক'রে স্বাবলম্বন ব্রত গ্রহণ করতে পারলে আমরা স্বজাতিধর্ম ফিরে পাব। তখন আমাদের মূল লক্ষ্য আসবে হাতের মুঠোর মধ্যে। বারুইপুরে অনুষ্ঠিত মেলায় মনোমোহন আমাদের আদর্শের নাম দিয়েছেন 'উন্নতি'। গ্রামবাসী সাধারণ জনগণ তাঁর শ্রোতা। সুতরাং একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এর মর্মকথা তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন: "শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভুজা ! তাঁহারও দশ হস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে ;—প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যান-তত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য,

চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য! উদ্যম নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র, বিশেষতঃ শেষোক্ত অস্ত্রদ্বারা দৈত্যপতি 'পরবশ্যতার' বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন!"

হিন্দুমেলা শিক্ষিত সাধারণের মনে যে নবজাতীয়তার উন্মেষ সাধন করেছিল তা আমরা পরবর্তী সময়ের ঘটনা পরম্পরায় সম্যক উপলব্ধি করতে পারব। এই সময়ে বহু মনীষী হিন্দুমেলার নবজাতীয়তার সূত্র গ্রহণ ক'রে ভারতবাসীকে আত্মনির্ভর হ'তে অহর্নিশ উপদেশ দিয়েছেন। কারণ আত্মনির্ভর না হ'লে আত্মশক্তি অর্জন অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতে এই আত্মশক্তিই যে সবচেয়ে বড় কথা।

OLD MAN'S HOPE

1

Sons of Ind, why sit ye idle,
Wait ye for some Deva's aid ?
Buckle to, be up and doing !
Nations by themselves are made !

2

Are ye serfs or are ye freemen,
Ye that grovel in the shade ?
In your own hands rest the issues !
By themselves are nations made !

3

Ye are taxed, what voice in spending
Have ye when the tax is paid ?
Up ! Protest ! Right triumphs ever !
Nation by themselves are made !

4

Yours the land, lives all, at stake, tho'
Not by you the cards are played ;
Are ye dumb ? Speak up and claim them !
By themselves are nations made !

5

What avail your wealth, your learning,
Empty titles, sordid trade ?

True self-rule were worth them all !
  Nations by themselves are made !

7

Whispered murmurs darkly creeping,
  Hidden worms beneath the glade,
Not by such shall wrong be righted !
  Nations by themselves are made !

8

Do ye suffer ? do ye feel
  Degradation ? undismayed ?
Face and grapple with your wrongs !
  By themselves are nations made !

9

Ask us help from Heaven or Hell !
  In yourself alone seek aid !
He that wills, and dares, has all ;
  Nations by themselves are made !

10

Sons of Ind, be up and doing,
  Let your course by none be stayed,
Lo ! the dawn is in the East ;
  By themselves are nations made !

পরিশিষ্ট—৩

গ্রন্থ-পঞ্জী

বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের কয়েকখানির মাত্র উল্লেখ এখানে করা হ'ল। বর্তমান ও পূর্ব পূর্ব সংস্করণে এ-সমুদয় থেকে সাহায্য পেয়েছি। পুস্তকগুলির অধিকাংশই আকর-গ্রন্থের মর্য্যাদা পাবার যোগ্য। আমি এখানে সমসাময়িক ইংরেজী-বাংলা পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করি নি। পাদটীকার অভাবের প্রতিও আমার দৃষ্টি কেউ কেউ আকর্ষণ করেছেন। কংগ্রেস পূর্ব-যুগের ইতিবৃত্ত-রচনায় এই সকল পত্র-পত্রিকার সাহায্য আমাকে বিশেষভাবে নিতে হয়েছে—'সমাচার দর্পণ' (সংবাদপত্রে সেকালের কথায় সঙ্কলিত); "Calcutta Journal", "Calcutta Monthly Journal", "Asiatic Journal", 'The English Man', 'The Bengal Hurkara', 'The Bengal Spectator', 'The Hindu Patriot', "Mookherjee's Magazine", 'The National Paper', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', (তখনও বেশীর ভাগ বাংলায় লিখিত), 'The Bengalee', (গিরিশ ঘোষ সম্পাদিত), 'The Brahmo Public Opinion', 'The Indian Messenger', 'বঙ্গদর্শন', 'আর্য্যদর্শন', 'মধ্যস্থ', 'সাধারণী' প্রভৃতি এবং কোন কোন ইংরেজী পত্রিকার সঙ্কলন-গ্রন্থ।

সংবাদপত্রগুলির কোন কোনটির ফাইল এখন দুষ্প্রাপ্য। দুষ্প্রাপ্য সংবাদ-পত্র সমূহের "Cuttings" কোথাও কোথাও দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। বিশেষ বিশেষ বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের তালিকা নিম্নে দিলাম। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মূল প্রসিডীংসও আমি দেখেছি।

বাংলা

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩য় সং—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত

২। বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৭)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত
৫। হিন্দুমেলার কার্য্যবিবরণ ও বক্তৃতা
৬। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ—অনাথনাথ বসু
৭। কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত
৮। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী
৯। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার
১০। বঙ্গদর্শন (১১৭৯-১২৮৩)
১১। আনন্দমঠ—সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ
১২। আনন্দমোহন বসু
১৩। ভারতে জাতীয় আন্দোলন—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
১৫। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত
১৬। হরিশ্চন্দ্র—রামগোপাল সান্যাল
১৭। আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮। জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯। চরিতকথা—বিপিনচন্দ্র পাল
২০। প্যারীচরণ সরকার—নবকৃষ্ণ ঘোষ
২১। ভোলানাথ চন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ
২২। সেকালের লোক—মন্মথনাথ ঘোষ
২৩। জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ—যোগেশচন্দ্র বাগল
২৪। হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত—যোগেশচন্দ্র বাগল
২৫। বিদ্রোহ ও বৈরিতা ঐ
২৬। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঐ
২৭। ভারতের মুক্তি সন্ধানী— ঐ
২৮। রামমোহন রায় (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৯। রাধাকান্ত দেব (ঐ) —যোগেশচন্দ্র বাগল

নির্ঘণ্ট

অক্ষয়কুমার দত্ত ৫, ৮৭
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ৩৩০
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২৬০
অগাস্ট কোঁৎ ২৩৭
অঘোরকুমার নাথ ২৫৯
অঘোরনাথ গুপ্ত ১৮১, ২০০
অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ২৩২
অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা ১৮৪, ১৯৬
অন্নদাচরণ খাস্তগীর ৩০৫, ৩১২
অবলা দাস ৩০০
'অবলা বান্ধব' ৬১
অভয়চন্দ্র গুহ ৩১২
অবলা বসু (লেডি) ৩০০
অমৃতলাল বসু ২৩২, ২৩৩
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৫৫-৭, ১৬৩ ১৭৯, ১৯৪, ২০৫, ২১৪, ২১৫, ২২৩, ২৩১, ২৩৩, ২৩৯, ২৪১, ২৪৭, ২৫২, ২৬৪
অমৃতলাল বসু ৩২৮
অম্বিকাচরণ গুহ ৩২৮
অম্বিকাচরণ মজুমদার ৩১৩
অযোধ্যানাথ পণ্ডিত ২৬৬
অযোধ্যার নবাব ১৩৫-৬
অরবিন্দ, শ্রী ১৯২
অশ্বিনীকুমার দত্ত ২৭৮
অস্‌বোর্ণ ৬৪
অসহযোগ আন্দোলন ১৭৯, ১৯১
অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন ১৩৮, ২৮২, ২৮৯ ৩০৬, ৩১৪
আইনসভা-পরিষদ ১০৯
আইরিশ ল্যাণ্ডলীগ ২২৭
আউধ আকবর ২৬৬
আত্মরক্ষা সভা ২৭৩
আত্মীয় সভা ১৬-১৮
আদি ব্রাহ্মসমাজ. দ্র. ব্রাহ্মসমাজ
আনন্দচন্দ্র মিত্র ২৫৩-৪
আনন্দ চার্লু ৩২১
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ২৭৬
'আনন্দমঠ' ৩০৭
আনন্দমোহন বসু ১৯১-২, ২০৭, ২০৯, ২২৯, ২৪২, ২৪৩, ২৪৮-৯, ২৫৩, ২৫৬-৯, ২৬৪, ২৮০-২৮১, ২৮৭, ৩০২, ৩০৬-৭, ৩১৩, ৩২৪-৫
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ৩০৩
আফগান যুদ্ধ ২৮২
আব্দুল লতিফ ১৫২, ১৬৯, ২১৭-৮, ২২১
আমহার্ষ্ট (লর্ড) ৩৭

'আমার ভারত উদ্ধার' ২৪৯
আমীর, মুনসী ৩১২
আমীর হোসেন খাঁ ২৬৫
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ২৬, ১৩৪
'আরসিডি' ২১৪
'আর্য দর্শন' ২৩৪, ২৬০
আর্য সমাজ ২৭৭
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় দ্র. বিশ্ব-বিদ্যালয়
আলেকজাণ্ডার ডাফ ৪৮
আশালতা দল দ্র. ব্যাণ্ড অব হোপ ১৯৯
আশুতোষ দেব ৬৯, ১০২
আশুতোষ বিশ্বাস ৩১৩-৪
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৩০০
আহমদ শাহ আবদালি ১২৭
ইউনিয়ন একাডেমি ৪২
'ইংলিশ ম্যান' ২১, ৭৫, ১১৩, ১৬৫, ১৬৭
ইডেন, স্যর এ্যাশলি ১২২, ১৫২, ১৬৩, ২৯২
'ইণ্ডিয়া ১৮৯৪' ২৯৮
'ইণ্ডিয়া আণ্ডার রিপন' ৩০৬
ইণ্ডিয়া কৌন্সিল ১০৯, ১৩৯
'ইণ্ডিয়া গেজেট' ১৯, ২১, ৩৯
ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটি ১০৮, ১৭১
ইণ্ডিয়া ষ্টেটস্ কমিটি
ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ৩১২
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দ্র. ভারত সভা ২১৫, ২৩৯, ২৯০
ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন ৩২২
'ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস' ৮২
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন ৩২০
ইণ্ডিয়ান ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ১২৬
'ইণ্ডিয়ান মীরর' ১৮৩, ১৮৭-৮, ৩০১, ৩২১
ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন ১৯৪
'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' ১৮৪
ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ১৭১, ২০২
ইণ্ডিয়ান লীগ ২৩৯-২৫৬, ৩০৫
'ইন্দুপ্রকাশ' ১৯
'ইফ ইট বি রিয়েল হোয়াট ডাজ ইট মীন'? ৩১০
ইয়ং ১১৮
ইয়েটস, উইলিয়ম ৮৫
ইলবার্ট কোটনে (স্যর) ২৯২-২৯৭
ইলবার্ট বিল ৫৭, ২৯১-৩, ২৯৬, ২৯৯, ৩০১, ৩১০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৫৩, ৬৭-৬৮, ১২৮
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ৩২৮, ৩৩০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫৩, ৮১, ১১৬-৮, ১৭৮, ১৯০, ২১১, ২২৯, ২৩৮, ২৪৯, ২৫৭, ২৭৮
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৩৯
ঈষ্ট, স্যর এডওয়ার্ড হাইড ৭০, ৪৮

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন ২০৬
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১২-১৫, ২৬-২৭, ৩৬, ৪৪, ৫৫, ৫৭, ৬০, ৬৬, ৯২, ৯৩, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০৩-৪, ১০৭, ১০৯, ১১৬, ১১৯, ১৩৪-৪০ ১৬৩, ২০৬
উইলকিন্স, চার্লস ৮, ১১, ১২
উইলফ্রেড ৭
উইলসন, জেমস ১৭৩
উইলসন, হোরেস হেমান ৭, ৩৩, ৩৬, ৪৮, ৪৯, ৮৯
উইলিয়ম্‌স্‌, মনিয়র ২৪৪
উড, স্যর্ চার্ল্‌স ১৬৬-৬৭, ১৭২
উদয়চরণ আঢ্য ৭৪, ৮৪
উপেন্দ্রনাথ দাস ২২৫, ২৩৩
উমানাথ গুপ্ত ১৯৮, ৩৯২
উমেশচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩
উমাপদ রায় ২৫৪
উমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৫, ১৯৭, ২৫৯
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭১, ১৭৪, ২০৫, ২৯৯, ৩২৩
উমেশচন্দ্র সরকার ৮৮
'এ নেশন ইন মেকিং' ২৫৭
'এ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ১০৬
একাডেমিক এসোসিয়েশন ৪২
এক্রয়েড, এনেট ১৯১, ১৯৩
এগ্রি হোর্টিকালচারাল সোসাইটি ৩৩, ৯৬
এডওয়ার্ড (স্যর) ৬০
এডাম, উইলিয়ম ৩৬, ৭১, ৮৭, ২১২
এডাম, জন ২১, ২২
এডামের রিপোর্ট ৭১
'এডুকেশন গেজেট' ২২৩
'এনকোয়ারার' ৪৭, ৫১-২, ৫৫
'এরিওপেজিটিকা' ২৪
এলগিন (লর্ড) ১৭২
এলবার্ট স্কুল ১৯৮, ২০০, ৩৪৫-৬
এলবার্ট টেম্পল অফ্ সায়ান্স ২৪৪
এলবার্ট হল ২০০, ২৪৫, ২৫৭
এলাহবাদ এসোসিয়েশন ৩২৩
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ৩২০
এলেনবরা ১২৯-৩০, ১৫৮
'এশিয়াটিক রিসার্চেস' ৭
এশিয়াটিক সোসাইটি ৭, ২৩৩,
এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ ২১৮, ২২০
এ্যাংলো হিন্দু স্কুল ৪২
ওয়াভেল (লর্ড) ১৩
ওয়ার্ড, উইলিয়ম ৭, ১৪, ১৬
'ওয়েল উইশার' ১৭৮
ওয়েলস্‌, মর্ডাণ্ট ১৬৬-৬৭
ওয়েলেসলী (লর্ড) ৯, ১৯
ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ৪২
"Old Man's Hope" ৩১৭
ওয়াগনের্দি ৩৭-৩৮, ১৩৪
ওয়াহাবী ১৩৭, ২১৭, ২১৯

কংগ্রেস (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল)
১১০, ১২১, ১৩৩, ১৭১, ১৯০, ২০৭, ২৪৪, ২৮০, ৩০৫, ৩১১, ৩১৬, ৩২২-২৫
কটন, স্যর্ হেনরী ৩১০, ৩১২-১৩,
কমলকৃষ্ণ (রাজা) ৩২৮
কলকাতা স্কুল সোসাইটি ৩৬, ৪১,
দ্র. স্কুল সোসাইটি ৪২, ৫১
কর্ণওয়ালিশ (লর্ড) ৯, ১১, ১৩, ৬৬, ২৮৫
কর্ণওয়ালিশ কোড ১১
কলকাতা কর্পোরেশন ৮১, ২৪৫
কলকাতা কলেজ ১৮৪
কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ৬৫
কলকাতা মাদ্রাসা ৭, ৯
কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ৮১
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্র. বিশ্ববিদ্যালয়
কলভিন, স্যর্ অক্ল্যাণ্ড ৩৭, ২৭৮, ৩১০
‘কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র’ ২০০
কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ১৭৮
কামিনী রায় ৩০০
কামিনী সেন ৩০০
কার্জন (লর্ড) ২২১
কার্পেন্টার, মিস্ মেরী ১৯৩
কারপেট্রিক, উইলিয়ম ৯৯
কার্ল মার্কস ২৩৭
‘কাল আইন’ (ব্ল্যাক এ্যাক্ট) ৫৭
কালাচাঁদ শেঠ ৭৩
কালীকুমার রায় ৯৮
কালীকৃষ্ণ (রাজা) ৬৯, ১০২, ১৬৬
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৩, ২৫৮, ৩১৫
কালীনাথ দত্ত ২৫৯
কালীনাথ রায়চৌধুরী ৪৮, ৬৭-৮
কালীপ্রসন্ন দত্ত ২৮৭
কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ২৮৭
কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৬৬
কালীমোহন দাশ ২০৪, ২৪৩, ৩০৫, ৩১২-১৩
কালীশঙ্কর শুকুল ২৫৩-৪, ২৭৫, ২৮০, ২৮৭, ৩১২
কাশীনরেশ ১৬৯
কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং ২৬৬, ৩২১-২২
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ৩৪, ৩৬, ১১৩, ৩২১
কাশী সার্বজনিক সভা ৩১৪
কিশোরীচাঁদ মিত্র ১২৫-৬, ১৭৩, ২০৪
কিশোরীলাল গোস্বামী ৩১২
কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৩, ৩১৫
কুঁয়ার সিং ১৩৬
কৃষক সভা ২৮৬
কৃষি প্রদর্শনী ১৭৩
কৃষি বিদ্যালয় ১৭৮
কৃষি সমাজ ৯৬
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ৮৫, ৩২৮
কৃষ্ণকুমার মিত্র ২৭৫, ২৮৭-৮

কৃষ্ণধন বসু ১৯২
কৃষ্ণবিহারী সেন ১৮৩, ১৯১, ১৯৮, ২০০
কৃষ্ণদাস পাল ১১৪, ১৪৬, ১৭১, ২০৪, ২৫৭, ২৬৩, ২৬৪, ৩২৮
কৃষ্ণনগর কলেজ ৮৬
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০, ৪৭, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৭৩, ৭৬, ৭৮, ৮০-২ ২৪৪-৪৮, ২৬০, ২৭৫-৩০৪
কৃষ্ণমোহন মল্লিক ২৫৯
কে, জন উইলিয়ম ১৩২
কেদারনাথ চৌধুরী ২৫৯
কেরী, উইলিয়ম ৬, ১১, ১৬, ৩৩, ৯৬. ১৪৮
কেলসাল ৫৯
কেশবচন্দ্র আচার্য ৩১২
কেশবচন্দ্র সেন (ব্রহ্মানন্দ) ৩৩, ১৭৮, ১৮২-২০১, ২৩৭, ২৫০-১, ২৬৩-৫, ২৭৫, ২৭৭-৮, ৩০৫
কোলব্রুক, টমাস হেনরি ১১
কোলব্রুক, স্যর্ জন ৭, ৯, ৮০
ক্যানিং (লর্ড) ১২৯-৩০ ১৩৮, ১৪৩, ১৭১, ২৮৫
ক্যাম্বেল, (স্যর) জর্জ ২১০-১৬ ২২০, ২৮৫
ক্যামেরণ ৯৩
'ক্যালকাটা কুরিয়র' ৬৪
'ক্যালকাটা গেজেট' ১৯, ২১৬
'ক্যালকাটা জার্ণাল' ২০, ২২, ২৫, ৩৫
'ক্যালকাটা মেডিকেল জার্ণাল' ২৩৫
ক্রফোর্ড, জে ২৪
ক্রীতদাস প্রথা নিরোধক আইন ২৬
ক্লাইভ, লর্ড ৩
ক্ষেত্রচন্দ্র গুপ্ত ২৫৯
খেদিব (মিশরের) ২৬৭
গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর ২৫৪
গগনচন্দ্র হোম ২৫৪
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ২০
গঙ্গাবাঈ ১৩৬
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮০, ৩২৭
গাইকোয়াড়,—বরোদা ২৩০-১
গর্ডন, জে. জে ১০৬
গান্ধী, মহাত্মা দ্র. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী,
গিরিজাশঙ্কর সেন ২৯৭
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৩২, ২৭৮, ৩১২, ৩২৮
গিরিশচন্দ্র বসু ১৫৬
গিরিশচন্দ্র সেন ২০১
গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ ২০৩
গুপ্ত সমিতি ২৫২-৩
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭২, ২৫৯, ২৬৪, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪
গোপাললাল মিত্র ৩২৮
গোপীমোহন ঠাকুর ৩১
গোপীমোহন দেব ৩১-২

গোবিন্দচন্দ্র দাস ৩১২, ৩১৭
গোবিন্দচন্দ্র বসাক ৪৪, ৭২-৭৪
গোবিন্দচন্দ্র রায় ২২৪
গৌরব সম্পাদনী সভা ১৮০
গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা ১৮০
গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়) ২০১
গৌরমোহন আঢ্য ৪২
গৌরীচরণ চট্টোপাধ্যায় ২৩
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (তর্কবাগীশ) ৬৭
গ্যারেট (পাদ্রি) ১৭২
গ্যেটে ৮
গ্রাণ্ট, স্যর্ চার্ল্স্ ৬২
গ্রাণ্ট, স্যর জন পিটার ২১, ১৫৮
১৬১-৩, ১৬৮
গ্ল্যাডষ্টইন ৭
গ্লাডষ্টোন ১৪০, ১৯৩, ২৭০-২,
২৮১-২
চক্রবর্তী ফ্যাকশান ৭৫
চণ্ডীচরণ সেন ৩১২
চন্দ্রকুমার ঠাকুর ২৩
চন্দ্রনাথ বসু ২০৪, ২৫৭-১
চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৬০
চন্দ্রশেখর দেব ৭৮-৮০, ১১৭
'চরিত কথা' ২৫০
চম্পারণ সত্যাগ্রহ ১৫০
চা বাগানের কুলি ২৫২
চার্চ অফ ইংলণ্ড এণ্ড আয়র্লণ্ড ৬১
চার্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ড ৬১
চারুচন্দ্র মিত্র ৩২১
চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু ১, ২৪৩, ৩০৫
চিরঞ্জীব শর্মা ২০১
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৩, ৬৬, ২৮৫
চৈত্র মেলা—হিন্দু মেলা দেখুন
৩২৮-৩৭
ছাত্রসভা ২৭৩
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ৩, ৭১
জওলাপ্রসাদ শর্মা ৩১২
জগন্নাথ খান্না ৩১২
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ৯
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৩২
জগদীশচন্দ্র বসু ৪২
জগমোহন বসু ৪২
'জন বুল' ২১
জবাহরলাল নেহ্‌রু ১৩২-৩
জমিদার সভা দ্র.ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোঃ
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১০২, ১৩১,
১৭৩, ২০৪, ২১৪, ৩১২-১৪
জয়গোবিন্দ সোম ২৫৯
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ৩২৮
জর্জ (তৃতীয়) ৪
জাতীয় কংগ্রেস—দ্র. কংগ্রেস
জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা
সঞ্চারিণী সভা ১৮০-৩২৭
জাতীয় গ্রন্থাগার ৩১৫
জাতীয় নাট্যশালা ২৩১, ২৩২
জাতীয় ধন ভাণ্ডার ৩০১

জাতীয় সম্মেলন ৩০৪, ৩২৫
জাতীয় সভা ৩২৭
জাহাজ কারখানা ৫৯
'জীবনস্মৃতি' ২৫৩
'জীবনের ঝরা পাতা' ২৯৭, ৩০০
জুরি আইন ২৪
জেনারেল এসেম্বিলিজ ইনষ্টিটিউশন ৪৮
জেলাবোর্ড ২৮২-৪
জোন্স, স্যর উইলিয়ম ৭-৮, ৩৬
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫৩, ৩৩০
"জ্ঞানান্বেষণ" ৩৩, ৪৩, ৪৫, ৫২-৩
জ্ঞানোপার্জিকা সভা ৭২-৩, ৮২, ৮৪, ১৮৬
ঝাঁসীর রাণী ১৩৬
টমসন্ জর্জ ৭১, ৭৬, ৮০, ১২৫-৬
টমসন (পাদরি) ১৭২
টমসন্ (স্যর্) রিভার্স অগষ্টাস্ ২১২
টাইটলার, ডক্টর ৫৪
টার্টন ৬৪
টিপু সুলতান p২
টেম্পল (স্যর) রিচার্ড ১৪২, ১৬০, ২১৬, ২০৫
টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন ১৭৮
টেলর ২১৪
'ট্রিবিউন' ২৬৫
ট্রেভিলিয়ন ১১৬
ঠাকুর আইন অধ্যাপক ৭৬
ঠাকুর সাহেব রাজা ৪০৩, ৪০৪
ডাইসন ১৮৪
ডাফ, আলেকজাণ্ডার ১১৬, ১২৫ ১৪৩
ডাফ স্কুল ৮৮
ডাফরিন (লর্ড) ৩২২, ৩২৩
ডালহৌসী (লর্ড) ১৩৪, ১৩৬-৯, ১৪১-২
ডিকেন্স থিওডোর ৫৯, ৬০, ৬২-৩, ৬৯
ডিফেন্স এসোসিয়েশন ২১৩
ডিরেট ১৩১
ডিরোজিও, হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ২৮, ৩৬, ৫৪, ৩৮-৫-১, ৫৪, ৭২, ৭৪, ১৪৩, ১৭৭, ২২৯, ২৪৪, ২৯৩, ৩০৪
'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' ১৩২
ডিসরেলি ২৬২, ২৬৭, ২৭২, ২৮১
ডিসট্রিক্ট বোর্ড দ্র. জেলা বোর্ড
ডেকান এসোসিয়েশন ১০৫
ড্যাল, সি, এইচ (রেভারেণ্ড) ১৭৫-৮
ড্রামণ্ড ডেভিড ৩৮
'ড্রেন ইনস্পেক্টর' ৩৪৪
ঢাকা কলেজ ৮৬
'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা ৮২, ৮৭, ১৪৮, ১৫১, ১৭৮
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ৮৫
তত্ত্ববোধিনী সভা ৮২-৩, ৮৫, ৯০, ৯৯
তাঁতিয়া তোপী ১৩৬

তারকনাথ পালিত ১৭২
তারাকিশোর রায়চৌধুরী ২৫৩-৫৪
তারাচাঁদ চক্রবর্তী ৩৪-৬, ৭২-৩, ৭৫, ৮০, ১৩৩
তারানাথ তর্কবাচস্পতি ৩২৮
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১
তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৯
তারিণীচরণ মিত্র ১১, ৬৮
তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩
তুরস্ক রুশ যুদ্ধ ২৬৭
'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্দিন' ১৬
তেজচাঁদ বাহাদুর (বর্ধমানের মহারাজ) ৩১
ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ৩১২, ৩১৩
ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ২০১
থিওসফিক্যাল সোসাইটি ১৪২, ২৭৯, ৩২১
থিয়োবোল্ড, ডব্লু ৭৯-৮০
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৪৪, ৫২, ৬৪, ৭৫, ৮০, ৯১, ১৩০, ১৪২-৩, ২০৫
দয়াল সিং মাজিথিয়া ২৬৭
দয়ানন্দ সরস্বতী (স্বামী) ২৭৬, ২৮০, ৩২১
দাদাভাই নৌরজী ১০৫, ১৭১, ১৮৬, ২০২
দামোদর দাস ৩১৪
'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' ২১৯, ২৮১
'দি পারসিকিউটেড' ২৭
The Society for the Acquisition of General Knowledge ৭২
দিগম্বর মিত্র ৪৪, ১০২, ১০৫, ১৭৩-৭৪, ৩২৮
দিনকর রাও (স্যর) ১৬৯
দিল্লী দরবার ২৬২, ৩৩১
দীনবন্ধু মিত্র ১৫৩, ১৫৬, ১৬৫, ২৩২
দুর্গাচরণ দত্ত ১০২
দুর্গাচরণ লাহা ৩১২, ৩১৩, ৩২৮
দুর্গাদাস কর ৩২৮
দুর্গামোহন দাস ২৪৩
দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন ৬৭
দুর্ভিক্ষ… ২৫, ২১৫, ২৪০, ২৬৭
দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত ৭৪…
'দেবী চৌধুরাণী' ৩০৭
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ২৮৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) ৮২, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯৯, ১০৩-০৫, ১১৩, ১৮০-৯০, ২৭৬, ২৮০
দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ৩২৮
দেশ হিতার্থী সভা ১০০
দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন ২৭০
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২২৫, ২৫৯, ২৭২, ২৮৭, ৩১২, ৩১৩

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৪, ২৩, ২৫, ২৬, ৩৪, ৪৩, ৪৯, ৫৭-৬০, ৬৭, ৬৯, ৭৬, ১৪৮
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৪৬
দ্বারকানাথ মিত্র ২৫৭
দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ৩১২, ৩১৩
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪০, ১৮০, ২৮০, ৩২৭, ৩২৮
ধনকোটী রাজা ৩০৪
ধর্মগত বৈষম্য ২৬
ধর্মতলা একাডেমি ৩৮
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৫৮-৯, ২৬৪, ২৭৬
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ৩১২
নন্দকিশোর বসু ২৭৩
নবকৃষ্ণ (মহারাজা) ১৩
নবগোপাল মিত্র ১৮০, ২৮১, ২৩২, ২৪৩, ২৫৯, ৩২৭, ৩২৯
নবীনচন্দ্র সেন ২২৫
নবল কিষেণ ২৬৬
নরিস ২৯৯
নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (মহারাজা) ১৬৬, ২০৪, ২৫৭, ২৬৩-৪, ৩১২-৩, ৩১৫
নরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৪৯
নরেন্দ্রনাথ সেন ২৪৩, ৩২১
নর্থব্রুক (লর্ড) ১৯৮
নর্মান. জন ২৭৯
নলিনাক্ষ বসু ৩১২
নাদির হোসেন ১২৭
নানা ফাড়নবীশ ১৩৬
নানা সাহেব ১৩৬
'নিউ ইণ্ডিয়া' ৩০৯
নিজাম ১২
নীল অনুসন্ধান কমিটি ১৫৯
নীল আন্দোলন ১৪৫-১৪৬
নীলকমল মিত্র ২৫৯
'নীল কমিশন' ১৫৯
নীল কর ১৬৩-৮, ২১৩
'নীল দর্পণ' ১৫৩, ১৬৫, ২৭২
নীল বিদ্রোহ ১৫০-১, ১৫৭, ১৬৩, ২১৩
নেপোলিয়ান ১২
নৈশ বিদ্যালয় ২৮০
Notes on the Evidence on Indian Affairs ১০৮
নোলান ২১৪
নৌরজী দাদাভাই দ্র. দাদাভাই নৌরজী
নৌরজী ফরদুঞ্জী ১০৫
'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৯৩
ন্যাশনাল এডুকেশন ১১৫
ন্যাশনাল এসেম্বলী ৩০১-২
ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ৯৮, ১০১
ন্যাশনাল ওয়ার অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ১৩২
ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স দ্র. জাতীয় সম্মেলন ৩০২-৪, ৩১২, ৩২১, ৩২২, ৩২৫, ৩১৬

ন্যাশনাল কংগ্রেস দ্র. কংগ্রেস
ন্যাশনাল গ্যাদারিং ১৮১
ন্যাশনাল জিমনাসিয়ম ১৮১
ন্যাশনাল থিয়েটার দ্র. জাতীয় নাট্যশালা
‘ন্যাশনাল পেপার’ ১৮১
‘ন্যাশনাল ফণ্ড’ ৩০৬
ন্যাশনাল মোহম্মডান এসোসিয়েশন ২১৮
ন্যাশনাল লাইব্রেরী ৩১৫
ন্যাশনাল স্কুল ১৮১
পঞ্চানন কর্মকার ১১
পটলডাঙ্গা স্কুল ৪২, ৫১
পতিতোদ্ধার সভা ৯০
পলাশীর যুদ্ধ ৩, ১২
পাতিয়ালার মহারাজা ১৫৮
‘পার্থেনন’ ৪৩
পাণ্ডুরাঙ্ গোপাল ৩২১
পাদশা, এস. জে ৩১২
পাবলিক সার্বিস কমিশন ২৯০
‘পারসিকিউটেড’ ৫১
পার্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী ৩১৩
পার্লামেণ্টারী কমিটি ২৭
পীকক, বার্ণেশ ১২২, ১২৬, ১৬৬
পূর্ণেন্দু দেবরায় ৩১২
পূর্ণচন্দ্র সিংহ ৩১৩
পেশোয়া ১২, ১৩৬
পৌরসভা ২৮২
প্যারীচরণ সরকার ১৭৮, ৩২৮
পেজাণ্ট্রী অব বেঙ্গল (দি) ২১৫
প্যারীচাঁদ মিত্র ৪১, ৪৪, ৭৩-৪ ৭৬, ৭৮, ৮০, ১০৮, ১৭৮, ২৮০
প্যারীমোহন বসু ৬৭, ৭৩
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ৩১২-১৪
প্রজা বিদ্রোহ, পাবনা ২১৪, ২৪০, ২৮৫
প্রতাপচন্দ্র সিংহ (রাজা) ৯৮, ১০২, ১১৩, ১৩০, ১৬৬, ১৬৯
‘প্রতিধ্বনি’ ২৩৩, ২৪৩
প্রতিনিধি সভা ১৮৭
‘প্রদীপ’ ২৭৮
‘প্রবাসী’ ২৭৮
প্রমথনাথ বসু ১৮৪, ২০৩, ২৭২-৩
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২৩, ৩৪, ৪৯, ৫০, ৬৭-৯, ৭০, ৯৮, ১০৫, ১১০-১১, ১৬৯
প্রসন্নকুমার রায় ২০৩
প্রার্থনা সমাজ ১৮৬
প্রিন্স অফ ওয়েলস্ (৫ম জর্জ) ২০২, ২২৫
প্রিন্স এলবার্ট ২৪৫
প্রিন্সেপ, জর্জ ৭, ৬৯
প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ৫৩
প্রেস আইন ১৩৮
প্রেসিডেন্সি কলেজ/স্কুল ২৪৮, ২৮১
ঐ—স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন ২৪৮
‘ফকির অফ ঝাংঘিরা’ ৩৯

ফরষ্টার, হেনরি পিটস্ ১১
ফরাসী বিপ্লব ২৬
ফসেট, হেনরি ২০৭
ফার্গুসন, ডব্লু, এফ, ১৬০
ফিমেল নর্মাল স্কুল ১৯৩
ফিরোজ শা মেহতা (স্যর) ২৩৬
ফেয়ার, কর্ণেল ২৩০
ফোর্বেস, স্যর চার্লস ৭১
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৯, ১১, ১৬, ৩০
ফৌজদারী আইন ২৯২
'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৯০, ৯৯, ১১৫, ১১৮, ১২৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯৬, ১৬৫, ১৭২, ১৭৪, ২০১, ২১২, ২২৩, ২৩৪-৩৮, ২৫১, ২৫৮-৯, ২৭২, ২৭৮, ২৮৫, ৩০৭
বঙ্কিম রচনাবলী ২৩৬, ২৩৮
'বঙ্গদর্শন' ২১৫, ২৩৪-৩৬
বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ১১৩
বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা ৬৭, ৬৮
বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল ২১৮
বঙ্গীয় প্রজা স্বত্ব আইন ২৮৫, ২৮৬, ২৮৯
বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা ১১৩, ১৯৩, ২৪৭
বদ্রীদাস ৩১২
'বন্দেমাতরম্' ৩০৭
বয়কট (ক্যাপটেন) ২২৭
বসন্তকুমার ঘোষ ১৮৩
'বাংলা গেজেট' দ্র. বেঙ্গল গেজেট
বাংলা বিদ্যালয় ৮৫, ৮২
বাঙ্গালার কৃষক ২১৫, ২৩৭, ২৮৫
বাংলার শিক্ষক ২১৩
বাংলার নব জাগরণের কথা ২৩৪
বাক (শ্রীমতী) পার্ল ৪৩৪
বাকিংহাম, জেমস্ সিল্ক ২০, ২২, ৩৫
বাঙ্গালার ইতিহাস ৮৩, ৯৩
'বাজিমাৎ' ২৩২
'বান্ধব' [ঢাকা] ২৩৪
বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৯
বামাবোধনী সভা ১৮৫
ঐ—পত্রিকা ১৮৫, ১৯৭
বারাসত সরকারী স্কুল ১৭৮
বার্ক, এডমাণ্ড ৪
বাহাদুর শাহ ১২৭, ১৩৪, ১৩৭
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৫১, ১৮৩ ১৯৯,
বিদ্যোৎসাহিনী সভা ৬১
'বিদ্রোহ ও বৈরিতা' ২১৭
বিধবা বিবাহ আইন ১৯০
বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৩২, ১৩৩
বিপিনচন্দ্র পাল ২৩৭, ২৪৯-৫৪, ২৭২, ২৯৩, ৩২৪, ৩২৫
বিবেকানন্দ (স্বামী) ২৪৯, ২৭৬, ২৭৮

'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' ৯
বিভারিজ, হেনরি ১৯১
বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ৩৬
বিশ্ববিদ্যালয় ২৪৪, ৩২০
বিষ্ণু নারায়ণ মাণ্ডলিক ২৬৬
বিষ্ণু মোরেশ্বর ১০৫,
বিহারীলাল গুপ্ত ২০৩, ২৯২, ৩০৪
বীমাব্যাঙ্ক ৫৯
বেঙ্গল এসোসিয়েশন ২৫৭
বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ৬৯
'বেঙ্গল গেজেট' ১৯-২০
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ৭৮, ৮০, ৯০, ১০০-১০,
'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' ২১৫
'বেঙ্গল সেলিব্রেটিস' ১০৬
'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ৭৭
'বেঙ্গল হরকরা' ৭১, ৭৫, ৭৭, ৯৯, ১০৬, ১১৩, ১৬৫, ১৬৮
'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৩৪
'বেঙ্গলী' ২৯১, ২৯৯
বেণ্টিঙ্ক, লর্ড উইলিয়ম ১৮, ২৪, ৪৮, ৬৫, ৭১, ১৭৬, ২০৫
বেথুন, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার ৮৬, ৯১, ৯৪, ১৩৭
বেথুন বালিকা স্কুল/কলেজ ১৯৩, ১৯৬, ৩০০
বেথুন সোসাইটি ১১৩, ১৭৩, ১৭৯, ১৮৬, ১৮৯-১৯০, ২১৮ ২৫০
বেদান্ত বিদ্যালয় ১৬, ২৯
বেল, ইভান্স (মেজর) ১৭২
বেলি, ডব্লু, বি ২১
বেসাণ্ট, এনি ২৭২-৭৫, ২৭৯, ৩২১
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
বোম্বাই এসোসিয়েশন ১০৫
বোর্ড অফ কণ্ট্রোল ১০৭, ১০৯, ১২৯, ১৩৯
Board of Commissioners for the Affairs of India ১২০
ব্যবস্থা দর্পণ ২৫৭
ব্যাণ্ড অব হোপ ১৯৯
ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ২৪৯
ব্রজনাথ ঘোষ ৮৮
ব্রজেন্দ্রকিশোর বসু ৩১২
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৩২
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৯৮, ২৪৯
ব্রহ্মবন্ধু ২৭৮
ব্রহ্মসভা ১৮, ৩৪, ৩৬, ৬৮
ব্রাইট, জন ২৭২-৩, ৩২২
ব্রাউহাম (লর্ড) ৭১
ব্রানসন ২৯৩
ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ ১৮৮
'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন, ২৭০, ২৯৯, ৩০১
ব্রাহ্ম সমাজ ১৮, ৩৪, ৩৬, ১৮০, ১৮২-৩, ১৮৫, ১৮৭, ১৯৩, ২৫৯, ২৭৬

ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন ১৭
ব্রাহ্মণ সেবধি ১৭
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এডভোকেট ৭১
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ৭০-১
৭৬-৭, ৭৯
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১০০
১৪৩, ১৯৯, ২৪৭, ২৯৮, ৩১১,
৩১২-১৬, ৩৩৫
ব্লাকএ্যাক্ট—দ্র. কাল আইন ৫৭,
৯৫, ১২৪
ব্লাভাট্স্কি (মাদাম) ২৭৯-৮০
ব্লু বুক ৩০৫
ব্লুণ্ট উইলফ্রেড স্কাওয়েন ৩০৬
ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ৩২৮
ভবানীচরণ বন্দ্যোঃ ২১, ৩৫, ২৪৯
ভারত আশ্রম ১৯২, ১৯৫
ভরতচন্দ্র শিরোমণি ৩২৮
'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ১৭৯
'ভারত পত্রিকা' ১৪৩
'ভারত শ্রমজীবী' ১৯৭, ২৩৪
ভারত সংস্কার সভা ১৯২, ১৯৪-৫,
১৯৮, ২৩৩
ভারতসভা দ্র. ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন
২১৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৫৭ ২৯০,
৩১১-১, ৩১৫-৬, ৩২১-৫
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা ২৩৫, ২৪৫
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্র. ব্রাহ্মসমাজ
ভারতবর্ষীয় সভা ৭৯, ৮২, ১০০,
১৩২, ১৪৫-৬, ১৬০, ১৬৯-৭৫, ১৯৯-
২০২-১৪, ২১৬-১৭, ২৩৩, ২৩৯-৪২,
২৪৬, ২৫৯-৬১, ২৭৯-৮২, ২৮৮-৯,
২৯৮
'ভারতী' ২৩৪
ভারতীয় আইন সভা ১১০-১, ১১৮
ভার্ণাকুলার ইউনিভারসিটি ২১৮
দ্রঃ মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন।
ভি, এন, মাণ্ডলিক ১৩৮, ১৭১, ৩২১
ভিক্টোরিয়া, মহারাণী ১৯৩, ২৩০,
২৪৫, ২৬২
ভিক্টোরিয়া স্কুল ও কলেজ ১৯৭
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৫৬, ৮২, ৯৩,
১০০, ১৭৯, ২১৩, ২২৬
ভূম্যধিকারী সভা ৬৯-৭২, ৭৯, ৮০,
৮২, ৯০, ১০১
ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৩
ভোলানাথ চন্দ্র ২২৬-৭, ২৫৯
'মডার্ণ রিভিউ' ২৭৮
মতিলাল ঘোষ ২৪৮
মতিলাল শীল ৮৮
'মদ খাওয়া বড় দায়' ১৭৮
'মদ না গরল' ১৯৮
মদনাবতী নীলকুঠি ৬
মধুসূদন দত্ত (মাইকেল) ৮৬, ১৪৬,
১৫৫, ২২৩, ২২৬
'মধ্যস্থ' ২০৭, ২২৩, ২৩৪, ৩৩১
মন্মথ লাল ঘোষ ১৫৬, ১৭১

মনমোহন ঘোষ ১৫৬
মনু সংহিতা ৩৬
মনোমোহন ঘোষ ১৫৬, ১৮৩, ২০২-৩
২৪২-৩, ২৫০-৬০, ২৬৪, ৩০৫, ৩২১
মনোমোহন বসু ২২৪, ২৪৩, ৩২৯-৩৫
মণ্টগোমারী ৩০৯
মরগেন ১১০
ময়রা (লর্ড) ২০—২
মহম্মদ আলী (নবাব) মীর ২৬৪
মহম্মডান লিটারারি এসোসিয়েশন ২১৮
মহাজন সভা (মাদ্রাজ)
মহাকালী পাঠশালা ১৩৬
মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ১৮৬, ২৬৬
মহেন্দ্রলাল সরকার (ডাঃ) ১৭৫
২০৪, ২৩৫, ২৪৫, ২৪৭, ২৬৩-৪,
২৭৮, ৩১২
মহেশচন্দ্র চৌধুরী ৩১২-৩
'মাই হারপ অন ইণ্ডিয়া' ৪০
মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী ১৩৬
মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন ১৭৯
মাদ্রাসা ৪, ৭, ৯
মাধবচন্দ্র মল্লিক ৪৪, ৫২, ৭৩
মারাঠা যুদ্ধ ১২
মার্শম্যান জন ক্লার্ক ১৪, ২০, ১১৫
মার্শম্যান যশুয়া ৭
মিউনিসিপ্যালিটি ২৮৩, ২৮৪
মিণ্টো (লর্ড) ১৫. ১৪৮
'মিরাৎ-উল আখবার' ২১-২
মিণ্টন ২৪
মিল, জন স্টুয়ার্ট ১১৬, ১২৩, ২৩৭
'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন' ২২৬, ২৪৩
মুদালিয়র ৩২১
মুদ্রা যন্ত্র আইন দ্র. দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র
আইন ২৭১, ২৮২, ২৮৯
মুন্সী আমীর ৬৭, ৬৯
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১১-১৮
মে, রবার্ট ২০
মেকলে, টমাস বেবিংটন (লর্ড) ৪৭
৫৭, ৯১-২, ১১৫-৬ ১২০, ২৬১
'মেঘনাদ বধ' ১৩৬
মেটকাফ, স্যর চার্লস ৬৪, ৬৫
মেট্রোপলিটান কলেজ ২১০, ২২৯,
২৩৮, ২৮১
মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল ১২৭
মেডিকেল কলেজ ৩৩, ৪৮. ৩৭,
৭৪, ১১৭, ১২০
মেদনীপুর জেলা স্কুল ১১৭
'মেময়েরস্ অব মাই লাইফ'... ২৫২
মেও (লর্ড) ৯৯, ১০০, ২১৯
মোসলেম শিক্ষা সম্মেলন ২২০
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৫০,
১৭৯, ১৯১, ৩২৫
মোহন প্রসাদ ৮১
মোহিনী দেবী ২৯৭
মোহিনী মোহন বসু ৩১২

মৌলা বক্স ৩৩১
ম্যাকলাউড ৩০৯
ম্যাক্সমুলার ১৯৩
ম্যাকফারসন, বি ১৩৬
ম্যাকেঞ্জী, আলেকজাণ্ডার ২৮৮
ম্যানস্‌ফিল্ড ১৪১
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৩১৩
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা) ৫৩, ৩১২, ৩১৩, ৩২৮
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ৩০৫
যদুনাথ সরকার ১৩৩, ২৪০
'যীশুখ্রীষ্ট ইউরোপ ও এশিয়া'
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ৩১২-৩
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ২৬০
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ৫৩
রঘুনাথ রাও (রাও বাহাদুর) ৩২১
রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন ২৩৩
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮
রঙ্গিয়া নাইডু ৩২১
রজনীকান্ত গুপ্ত ১৩২, ৩৩০
রণজিৎ সিংহ ১২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৮, ২০০, ২৫৩, ২৬২, ৩৩০-১
রমানাথ ঠাকুর (রাজা) ১০২,, ১৬৬, ২০৪, ৩২৮
রমাপ্রসাদ রায় ১৬৯
রমেশচন্দ্র দত্ত ২০২, ২১৪, ২৮৫ ৩০৪
রমেশচন্দ্র মিত্র (স্যর) ৩০০
রয়াল কমিশন ২০৬, ২০৭
রসিককৃষ্ণ মল্লিক ২৮, ৪০, ৪৯, ৫১-৫, ৫৯, ৬৪, ৭২
রসিকলাল সেন ৭২
রয়টার ৩২২
রাইচরণ রায় ৩৩১
রাজকৃষ্ণ দে ৭৩
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৫৯
রাজনারায়ণ বসু ১৭৫, ২২৬, ২৩৪, ২৫৩, ২৫৯, ২৭৬
রাজনারায়ণ রায় ৬৯, ৮৬, ১৭৭-৮০, ৩২৮, ৩৩১
রাজচন্দ্র সরকার ২৩০
রাজসাহী এসোসিয়েশন ২৪০
রাজস্ব বোর্ড ৮৬
রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব ৩১২
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৭১. ৯৬, ১২৫-৬, ২৪৪, ২৬৩-৪, ২৯৮, ৩১৩
রাধাকান্ত দেব (রাজা) ৩২-৪, ৩৬, ৬৮, ৬৯, ৮৮-৯১, ১০২-৫, ১২৪, ১৬৬-৭, ১৭৬-৮
রাধানাথ শিকদার ৪১, ৪৪, ৭৬
রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৫৬
রামকমল সেন ৩২-৩৬, ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৮০
রামকৃষ্ণ কথামৃত ২৭৮
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০

রামকৃষ্ণ মিশন ২৭৮
রামগোপাল ঘোষ ৪৪, ৭৫-৮২, ৯০, ৯৫-৬, ১০২, ১০৫-৬, ১২৬
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ৮৫
রামচন্দ্র মিত্র ৮০
রামতনু লাহিড়ী ৪৪, ৭৩, ৩০৪
রামমোহন রায় (রাজা) ১৩-২৮, ২৯, ৩১, ৩৩-৭, ৪৩-৫, ৪৮, ৪৯, ৫৩-৫, ৫৮, ৬৪, ৭০, ৯৬-৭, ১৪৮, ১৬৯, ১৭৭, ১৯৩, ২৫১, ২৮৫, ২৭৩
রামরতন রায় ৬৯, ১৬০
রামরাম বসু ১১
রামলোচন ঘোষ ৬৭
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৭৮
রামেশ্বর মালিয়া ২৫৯
রাসবিহারী ঘোষ ১৭২
রিচার্ডসন, ডি. এল (ক্যাপ্‌টেন) ৭৫
Resumption of lands ৬৬
রিপন (লর্ড) ২৮১-৮৫, ২৮৯-৯২, ২৯৭, ৩০৬, ৩১০, ৩১১, ৩১৫, ৩২২
রিপন কলেজ ২৮১
'রিফর্মার' ৩৪, ৪৯-৫১
রুস্তমজী টার্নার কোং ৫৯
রেমক্রি, জি. এফ ৮০
ল' কমিশন ৯৩, ১১২, ১৪৫
লক্ষ্মীনারায়ণ (পঃ) ৩২১
লঙ, জেমস্ (পাদ্রী) ১১১, ১৩৭, ১৬১, ১৬৫-৬
লজপত রায়, লালা ২১৮, ২৭৭
লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ১৭১, ২৭২
লয়েড, জর্জ ২২৮
লরেন্স, স্যর জন ১৪১
লরেন্স (লর্ড) ১৮৭, ৩০৯
লারমুর ১৩১
লালবিহারী গুপ্ত ১৮৪
লালবিহারী দে ২১১, ২১৪
লালমোহন ঘোষ ২৭২-৪, ২৮১, ২৮২, ২৯৩
লালমাধব মুখোপাধ্যায় ৩১২
লালা হংসরাজ ২৭৭
লিটন (লর্ড) ২৬২, ৩৩১
লিনলিথগো ১৩
লোক্যাল বোর্ড ২৮৪
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭৪,২২৬, ২৪৩-৪৪
শম্ভুনাথ পণ্ডিত ১১৩, ১৬৯
'শব্দ কল্পদ্রুম্' ৩২
শরৎচন্দ্র রায় ২৫৪
শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭
'শায়ির এণ্ড আদার পোয়েমস্' ৩৬
শিক্ষা কমিটি/সমাজ ৮৬
'শিক্ষা দর্পণ' ২২৩
শিবিচন্দ্র দেব ৪৪, ৭২
শিবচন্দ্র ঠাকুর ৩৪, ৩৬
শিবনাথ শাস্ত্রী ১৭৭, ১৮৩, ১৮৮-৯ ১৯৮, ২৪২, ২৫৩-৪, ২৫৬-৯, ২৭৮, ২৮০, ৩১২, ৩৩০-৩৩৭

শিল্প বিদ্যালয় ১১৩, ১৯৭
শিল্প প্রদর্শনী ৩৩০
শিশিরকুমার ঘোষ ১৫৫-৮, ১৬৩, ১৮৩, ২০৫, ২০৬, ২২৩, ২৩২ ২৩৯-৪৩ ২৪৬-৮, ২৫৬, ৩০৫
শীলস্ ফ্রি কলেজ ৮৮-৯
শোর, জন ৯
শ্যামাচরণ সরকার ২৫৭
শ্রদ্ধানন্দ স্বামী ২৭৭
শ্রমজীবী বিদ্যালয় ১৯৭
শ্রীনাথ দত্ত ২৫৯
শ্রীপদবাবাজী ঠাকুর ২০৩, ৩০৪
শ্রীম ২৭৮
শ্রীরাম ৩২১
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ১১, ২০
শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন ৭, ১১, ১৬, ৯০, ১১৫
'ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' ১৪৮
'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ৬৭, ৭৪
'সংবাদ প্রভাকর' ৬৭, ৬৮, ১১৩, ১২৮
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা ৩৩, ৩৭, ৭৩, ১১৮
সংস্কৃত কলেজ, (বারাণসী) ৪, ৭,
সখী সমিতি ২৮০
"সঞ্জীবনী" ৩
ঐ—সভা ২৫৩
সতীদাহ নিবারক আইন ১৮
সত্যচরণ ঘোষাল (রাজা) ১০২
সত্যবাদী ঘোষাল ৩১১
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭১, ২০৩, ২২২, ৩২৯
সনন্দ ৫৮....
সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত ১৪৫, ১৬০, ১৬৯, ১৭০
'সন্ধ্যা' ১৯৮
সপ্তম এডওয়ার্ড ২২৫, ২৩২
'সমদর্শী' ২৩৪
'সমাচার চন্দ্রিকা' ২১, ৩৫
'সমাচার দর্পণ' ২০, ৪৫, ৬৪-৯৮, ১১৫
'সমাচার হিন্দুস্থানী' ১৪৩
'সম্বাদ কৌমুদী' ২১, ৩৫
'সম্বাদ ভাস্কর' ৬৭, ১১৩
সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়া ২৬৫
সরলাদেবী চৌধুরাণী ২৯৭, ৩০০
সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা ৬৭
'সহচর' ২৩৩
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ৭৪-৭৭
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দ্র. ব্রাহ্মসমাজ
'সাধারণী' ২৩৩, ২৩৮, ২৪৩, ২৫৮, ২৬০
সাদার্ল্যাণ্ড, এইচ. সি ২২৮-৯, ২৯২
সারদাচরণ মিত্র ২৫৯
সার্বজনিক সভা (পুণা) ৩২
সাভারকার ১৩২, ১৩৩

সালিকরাম ৩২৮
সিটনকার, ডব্লু. এস ১৬০, ১৬৫, ১৬৭
সিটি স্কুল, কলেজ ২৮০-১
সিটিজেন ১১৩
সিপাহী বিদ্রোহ/যুদ্ধ ১১৭, ১২৬-৪৬, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৩, ১৬৬, ২১৭, ২২৯-৩০, ৩১৪-১৭, ৩৩০
সিবিল ম্যারেজ বা বিবাহ আইন ১৯০
সিবিল সার্বিস ২৬০-৬৪, ২৬৬, ২৭২-৩, ২৮৩, ২৮৯-৯১, ৩০৪-৬, ৩১৫-৬
সিমুর, কী ৩০৬
সীমুর, ডানবি ১০৮
সিলেক্ট কমিটি ১১৫, ২৮৯
সুপ্রীম কোর্ট ২৩, ৬০, ৬৩, ৭৯ ৮৮, ৯২-৩, ১১২, ১২৪, ১৪৫, ২৬০ ২৬৫-৭০
সুব্রহ্মণ্য আয়ার, এস (স্যর) ৩২১
সুন্দরীমোহন দাস ২৫৩
সুরাপান নিবারণী সভা ১৭৭-৮
সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী ৩১২
'সিলেকশানস্ ফ্রম ক্যালকাটা গেজেট' ১৬৭
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ ১৪৬, ২০১, ২০৩, ২২৮, ২৩৮, ২৪২ ২৫৯, ২৬৩-৬৬, ২৭৫, ২৮০-৮৩ ২৮৭. ২৯২, ২৯৯, ৩০১, ৩০৫-৩১৫, ৩২১-৩২৫
ঐ—আত্মজীবনী ২৫৮
সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৩৩
'সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক' ২৩২-৩
"সুলভ সমাচার" ১৮৮, ১৩৩, ১৭৭
স্কুল বুক সোসাইটি, কলিকাতা ৮৫
স্কুল সোসাইটি, কলিকাতা ৮৪
সূর্যকুমার সর্বাধিকারী ২৫৯
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ৪৮
সেণ্ট্রাল মহম্মডান এসোসিয়েশন ১৩৫
সেল, জে ১৬০
সৈয়দ আহমেদ খাঁ (স্যর) ১১১, ১৪৫, ১৭৫, ২১৭, ২২০-১, ২৬৫-৬৬, ২৮১
সোমপ্রকাশ ১৪৬, ১৬৬, ১৭৭, ২৩১, ২৩৩
স্ট্যাচি, স্যর জন ২৯৮
স্টেডম্যান, হেনরি জন ৩০৯
স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয় ১৯৩, ১৯৬-৭
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন ৩১১
স্পীড, জি. এফ ৮০
স্বর্ণকুমারী ঘোষাল ২৮০
স্বর্ণপ্রভা বসু ১৯
স্বর্ণময়ী ২৭২
স্মল কজেস কোর্ট ৩১৫
স্মিথ স্যর লায়ওনেল ৩২, ৪৬-৭
স্কুলসবেরী ২০৮, ২৬২, ২৭৩
হংসরাজ লালা ২৭৭

হটন ৭
হরকরা ১৯, ৯৯, ১৬৭-৮
হরকুমার ঠাকুর ১০২
হরচন্দ্র ঘোষ ২৩, ৪০
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭
হরচন্দ্র রায় ২০, ৭২
হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ৩২৮
হরিমোহন সেন ৮৩, ৮৮, ১০২
'হরিশ্চন্দ্র' ৩২১
হরিশ্চন্দ্র ভারতেন্দু ২৬৬
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯৬, ১০৬, ১১৯, ১২৮-৯, ১৩৮, ১৪৫-৬, ১৫৬-৫৯, ১৬১-৩
হাইকোর্ট ১৪৫, ১৬১-৭০, ১৭২, ২১৯, ২৩৩, ২৯৬
হাউস্ অফ কমন্স ৮০
'হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর ফ্রীডম' ৩২১
হাণ্টার, উইলিয়ম ২১৯, ২৮১
হার্সেল ১২২, ১৬৩
হার্ডিঞ্জ (লর্ড) ৮১-২, ৮৬
হারি, উইলিয়ম কব ৬৯
হালহেড [নাথানিয়েল ব্রাসি] ১১, ৩০
হিউম, এলান অক্টাভিয়ান ৩৮-১৯০, ২৭৯, ৩১৬-৭, ৩২০-১, ৩২২-৩, ৩২৫
হিকি, জেমস্ অগষ্টাস্ ১৯
হিটলি ২০
'হিতসাধক' ১৭৮
'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' ৩৭, ১১৩
হিন্দু কলেজ ৩১-৩৪, ৩৭, ৪২, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫৪, ৬৬, ৭২-৩, ৭৫, ৮৪, ৮৬, ১৭৭, ৩০৪
'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' ২৩৪
'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১১৩-৪, ১২৮-৯, ১৩৮, ১৪৪-৬, ১৫১, ১৫৬, ১৫৮-৯, ১৬২, ১৬৫, ২৩১, ২৪৬, ২৫৭, ২৬৩
হিন্দু ব্যবস্থা দর্পণ দ্র. ব্যবস্থা দর্পণ
হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ ৩০৮
হিন্দু মেলা দ্র. চৈত্র মেলা ১৮০, ১৮২, ২২২, ২৪৩, ২৬২, ৩৩১-
'হিন্দু মেলার উপহার' ৩৩১
হিন্দু সোসাইটি ৮৯
হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় ৮৮-৯
হিবর (বিশপ) ১৭৬
হুগলী কলেজ ৮৬
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৩, ২৩২, ২৪৩, ২৯৪
হেমন্তকুমার ঘোষ ২৩৯, ২৪০
হেয়ার ডেভিড ২৯, ৪৭-৫১, ৭৩
হেয়ার স্কুল ১৭৮
হেয়ার স্মৃতি সভা ৮৬
হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ৩১৩, ৩১৫
হেলিবেরি কলেজ ৮১, ১২০
হেষ্টিংস ওয়ারেন ৩, ৪
ঐ—স্ত্রী ১৯
হোয়াইট এ্যাক্ট দ্র. সাদাআইন ১২৪
হ্যালহেড ৭, ১১